অন্নদাশঙ্কর রায়

অপসরণ

প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৪৯
দ্বিতীয় সংস্করণ ··· ১৩৫৩
তৃতীয় সংস্করণ আশ্বিন ১৩৬০

পাঁচ টাকা

প্রচ্ছদপট শ্রীমতী লীলা রায়ের আঁকা।

৪২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট কলিকাতা ৬, ডি এম লাইব্রেরীর পক্ষে শ্রীগোপালদাস মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত। ৮৩বি বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা ৬, বাণী-শ্রী প্রেসের পক্ষে শ্রীসুকুমার চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত।

শ্রীনবকৃষ্ণ চৌধুরীকে

উত্তরভাষণ

১৯২৭-২৯ সালে যখন ইউরোপে ছিলুম তখন একদিন খেয়াল হলো একখানা উপন্যাস লিখতে। তার দ্বারা "নৌকাডুবি"র প্রতিপাদ্যকে খণ্ডন করতে, "ঘরে বাইরে"র পরিণামকে উলটিয়ে দিতে। আমার নায়িকার নাম হবে পুণ্য। সে অসত্যের ঘর করবে না, সত্যের কর ধরবে, সমাজের ভয়ে অসত্যকেই স্বামিত্বের সিংহাসনে বসিয়ে রেখে সত্যের প্রতি অবিশ্বাসিনী হবে না। এই ভাবেই আমার প্লটের সূত্রপাত।

তার পরে ইটালীর ফ্লোরেন্‌স্ দেখতে গিয়ে মনে হলো, নগরীর নামে যদি নারীর নাম হয় তবে ভারতবর্ষে এমন কোন নগরী আছে যা ফ্লোরেন্‌সের সমতুল্য? নবরত্নের উজ্জয়িনী। তখন পুণ্যের পরিবর্তে উজ্জয়িনী হলো নায়িকার নাম।

বছর দুই কেটে গেল এই পর্যন্ত পৌঁছাতে। দেশে ফিরে এসে আমার পরম শুভাকাঙ্ক্ষী "বিচিত্রা" সম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের আহ্বানে আরম্ভ করলুম আমার উপন্যাস। অসত্য বলে কোনো মানুষের নাম হয় না, সে নাম পরিবর্তিত হলো বাদলে। অসত্য না থাকলে সত্যেরও তাৎপর্য থাকে না, সুতরাং সত্যের বদলে পেলুম সুধীকে। কিন্তু সত্য আর অসত্য এ দুটি নাম খারিজ হলেও এ দুটি আইডিয়া মর্মে গাঁথা রইল। জীবনে তো কত কী দেখি, শুনি, পাই ও হারাই, উপভোগ ও অনুভব করি। তাদের সবই কি সত্য? কোনটা অসত্য? যে যার নিজস্ব কষ্টিপাথরে

সত্যাসত্যের যাচাই করে। বাদলের কষ্টিপাথর বুদ্ধির, সুধীর নিকষ প্রজ্ঞার। দুজনেই সত্যের সন্ধানী, কিন্তু পথভেদে মতভেদ অনিবার্য।

সত্য আর অসত্য এই দুটি আইডিয়া এমন করে পেয়ে বসল যে কেন আমি উপন্যাসটি লিখতে শুরু করেছিলুম তাও গেলুম ভুলে। ইউরোপে থাকতে যে উদ্দেশ্য নিয়ে উপন্যাসের পরিকল্পনা করেছিলুম তার কোনো চিহ্ন রইল না। সুধী বাদল হলো পরস্পরের বন্ধু। বাদলের প্রতি উজ্জয়িনী এতটা আকৃষ্ট হলো যে বাদলের বৌ হওয়া তার পক্ষে অসত্যের ঘর করা বলে প্রতিপন্ন করা দুষ্কর হলো। সত্য, অসত্য ও পুণ্য—এদের তিনজনের যোগাযোগের মধ্যে একটা রূপকের ভাব ছিল, তাও গেল মিলিয়ে। অথচ বই দিন দিন আকারে বাড়তে থাকল, আর বিষয়বস্তুর গুরুত্ব তাকে করতে থাকল গুরুভার। সত্য এবং অসত্য এ দুটি চিরন্তন শক্তির দ্বন্দ্বের রূপ চোখে পড়ছিল বহির্জগতের বিবিধ ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে। মনের যখন এইরূপ অবস্থা তখন "যার যেথা দেশ"-এর ভূমিকা লিখি। তখন এপিকের উপরেই জোর দিয়েছিলুম! সেটা ভুল। পরে এপিকের দাবী প্রত্যাহার করেছি। "যার যেথা দেশ"-এর দ্বিতীয় সংস্করণে উক্ত ভূমিকাটি সন্নিবেশ করিনি। তবে সমগ্র গ্রন্থের নাম পরিবর্তন না করলেও চলত। "সত্যাসত্য" এই শিরোনামাটি ইতিমধ্যে এতদূর সুপরিচিত হয়েছে যে তার বদলে "বাদল সুধী উজ্জয়িনী" কায়েম হবে কিনা সন্দেহ। তাই ভেবে "সত্যাসত্য অথবা বাদল সুধী উজ্জয়িনী" এই আখ্যা প্রচার করছি।

ইচ্ছা ছিল পাঁচ বছরে পাঁচ খণ্ডে এ বই শেষ হবে। পাঁচের জায়গায় ছয় খণ্ড লিখতে হলো, বছর লাগল ছয়ের দু'গুণ বারো। কোনো কোনো পাঠক নাকি তিক্তবিরক্ত হয়ে প্রকাশক শ্রীযুক্ত গোপালদাস মজুমদার মহাশয়ের কাছে অনুযোগ করেছেন যে কাহিনীটি কী ভাবে

শেষ করতে হবে লেখক তা ভেবে পাচ্ছেন না বলে দেরি হচ্ছে। এক হিসাবে এ অনুযোগ যথার্থ। খুলে বলতে বাধা নেই যে বরাবর আমার অভিপ্রায় ছিল উজ্জয়িনীকে সুধীর হাতে সঁপে দিতে। "অপসরণ"-এর মাঝপথে আমার সে নির্বন্ধ ত্যাগ করতে হলো। দেখলুম তা যদি হয় তবে প্লটের মুখরক্ষা হবে বটে, গল্পের প্রাণরক্ষা হবে না। গল্প তার নিজের নিয়মে চলে। আমি তাকে আমার খুশিমতো চালাবার কে? আমি কি ডিকটেটর?

অন্য হিসাবে এ অনুযোগ অযথা। শেষ কী ভাবে করতে হবে তা আমি আট নয় বছর আগে মনে মনে ঠিক করে ফেলি। কিন্তু কাউকে ঘুণাক্ষরেও আভাস দিইনে। একমাত্র ব্যতিক্রম আমার স্ত্রী। এখন পর্যন্ত এই সিক্রেট আমি বা আমরা একান্ত সাবধানে রেখেছি। হিটলারের ডিকটেটরশিপ যেদিন আরব্ধ হলো সেদিন বাদল বেঁচে থাকলে সহ্য করতে পারত না, প্রতিকারে অক্ষম বলে মরতে বাধ্য হত। তা হলে মিছিমিছি তাকে চার বছর বাঁচিয়ে রাখা কেন? ১৯২৯এর শরৎকালেই যে উপন্যাসের বর্ণিত সময় সাঙ্গ হবে তা আমার পূর্বেই স্থির করা ছিল। তখন কিন্তু ডিকটেটরশিপ যে এত বড় একটা আতঙ্ক হয়ে উঠবে এতটা কেউ ভাবেনি, বাদলও না। চার বছর পরে যা ঘটবে তার পূর্বাভাস বোধ হয় সুধী দেখতে পেয়েছিল, কিন্তু তার জন্যে বাদল কেন প্রাণ দেবে? কাজেই আমি বড় সঙ্কটে পড়েছিলুম। বাদলকে অপসরণ করাতে হবে, অথচ কী তার নির্ভর-যোগ্য কারণ? পরে বোঝা গেল বাদলের মতো ইনটেলেকট-সর্বস্ব মানুষের পক্ষে নেতিবাদই মরণের হেতু। একে একে যার সব বিশ্বাস গেছে সে কী নিয়ে বাঁচবে!

দেরি যে হয়েছে এর জন্যে আমার দুঃখের সীমা নেই। যেসব

পাঠকপাঠিকা এ গল্পের শেষ জেনে যেতে পারলেন না আজকের দিনে আমি তাঁদের স্মরণ করছি সকলের আগে।

এই গ্রন্থের রচনায়, মুদ্রণে, প্রকাশে ও বিচারে অনেকের সাহায্য লাভ করেছি। তাঁদের কাছে ঋণী রইলুম। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় যদি উৎসাহ না দিতেন তা হলে এ বই লিখতে বসতুম কি না জানিনে। শ্রীযুক্ত গোপালদাস মজুমদার যদি প্রকাশভার না নিতেন তাহলে এর প্রকাশের আশা ছিল না। এঁদের দুজনের কাছে আমি অতীব কৃতজ্ঞ। বিশেষ করে গোপালবাবুর কাছে। তিনি এর জন্যে যে পরিমাণ অর্থব্যয় করেছেন তা প্রকাশক মহলে দুর্লভ। গোড়ার দিকে লাভের নিশ্চয়তা ছিল না, বরং ক্ষতির আশঙ্কা ছিল। তিনি সহায় না হলে আমি হাল ছেড়ে দিতুম।

আর একজনের নাম করবার অনুমতি নেই। কিন্তু তিনি যদি হাতের কাছে না থাকতেন বিদেশী আচারব্যবহার সম্বন্ধে একটি লাইন লেখা নিরাপদ হতো না। তা ছাড়া প্লট সম্বন্ধেও পদে পদে তাঁর মন্ত্রণা নিয়েছি। আমার যদি কোনো কৃতিত্ব থাকে তবে তার একাংশ তাঁর।

৯ই এপ্রিল ১৯৪২ **অন্নদাশঙ্কর রায়**

চরিত্রপরিচিতি

বাদলচন্দ্র সেন	...	এই উপন্যাসের নায়ক
সুধীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	....	বাদলের বন্ধু
উজ্জয়িনী	...	বাদলের স্ত্রী
কুমারকৃষ্ণ দে সরকার	...	উজ্জয়িনীর অনুরাগী
রায়বাহাদুর মহিমচন্দ্র সেন	...	বাদলের পিতা
সুজাতা গুপ্ত	...	উজ্জয়িনীর মা
অশোকা তালুকদার	...	সুধীর 'মনের খুশি'
মায়া তালুকদার	....	অশোকার মা
স্নেহময় রায়চৌধুরী	...	অশোকার প্রার্থী
মার্সেল	...	সুধীর 'বোন'
সুজেৎ	...	মার্সেলের দিদি
সহায়	...	সুধীর বিহারী বন্ধু
ঝাবওয়ালা	...	সুধীর পারসী আলাপী
নীলমাধব চন্দ	....	সুধীর বন্ধু
রোন্‌লড্‌ ব্লিজার্ড	...	কোয়েকার শান্তিবাদী
জন ব্লিজার্ড	...	তাঁর পুত্র, সোশ্যালিস্ট
বেন্‌জামিন টাউনসেণ্ড	...	বিশিষ্ট শান্তিবাদী
রবার্ট বার্নেট	...	শান্তিবাদী, আচার্য
মড মার্শল	...	শান্তিবাদিনী
ম্যাক্‌স্‌ আণ্ডারহিল	....	শান্তিবাদী

স্ট্যানলি ফেয়ারফিল্ড্	...	ন্যায়নিষ্ঠ লেখক
মুরিয়েল	....	তাঁর পালিতা কন্যা
তারাপদ কুণ্ডু	....	প্রসিদ্ধ দলপতি ও বহুরূপী
বাওয়ার্স	...	কমিউনিস্ট লেখক
ব্রনস্কি	....	নামকাটা কমিউনিস্ট
অল্‌গা	....	তাঁর স্ত্রী, ভাস্কর
মার্গারেট বেকেট	...	অধুনা কমিউনিস্ট
জেনী ওরফে পীচ	...	পরিচারিকা

—আরো অনেকে—

পরিচ্ছেদসূচী

এই খণ্ডের রচনাকাল   ১৯৪১—৪২

সত্যাসত্য

প্রথম খণ্ড

যার যেথা দেশ

দ্বিতীয় খণ্ড

অজ্ঞাতবাস

তৃতীয় খণ্ড

কলঙ্কবতী

চতুর্থ খণ্ড

দুঃখমোচন

পঞ্চম খণ্ড

মর্ত্যের স্বর্গ

ষষ্ঠ খণ্ড

অপসরণ

যত দূর মনে পড়ে

"সত্যাসত্য" লিখতে শুরু করি বহরমপুরে ১৯৩০ সালের গোড়ার দিকে। লিখতে থাকি বাঁকুড়ায়, রাজশাহীর নওগাঁয়। ১৯৩২ সালে প্রথম খণ্ড "যার যেথা দেশ" নামে প্রকাশিত হয়।

রাজশাহীর নওগাঁর পরে চট্টগ্রাম ও ঢাকা। লেখা চলতে থাকে। ১৯৩৩ সালে দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় "অজ্ঞাতবাস" নামে।

ঢাকা থেকে বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর। লেখা চলতে থাকে। তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯৩৪ সালে। নাম "কলঙ্কবতী"।

কুষ্টিয়ায় লেখা হয় চতুর্থ খণ্ড "দুঃখমোচন"। প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ সালে।

এর পরে লেখা থেমে যায় রাজশাহীতে গিয়ে। "মর্তের স্বর্গ" নামে পঞ্চম খণ্ডের সূচনা হয় চট্টগ্রামে ১৯৩৮ সালে। মাঝখানে বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৩৯ সালে আবার লিখতে বসি কুমিল্লায়। ১৯৪০ সালে সেইখানে সারা করি।

কথা ছিল "সত্যাসত্য" সমাপ্ত হবে পাঁচ খণ্ডে। সুতরাং ষষ্ঠ খণ্ড লিখব কি না স্থির করতে সময় লাগল। ১৯৪১ সালে হাত দিই "অপসরণে"-এ। তখন আমি বাঁকুড়ায়। সেইখানেই শেষ হয় বারো বছরের সাধনা। ১৯৪২ সালে।

অন্নদাশঙ্কর রায়

শান্তিনিকেতন
২১শে আশ্বিন, ১৩৬০

অপসরণ

বাগ্‌দান

১

সেদিন তার "মনের খুশি"কে বিদায়সম্ভাষণ জানিয়ে অশোকা যখন বাড়ি ফিরল তখনো তার শরীর রিরি করছিল। চোখের জলকে কোনোমতে ঠেকিয়ে রেখেছিল সারা পথ, ঘরে পা দিতে না দিতেই চোখের জলের বাঁধ ভাঙল। বালিশে মুখ গুঁজে কী কাঁদন কাঁদল সে! যেন তার সব সুখ ফুরিয়েছে।

বসন্ত তখন শেষ হয়ে আসছে, শেষ নিঃশ্বাসের মতো ফিরছিল সেদিন হাওয়া। দিনেরও তখন শেষ বেলা, আলোর চাউনিতে বিষাদ। অশোকার শোককে সৌন্দর্য দিয়েছিল প্রকৃতি।

তার এত দিনের প্রেম! তার এত দিনের আশা! সে তো মনে মনে ধরে নিয়েছিল যে তারা বিবাহিত। দু'দিন আগে হোক, পরে হোক, বিবাহ তাদের প্রজাপতির নির্বন্ধ। প্রতিবন্ধক শুধু এই যে সুধী কিছুতেই সুপাত্র হবে না, সুপাত্রের যোগ্যতা অর্জন করবে না, অশোকার পিতামাতার মনোনয়নযোগ্য হবে না। এই প্রতিবন্ধকই প্রবল হলো। অবুঝ পুরুষ বেছে নিল তার পথকে, বর্জন করল তার নারীকে। এ কী নির্বাচন করে বসল সুধী! কাঁদতে হবে না তাকেও কি সারা জীবন! কেবল কি অশোকাই কেঁদে মরবে! অবোধ শিশু আগুনে হাত দিয়ে নিজেও কাঁদে, মা'কেও কাঁদায়।

সুধী, সুধা, মনের খুশি, মহুয়া!—বিলাপ করতে লাগল অশোকা—তোমার শর্তে কোনো মেয়ে কি রাজী হবে কোনো দিন? মিথ্যে কেন

আমায় নিরাশ করলে, নিজেও হলে। তোমায় দিনের পর দিন কত বুঝিয়েছি, কত মিনতি করেছি, পায়ে পায়ে ছায়ার মতো ঘুরেছি, মান অপমান মানিনি। অবুঝ, তোমার কাছে বড় হলো তোমার একার খেয়াল। দু'জনের যা ন্যায্য প্রয়োজন তাকে তুমি উপেক্ষা করলে। কেন জীবনের প্ল্যান জীবনের চেয়ে বড় হবে? কেন জীবনের সহগামিনীর জন্যে জীবনের ধারা বদলাবে না? জগতে অপরিবর্তনীয় কী আছে? কেন তবে পরিকল্পনার পরিবর্তন হবে না একজনের সঙ্গে আরেকজন যোগ দিলে। আমি কি তবে এক নই, শূন্য?

এর উত্তরে তোমার যুক্তি ছিল না একটিও। তুমি বলেছিলে, খুশি, কেমন করে বোঝাব, তোমাকে আমার কত যে দরকার। তা বলে তোমাকে দুঃখের মাঝখানে টানব না। যদিও জানি যে তুমি স্বেচ্ছায় সে জীবন বরণ করলে দুঃখের দহনে আরো সুন্দর হতে।

শোন কথা। আমাকে তুমি দুঃখের মাঝখানে টানবে না, কিন্তু তাতে আমার এমন কী সান্ত্বনা! তুমি তো দুঃখের মাঝখানে যাবে! তোমার দুঃখ বুঝি আমার গায়ে লাগে না! এত পর ভাব কেন আমাকে? পর ভাব না? হাজার বার ভাব। তোমার নিজের প্ল্যানটি, নিজের ধ্যানটি, নিজের দুঃখগুলি নিয়ে তুমি থাক। আমাকে অংশ দিতে তোমার প্রাণে সয় না। পাছে আমি তার সঙ্গে আমার যা আছে তা যোগ করে অন্য জিনিস করে তুলি। আর বোলো না, তোমার মতো স্বার্থপর আমি জন্মে দেখিনি। সুধী, সুধা, মহুয়া!

আমি বরাবর দেখে আসছি মেয়েরাই সব ছাড়ে, ছেলেরা কিছু ছাড়ে না। আমি তোমার জন্যে সব ছাড়ব আর তুমি আমার জন্যে গ্রাম ছাড়তে পারবে না, দৈন্য ছাড়তে পারবে না। এই তোমার ন্যায়বিচার! তুমি যেমন আছ তেমনি থাকবে, আমাকে ছাড়তে হবে

বাপ মা আত্মীয় স্বজন সমাজ সংসার আরাম বিশ্রাম। তোমার সেই গ্রাম্য ভদ্রাসনের রাঁধুনী হয়ে দু'বেলা দু'শো জনকে খাইয়ে আমার দিন কাটবে, যতদিন না কালাজ্বর কি ম্যালেরিয়ায় ভুগে নির্বাণ ঘটেছে।

এর উত্তরে তোমার যুক্তি ছিল না। তুমি নাজেহাল হয়ে বলতে, খুশি, আমাদের সম্পর্ক যেমন আছে তেমনি থাকলেই সুন্দর হয়। আমি কি তুমি কেউ কেন কিছু ছাড়বে? যা ছাড়বার নয় তা কারো জন্যেই ছাড়া উচিত নয়। যার যা আদর্শ তাকে তা রক্ষা করতেই হবে, প্রিয়জনের হাত থেকেও। যা ছাড়া তোমার চলতে পারে তাই ছাড়তে পারো তো ছাড়। আমি ছাড়ছি কি না চেয়ে দেখো না, তুলনা কোরো না।

পুরুষ! তোমার মুখে যুক্তি নেই, যদিও তোমরা যুক্তিশীল বলে কতো না জাঁক কর। কেবল মিষ্টি মধুর উক্তি, যা শুনলে লিখে রাখতে ইচ্ছা করে। মনের পাতায় লিখে রেখেছিও। বলেছিলে, আমি সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে বিশ্বাস করি যে তোমার আমার মিলন যদি তোমার অভিপ্রেত হয় তবে তুমি আমার উপর নির্ভর করে অজানা সাগরে ভাসতে পারবে। পাগল! তুমি নিজে কিসের উপর নির্ভর করে ভাসবে! সেইজন্যেই ত বলি পি-এইচ. ডি. হতে। শুনবে না তো।

বলেছিলুম, দেশে কি জ্ঞানের ছড়াছড়ি যে তোমার কাছে কেউ জ্ঞানের আলোক চায় না, তাঁতের কাপড় চায়! যাঁরা জ্ঞানী তাঁরা কেন নগরকেন্দ্র থেকে জ্ঞান বিকীরণ করবেন না, কেন গ্রামে গ্রামে ঘুরে ছন্নছাড়া হবেন, চাষ করবেন, সুতো কাটবেন?

তুমি পরিহাস করেছিলে, আমার তো জ্ঞান ছিল না যে আমি একজন জ্ঞানী। ওটা তোমার স্নেহান্ধ নয়নের আবিষ্কার, ওটা মায়া।

আমি হাসিনি। হাসির কথা নয়। তুমি জানো দেশের লোক

শিক্ষাও চায়, শুধু অন্ন চায় তাই নয়। অন্নের ভার অন্যের উপর ছেড়ে দিয়ে তুমি কেন শিক্ষার ভার নাও না?

তুমি তর্ক করেছিলে তার জন্যেও গ্রামে যেতে হয়। কেননা শিক্ষা যাদের দরকার তারা গ্রামে বাস করে।

তারা কেন শহরে আসবে না?

শহরে এলে তারা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আরো কিছু আয়ত্ত করবে। সেটা শিক্ষার উপসর্গ, সেটা কু। তারা কুশিক্ষা পাবে, পাবে কুসংসর্গ।

যাও, তোমার শহর সম্বন্ধে প্রেজুডিস আছে। তুমি বলতে চাও তুমি লণ্ডনে এসে কুশিক্ষা পাচ্ছ, আমি পাচ্ছি কুশিক্ষা!

হাঁ, খুশি, আমরাও কুশিক্ষা পাচ্ছি। আমরা শিখছি বৃহতের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে। আমরা হচ্ছি বৃহতের সঙ্গে খাপ খেতে অপারগ। বৃহতের প্রতি আমাদের নাড়ীর টান শিথিল হয়ে আসছে। আমরা যেন দুধের সর, যতই মোটা হচ্ছি ততই আলগা হচ্ছি। এর পরিণাম অশুভ। রাশিয়ায় যেমন ওরা সব তুলে ফেলল একদিন ভারতবর্ষেও তুলবে, যদি না আমরা এখন থেকে পাতলা হয়ে দুধের সঙ্গে মিশে যাই।

কী যে বলছ, মহুয়া! কারা তুলে ফেলবে কাদেরকে? কেন তুলে ফেলবে?- কী করে?

থাক, খুশি, বিষয়টা উপাদেয় নয়।

না, তুমি বল।

রাশিয়াতেও তোমার মতো কতো লক্ষ্মী মেয়ে ছিল, তাদের একমাত্র অপরাধ তারা ধনীর মেয়ে। তাই তাদের শিক্ষাদীক্ষা সভ্যতা ভব্যতা কোনো কাজেই লাগল না। তাদের যে কয়জনা প্রাণে বেঁচেছে তারা এখন কী করে, জান? এই লণ্ডন শহরেই ডিউকের মেয়ে বোর্ডিং হাউস খুলেছেন, সেখানে তিনিই রাঁধুনী, তিনিই খানসামা। দু'বেলা দু'ডজন

লোকের খাওয়াদাওয়া দেখতে হয়। বিশ্বাস হয় না, একদিন এসো আমার সঙ্গে। ডিউকের মেয়ে বলেছি, ভুল বলেছি। প্রিন্‌সের মেয়ে। এখনো তিনি বলে থাকেন, "Stalin die, I go. Again princess."

আমি খিল খিল করে হেসেছিলুম। তাতে তুমি বলেছিলে, যাক, তোমার পল্লীভীতি তার সঙ্গে নগরভীতি যোগ দিলে তুমি কি আর দেশে ফিরতে পা বাড়াবে!

আমি শঙ্কিত হয়ে বলেছিলুম, মহুয়া, তোমার কথা যদি সত্যি হয় তবে তুমি মিথ্যে ঝুঁকি নিয়ো না। ওদের শিক্ষা দিয়ে কাজ নেই, ওদের কাছ থেকে শত হস্ত দূরে থাকাই নিরাপদ। তোমার জমিদারি বিক্রী করে যা ওঠে তা নিয়ে তুমি এই দেশেই বাস কর।

তুমি বলেছিলে বিলেত যেমন দিন দিন স্বর্ণলঙ্কায় পরিণত হচ্ছে তার ফলে লুব্ধকদের দৃষ্টি সর্বপ্রথম এরই উপর পড়বে কি না কে জানে। না, খুশি। আমি আগুনে ঝাঁপ দিয়ে আগুনের তাপ এড়াব। খাণ্ডবদাহনের দিনে সেই সব চেয়ে নিরাপদ।

তোমার এই কথা শুনে আমি রাগ করেছিলুম। তোমার জন্যে শঙ্কিত হয়েছিলুমও। মহুয়া, তোমার কথা যদি সত্যি হয় তবে খাণ্ডবদাহনের দিনে আমি তোমার সহমৃতা হব। কিন্তু তুমি আমার একটি কথা রাখ। তুমি পি-এইচ. ডি. হও।

তুমি অট্টহাস্য করেছিলে। বলেছিলে, সেই যে বুড়ী, জজকে আশীর্বাদ করেছিল দারোগা হতে, এও তেমনি জীবনশিল্পীকে আশীর্বাদ পি-এইচ. ডি. হতে।

সেসব কথাবার্তা মনে পড়ছে আজ, রাগও হচ্ছে, ক্ষোভও হচ্ছে। সুধী, সুধা, তুমি কি ভাবছ আমি মরতে ভয় করি, গ্রামকে আমার ভয়? আমার ভয় মা'কে আর বাবাকে।

২

সেদিন কার মুখ দেখে ঘুম থেকে উঠেছিল অশোকা। তখন কি সে জানত যে সেই দিনই তার "মনের খুশি"কে চিরদিনের মতো হারাবে!

যেমন প্রতিদিন তেমনি সেদিনও সে গুন গুন করে গান সাধতে সাধতে প্রসাধন করল। যথাবিধি মা'কে বলল, "গুড মর্নিং, মামি। ঘুম কেমন হলো?"

মা বললেন, "মর্নিং, ডিয়ার। তোমাকে জানাতে চাই আজ ওবেলা স্নেহময় আসছে। কাল এসে তোমার দেখা পায়নি।"

মা এমনভাবে বললেন যেন স্নেহময়ের কী একটা জরুরি কাজ আছে। অশোকা সবিস্ময়ে শুধাল, "কেন, মা। কী হয়েছে?"

"হবে আর কী! "মিসেস তালুকদার রাশভারী লোক, ধীরে ধীরে রাশ ছাড়লেন। "ইয়ং ম্যান মোটরকার পেলে যা হয়ে থাকে। রাতারাতি বিয়ে করে হানিমুনে বেরবে, সারা ইউরোপ বেড়াবে, এই তার আর্জি।"

অশোকা তো অবাক।

মা বললেন, "আগে পড়াশুনা, তার পরে রোজগার, তার পরে বিয়ে। এই তো নিয়ম, এর ব্যতিক্রম কেন হবে তার ন্যায়সঙ্গত কারণ দেখছিনে। তাই আমি বলেছি, বিয়ে না হানিমুন না, কন্টিনেণ্ট না। তবে বাগ্‌দানের স্বপক্ষে নজীর আছে বটে। স্নেহময় আজ আসছে বাগ্‌দানে তোমার আপত্তি আছে কি না জিজ্ঞাসা করতে।"

"আজকেই!" অশোকা স্তম্ভিত হলো। চোরের মতো বলল, "কেন, মা? দু'চার দিন দেরি হলে ক্ষতি কী?"

"ক্ষতি?" তিনি রায় দিলেন, "ক্ষতি হয়তো নেই। কিন্তু ছেলেটিকে

দিনের পর দিন ঘোরানোটা কি ভালো? এখন তার নিজের মোটর হয়েছে—"

বাস্তবিক অশোকা "আজ নয়, অন্য একদিন" বলে স্নেহময়কে অনেক বার ঘুরিয়েছে। স্নেহময় সম্বন্ধে তার নীতি হচ্ছে, না গ্রহণ না বর্জন। ধৈর্য বটে স্নেহময়ের। এতকাল অশোকার মুখ চেয়ে ঝুলে রয়েছে। জানে না যে অশোকার মন অন্যত্র। জানতে চেষ্টাও করেনি, কারণ তার ভূতপূর্ব সচিব তারাপদ ওরফে টর্পেডো তাকে বুদ্ধি দিয়েছিল, তার একখানা মনের মতো মোটর নেই বলে সে জজ কন্যার প্রসাদ পাচ্ছে না। থাকত যদি একখানা সিত্রোয়েন কোর তা হলে অশোকা তো অশোকা, স্বয়ং মেরী পিকফোর্ড তার প্রেমে পড়তেন। তখন থেকে তার এক চিন্তা, এক ধ্যান। কী করে একখানা মনের মতো মোটর কেনা যায়। তাই বছর খানেক ধরে টাকা জমিয়ে পুরোনো পোশাক বেচে, ধার করে স্নেহময় একখানা বেবী অস্টিন কিনেছে। এর জন্যে সে দস্তুরমতো লজ্জিত, কিন্তু বুড়ো বাপটি যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন কি ভদ্রলোকের স্টুডেবেকার কেনার সঙ্গতি হবে!

যাক, সে যে একখানা মোটর কিনে ফেলেছে এ হলো, যাকে বলে, half the battle. এখন তার মোটর হয়েছে, সে জাতে উঠেছে। বহুজনের বহুদিনের পরিহাসের শোধ তুলবে এবার এক নিঃশ্বাসে বিয়ে করে, হানিমুন করে, ভিয়েনা ভেনিস রিভিয়েরা বেড়িয়ে।

"এখন তার মোটর হয়েছে তো কী হয়েছে, মা?" অশোকা সরল মনে জানতে চাইল।

"কী হয়েছে!" মেয়েটা কি নীরেট, না ন্যাকা। কী হয়েছে তাও খুলে বলতে হবে।

"কিছু না।" মা ঘটা করে চুপ করলেন।

অশোকা তা দেখে ফিক করে হাসল। কাজটা অতি গর্হিত। সে নিজেই তৎক্ষণাৎ অপরাধীর মতো বলল, "না, মা, হাসির কথা নয়।" অর্থাৎ তুমি অমন হাস্যকর হলে আমি হাসি চেপে রাখতে পারবনা।

তা শুনে তার মা আরো হাস্যকর হলেন। যেন চ্যালেঞ্জ করলেন, কত হাসবে হাস। অশোকা কিছুতেই হাসি চাপতে পারে না, চাপা হাসির উপর যত সাধ্যসাধনা করে কিছুতেই মা'র সাড়া পায় না। তখন চোখে আঁচল দিয়ে কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল, "বল না, মা, তোমার পায়ে পড়ি।"

"তুমি ছেলেমানুষ।" মেয়ের মিনতি শুনে মা'র যেন একটু কৃপা হলো। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। তিনি আবার মৌন হলেন।

"ছেলেমানুষ! ওমা। এক কুড়ি বয়স হলো, তবু ছেলেমানুষ।"

"ছেলেমানুষ নয় তো কী! সংসারের তুমি কতটুকু বোঝ! আমার সময় সময় মনে হয় আমি যদি হঠাৎ চোখ বুঝি তোমার বাবা যেমন ভালোমানুষ, তুমিও তেমনি, মুকুলের তো কথাই নেই। কী করে চালাবে তোমরা? সবাই মিলে তোমাদের ছু'বেলা ঠকাবে, এক হাটে কিনে আরেক হাটে বেচবে।"

তিনি যে নীরব থেকে এই সমস্ত গবেষণা করছিলেন তা ভেবে অশোকার আর একদফা হাসি পাচ্ছিল। কিন্তু একদফা হেসে তো এই ব্যাপার, আবার হাসলে কোনোদিন শোনা হবে না মোটর হয়েছে তো কী হয়েছে।

"ঠিক বলেছে, মা। সংসারের আমি কতটুকু বুঝি। সেইজন্যেই তো জানতে চাইছি, মোটর হয়েছে তো কী হয়েছে।"

"কী হয়েছে?" মিসেস তালুকদার এতক্ষণ পরে ভেঙে বললেন,

"ইয়ং ম্যান, বৌ নেই, মোটর আছে, দুই আর দুই মিলে কী হয়? এই তোমরা পাটীগণিত পড়েছ?"

অশোকা পাটীগাণত পড়েছে, কিন্তু ওর কোথাও এ প্রশ্নের উত্তর লেখা নেই। সে হাসবে কি কাঁদবে বুঝতে না পেরে অন্যমনস্ক হলো।

যার মোটর আছে তার সাথীর অভাব হয় না। কী অপমান!

সুধীর সঙ্গে যখন পরিচয় হয়নি তার আগে স্নেহময়ের সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছে অশোকার। তার মত চাওয়া হয়নি, সেও মত জাহির করতে যায়নি। অশোকার মা মনে মনে স্থির করেছিলেন স্নেহময় যতদিন ছাত্র বিয়ের প্রসঙ্গ ততদিন তোলা হবে না, তবে বাগ্‌দানের প্রসঙ্গ তোলা যেতে পারে। স্নেহময় তুলেছে কয়েকবার, অশোকা "হাঁ" বললে সুধীকে হারায়, "না" বললে মা রাগ করেন।

সেই স্নেহময়ের এখন মোটর হয়েছে। সে যে আর অপেক্ষা করবে তা তো মনে হয় না। আজকেই তাকে যা হয় বলতে হবে, নইলে সে তার মোটরে করে কাকে নিয়ে বেড়াবে! ভাবতে বিশ্রী লাগে। তার দোষ কী, সে কি প্রায় তিনটি বছর সবুর করেনি?

সুতরাং আজকেই সুধীর সঙ্গে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হওয়া চাই। সুধীও এক কথায় বলুক, "হাঁ" কিংবা "না।" সেই অনুসারে অশোকাও মনঃস্থির করবে।

সুধীর উপর অশোকা তিক্ত বিরক্ত হয়ে রয়েছিল। স্নেহময়ের এই আলটিমেটাম—অশোকার বিবেচনায় ওটা আলটিমেটাম—তার মাথা বিগড়ে দিল। স্নেহময়কে যদি সোজা বলে, "কোনো আশা নেই, স্নেহময়দা, আমি অন্যের" তা হলে ও কথা মা'র কানে উঠবেই, স্নেহময় তাঁর কাছে তাই জানিয়ে বিদায় নেবে। তার পরে যদি সুধীও বিমুখ হয় তবে অশোকার মুখ থাকে কোথায়! মা যে শুধু রাগ করবেন তাই

নয়, টের পেলে বিদ্রূপ করবেন। ভিখারী শিবের গলায় মালা দিয়ে কী দশা হয়েছিল সতীর ? দক্ষ যজ্ঞে দেহত্যাগ !

এমন পাগলও আছে। বিদ্যের জাহাজ, ইচ্ছা করলে হাসতে হাসতে পি-এইচ. ডি. হয়। অথচ হবে না, হলে তার দেশে ফিরতে দেরি হয়, দেরি হলে দেশ রসাতলে যায়। দেশ বলতে কলকাতা বম্বে দিল্লী নয়, নামহীন পল্লীগ্রাম। পঁচিশ বছর বয়স হলে পড়াশুনা খতম, এই নাকি তার শাস্ত্রে আছে। এমন পাগলের পাগলামি না সারালে দক্ষযজ্ঞ তো বাধবেই। তাতে শিবের কী, যত দুর্ভোগ সতীর।

না, না, শিবেরও। অশোকা সুধীর জন্যেও ব্যথিত হয়। কিন্তু সুধীর শর্তে রাজি হতে পারে না, কোনোমতেই না। ভিখারী শিব এ যুগে অচল। সতী যদি এ যুগে জন্মান তিনিও রাজি হবেন না ভিখারী শিবকে মালা দিতে। বাধ্য হয়ে শিবকে বাঘছাল ছেড়ে ফ্ল্যানেল পরতে হয়, ষাঁড়ের বদলে ট্রামে চড়তে হয়। অশোকা তো বলছে না যে সুধী মস্ত বড়লোক হোক, মোটর কিনুক, সার্জ কিংবা টুইড পরুক। তার দাবীকে সে যতদূর সম্ভব নামিয়ে এনেছে। পি-এইচ. ডি.-র নিচে নামা যায় না, স্বয়ং শিবও সে কথা স্বীকার করবেন, যদি এযুগে জন্মান।

অশোকার আলটিমেটাম তবে পি-এইচ. ডি.। কঠিন কিছু নয়, সুধী ইচ্ছা করলেই সম্মত হয়, তারপরে যদি সত্যি উপস্থিত হয় তেমন কোনো অসুবিধা অশোকা সাহায্য করবে তার হাত খরচ থেকে। তবে কিনা সুধীকে হতে হবে অশোকার পিতামাতার চোখে সুপাত্র। শিবকেও তাঁরা সম্মান করবেন না ডিগ্রী না দেখলে। তাই শিবকেও হতে হয় ডক্টর শিব।

৩

তারপর বিকালে যখন সুধীর সঙ্গে দেখা হলো তখন সুধী তার স্বভাবসিদ্ধ স্মিতহাস্যে কুশলপ্রশ্ন করল। সে বেচারা জানত না যে তার জন্যে এদিকে বোমা তৈরি হয়েছে, অচিরাৎ ফেটে চৌচির হবে।

অশোকা এক নিঃশ্বাসে বলল, "ভালো আছি। মনুয়া, তোমাকে আধ ঘণ্টা সময় দিচ্ছি, এই আমার আলটিমেটাম।"

তার নিজেরই বুক ঢিপ ঢিপ করছিল। এ যেন গায়ে পড়ে বিচ্ছেদ ডেকে আনা। কিন্তু বিচ্ছেদ কেন? সুধী ইচ্ছা করলেই অশোকার দাবী মেনে নিতে পারে। তখন এই দুঃসাহসের পরিণাম সুখময় হবে। তখন দু'জনে মিলে মনের সুখে ভাবী জীবনের ছক আঁকবে। সে প্ল্যান একা সুধীর নয়, অশোকারও।

"কী হয়েছে, খুশি? তোমাকে তো খুব খুশি বোধ হচ্ছে না?" আলটিমেটামের প্রথম ধাক্কাটা সামলে নিয়েছিল সুধী।

"হাসিতামাশা করতে চাও তো সারা জীবন ধরে করবে।" অশোকার আলটিমেটামের ঘায় সুধীর টনক নড়ছে না দেখে অশোকা হাতুড়ি পিটল; "যদি আলটিমেটাম গ্রহণ কর।"

"ওসব মিলিটারি পরিভাষা শুনলে পরিহাস করতে সাহস হয় না।" সুধীর হাসি মিলিয়ে গেল। "সিভিল ভাষায় বল দেখি কী ব্যাপার।"

ব্যাপার যে কী তা অশোকা ভেঙে বলতে কুণ্ঠিত হয়। এমন কিছু নয়, স্নেহময় আসছে প্রপোজ করতে—যা সে কতবার করেছে। এবারকার নূতনত্ব তার একটি যান জুটেছে। সুধী শুনলে তুমুল রসিকতা করবে। বর এসেছে পাল্কী নিয়ে, অন্য কোনো মেয়ে হলে আহ্লাদে উলুধ্বনি দিত, অথচ "মনের খুশির" মনে খুশি নেই।

অশোকা খুলে বলল না, চেপে গেল। বলল, "কালকেই তুমি দরখাস্ত করবে যে সামনের সেসনে পি-এইচ. ডি.র জন্যে পড়া শুরু করবে।" তা হলে সে সত্য মিথ্যা মিলিয়ে মা'কে বলতে পারবে যে সে একজনকে বিয়ে করতে চায়, তিনি পি-এইচ. ডি.র জন্যে তৈরি হচ্ছেন।

নতুন কথা নয়। সুধী অনেক বার শুনেছে। কিন্তু কালকেই কেন? এর মধ্যে এমন কী ঘটল!

কী ঘটেছে জানতে চাওয়া অভদ্রতা হবে। সুধীকে নীরব দেখে তাগিদ দিতে থাকল অশোকা। "করবে? করবে না? করবে?"

সুধী বুঝতে পারল যে অশোকার মনের অবস্থা কোনো কারণে বিক্ষুব্ধ। সম্ভবতঃ মা'র সঙ্গে মনকষাকষি। আজ তাকে কিছু না বললেই ভালো হতো। কিন্তু সে যে আধ ঘণ্টার বেশি সময় দিতে চায় না। আধ ঘণ্টায় যা বলবার তা অনায়াসে বলা যায়, সুধীর বক্তব্য তো বহু পূর্বে বলা হয়ে রয়েছে। কিন্তু সহজ কথা সহজ সুরে বললেই তো সমস্যা মেটে না। যাকে বলবে তার মানসিক অবস্থার সঙ্গে সুর মেলাতে হয়। তেমন সুরটি আজ কোথায়?

"কত সময় দিয়েছ? আধ ঘণ্টা?"

"হাঁ। আধ ঘণ্টা। আমার অন্য এনগেজমেণ্ট আছে।" অশোকা মিথ্যে বলেনি। স্নেহময় আসছে, তার জন্যে প্রস্তুত হতে হবে। যেমন সুধীর সঙ্গে তেমনি স্নেহময়ের সঙ্গে আজকেই একটা এস্পার কি ওস্পার হয়ে যাওয়া দরকার। যদি সুধী অশোকার শর্তে রাজি হয় তবে স্নেহময়কে মধুরভাবে বিদায় দিতে হবে, তাকে স্তোক বাক্যে ভুলিয়ে রাখা অন্যায়। আর যদি সুধী নিজের জেদ না ছাড়ে তবে স্নেহময়কে কথা দিতে হবে, তাকে বার বার ঘোরানো অন্যায়।

সুধী ভাবছিল কী করে অশোকাকে বলা যায়। কী বলবে, তা আজ মুখ্য নয়। কেমন করে বলবে, তাই মুখ্য। অশোকা সুধীর পরম প্রিয়। তার জন্যে সুধী সুখ সম্পদ ত্যাগ করতে পারে। কিন্তু যেখানে আদর্শের প্রশ্ন সেখানে সুধীর ত্যাগ প্রকারান্তরে অশোকারও ত্যাগ। সুধীর মধ্যে যা সত্যিকার তাকে ত্যাগ করলে সুধীর কী অবশিষ্ট থাকে? সুধীর অবশিষ্ট নিয়ে অশোকা কতখানি হারায়!

তার পর সুধীর জীবন কি সুধী-অশোকার ঘরোয়া সম্পত্তি? তা কি ভারতবর্ষের মহাজীবনের অঙ্গ নয়? বিদেশে বসে আপনাকে গড়ে তোলা কতো কাল চলবে? যার জন্যে গড়ে তোলা তার প্রয়োজন কতো কাল অপেক্ষা করবে? ভারতের সম্মুখে দীর্ঘ দুর্দিন। বহু সমস্যায় জর্জরিত সে দেশ পরের বন্ধনে অসহায়। অথচ বন্ধনমোচনের যে উপায় তা পৃথিবীর ইতিহাসে অপরীক্ষিত। কী আছে ভারতের ভাগ্যে, কে জানে!

সুধী বলল, "খুশি, ভালোবাসার চেয়েও বড় জিনিস আছে। সেও ভালোবাসার সামিল, কেননা সে ভালোবাসাকে আরো বড় করে, আরো বড় পরিণতির দিকে নিয়ে যায়, সম্পূর্ণতা দেয়।"

অন্য সময় হলে অশোকা শুনত এ কথা, বুঝতে না পারলে বুঝে নিত। কিন্তু এখন তার প্রত্যেকটি মিনিট মূল্যবান। সে কি সুধীর বক্তৃতা শুনতে এসেছে? সে চায় স্পষ্ট জবাব। সে চায় কর্মতৎপরতা।

সে অসহিষ্ণুভাবে বলল, "বক্তৃতা শুনতে সারা জীবন রাজি আছি, কিন্তু আজ না। তুমি যে বাক্‌পটু তা আমার চেয়ে কেউ বেশি জানে না। কিন্তু তুমি যে কর্মকুশল তাই জানতে দাও, মনুয়া।"

তার রুদ্র মূর্তি দেখে সুধীর চোখ গেল ঝলসে। শুধু রুদ্র নয়, সেই সঙ্গে করুণ। পরমূহূর্তেই আবেগভরা আবেদন কানে এলো, "মনুয়া,

কাজের ভাষায় কথা বল; কথার ভাবায় না। আজ তুমি দার্শনিক নও, সুধী নও। আজ তুমি বীর চক্রবর্তী।"

সুধীর বীরত্বের প্রতি এই আহ্বান সুধীকে স্পর্শ করল, কিন্তু করবে কী, সুধী? তার যেখানে বীরত্ব সে তার সুধীত্ব। সুধীত্ব বিসর্জন দিয়ে বীরত্বের অবকাশ কই? তেমন বীরত্বের অন্তিম মূল্য কী?

"খুশি, তোমাকে আঘাত করলে আমারও আঘাত বাজে। এ কথা বিশ্বাস কর।" সুধী বলল ব্যাকুলভাবে। "যদি আঘাত করি তবে নাচার হয়েই করি, বিশ্বাস কর।"

অন্য সময় হলে অশোকা বিশ্বাস করত, ভেবে দেখত। কিন্তু আজ কিনা তার দোটানার শেষ। আজ তার এস্পার কি ওস্পার। তার সময় নেই, ধৈর্য নেই, সহিষ্ণুতা নেই।

"ভূমিকা শুনব না। উপসংহার শুনতে কান পেতেছি। বল কী স্থির করলে? হাঁ কি না?" অশোকা জুলুম করল।

অশোকার এ এক অভিনব রূপ। দীর্ঘ কাল আবেদন আর নিবেদন করেছে, কোনো ফলোদয় হয়নি। এখন সে মরীয়া হয়ে উঠেছে। নির্দয় কণ্ঠে বলেছে, ভূমিকা শুনব না, উপসংহার শুনতে কান পেতেছি। হাঁ কি না?

অশোকা তার হাতঘড়িটাকে চোখে চোখে রাখল। ওদিকে তার বুকের আলোড়নও প্রচণ্ড। যতই সময় যাচ্ছে ততই আসন্ন হয়ে আসছে চরম মুহূর্ত।

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সুধী বলল, "খুশি—"

অশোকাও রুদ্ধ নিঃশ্বাসে বাধা দিয়ে বলল, "বল, হাঁ। বল, বল—"

সুধীর মুখ থেকে জোর করে কেড়ে নিতে চায়, দাঁতের ডাক্তার যেমন করে দাঁত উপড়ে আনে।

সুধী যদি "হাঁ" বলত অশোকা বোধহয় শূন্যে লাফ দিত, যেমন ছেলেরা লাফ দিয়ে চেঁচায়, "গোল"। হাততালি দিয়ে বলত, "হিপ হিপ হুরে।"

সুধী ক্ষণকাল আত্মস্থ হয়ে বলল, "আমার অন্তরের সম্মতি নেই। মাফ কর।"

এই উত্তর! এত সাধনায়, এত আরাধনায় এই বর!

অশোকার বুকে উত্তাল তরঙ্গ, নাসায় ঘন ঘন শ্বাস। আগুন জ্বলে উঠল তার চোখে। এই সুধী! এই তার বীরত্ব! এই কাপুরুষের কাছে আত্মসমর্পণ করত সে! এরই অনুসরণ করেছে সে দিনের পর দিন! ছি ছি! অতি নির্লজ্জ সে নিজে, পুরুষের পশ্চাদ্ধাবন করেছে কিসের সম্মোহনে! তাই তার কপালে ছিল এই অপমান, এই প্রত্যাখ্যান।

সহসা বিদায় নিল অশোকা। নেবার সময় বলল, "থ্যাঙ্ক ইউ।" অত্যন্ত মোলায়েম স্বর। অসাধারণ সংযমের প্রয়াস। আপনাকে প্রাণপণে সংবৃত করে আরো মৃদুল স্বরে বলল, "গুড বাই।" যেন কোনো অপরিচিতা বলছে কোনো অপরিচিতকে।

তার পরে হাত বাড়িয়ে দিল। প্রিয়ার মতো প্রিয়ের হাত ধরতে নয়, মহিলার মতো অতিথির করমর্দন করতে।

সব শেষ। কত কালের পরিচয়, আলাপ, সখ্য। কত জল্পনা কল্পনা। অনুরাগ, অনুযোগ, অভিমান। সব শেষ। অশোকার প্রবৃত্তি হলো না পরের হাতে অধিকক্ষণ হাত রাখতে। সে তৎক্ষণাৎ হাত সরিয়ে নিল।

তার পরে যেন হাওয়ায় উড়ে চলল। কেবল ট্যাক্‌সিতে চড়বার সময় একবার অপাঙ্গে তাকাল। তখনো সুধী একঠাঁই দাঁড়িয়ে মাথা নিচু করে কী ভাবছে।

৪

অন্তরের সম্মতি নেই।

অশোকা দাঁতে দাঁত চাপল। অন্তর বলে কি আলাদা কেউ আছে? রাবিশ। সোজা ভাষায় বললে হতো, আমার নিজেরই মত নেই।

অশোকা জ্বলতে থাকল স্বকল্পিত প্রত্যাখ্যানের জ্বালায়। ছি ছি। কী অপমান! কেনই বা সে উপযাচিকা হয়ে এত কাল সুধীর পায়ে পায়ে ঘুরল। মেয়েরা কি কখনো উপযাচিকা হয়? উপযাচক হয় পুরুষে। ছি ছি। পুরুষের দ্বারা প্রত্যাখ্যান! 'ইহার চেয়ে মরণ সে যে ভালো।'

জ্বলতে জ্বলতে অশোকার মাথা ধরে গেল। মাথার যন্ত্রণায় সে নিচে নামবার জন্যে তৈরি হতে পারল না, শুয়ে শুয়ে কাঁদতে লাগল। আজকেই স্নেহময়ের সঙ্গে শেষ কথা হয়ে যাক, যেমন সুধীর সঙ্গে হলো। এই ঝুলে থাকা ও ঝুলিয়ে রাখা আর কত কাল চলবে!

কিন্তু জোর যে নেই। গায়ের সব জোর যেন ফুরিয়েছে। বিছানা থেকে উঠতে কষ্ট হয়। মনের জোর যেটুকু ছিল খরচ হয়েছে রাগে ও কান্নায়। সাহস হয় না স্নেহময়ের মুখোমুখি দাঁড়াতে, চোখাচোখি তাকাতে। ধরা পড়ে যাবার ভয় তো আছেই, হঠাৎ কেঁদে আকুল হলে স্নেহময় মনে করবে কী!

তা ছাড়া আরো একটা কথা আছে, অশোকা নিজের কাছে স্বীকার করতে চায় না যদিও। এখনো কি একটুখানি আশার রেশ নেই? এখনো কি আশা হয় না যে সুধী আজ সারারাত অনুতাপে দগ্ধ হবে, হয়ে কালকেই ফোন করবে? মাত্র আধ ঘণ্টা আলটিমেটাম

দেওয়া কি উচিত হয়েছে অশোকার? এত বড় একটা ব্যাপারে—জীবনমরণের ব্যাপারে—কেউ আধ ঘণ্টায় মনঃস্থির করতে পারে? অশোকা হলে পারত?

স্নেহময়ের মোটরখানার কী জানি কেমন আওয়াজ। কিন্তু যেই কোনো পথচারী-মোটরের ঘর্ঘর অশোকার কানে পৌছায় অমনি সে চমকে ওঠে। এই রে। এই সেই সর্বনেশে মোটর যার জন্যে আমার এ দুর্দশা।

স্নেহময় কিন্তু পায়ে হেঁটে এলো। গাড়িখানাকে রেখে এলো পোয়া মাইল দূরে। মোটর থাকতে সাধ করে পদাতিক হবার কারণ ছিল। নগণ্য বেবী মোটরকার তার নিজেরই না-পছন্দ। মিসেস তালুকদার হয়তো সদর ফটক দিয়ে ঢুকতেই দেবেন না, খিড়কির দিকে ইশারা করবেন। তাঁর কাছে মোটরের বার্তা দেবার সময় স্নেহময় সেটার আকার প্রকার অনুক্ত রেখেছিল। তিনিও জেরা করেন নি।

অশোকাকে সংবাদ দেওয়া হলে সে কাতরভাবে বলল, "আমার ভীষণ মাথা ধরেছে, নেলী। মা'কে বল আমি উঠতে পারছিনে।"

মা এসে মেয়ের মাথায় হাত দিয়ে বললেন, "হুঁ। একবার ডাক্তার থিওবল্‌ড্‌কে রিং আপ করলে কেমন হয়?"

"করতে পারো। কিন্তু মিছিমিছি ওষুধ খেয়ে কী হবে? আমাকে বরং বিশ্রাম করতে দাও।"

মিসেস তালুকদার বিরক্ত হলেন। ভদ্রলোককে নিমন্ত্রণ করে এনে অপ্রস্তুত করা তাঁর বিচারে গুরুতর অপরাধ। তিনি যে স্নেহময়কে ডিনারে ডেকেছেন। কথা দিয়েছেন আজকেই অশোকা যা হয় একটা কিছু বলবে।

তিনি য়্যাসপিরিনের উল্লেখ করলেন, কিন্তু অশোকা এমন ভাব

দেখাল যেন তার সমস্ত শরীর অবশ। মাথাব্যথার অবসান হলেই তো অবশ অবস্থার অবসান হবে না। একটা হট ওয়াটার বটল চাওয়ায় মিসেস তালুকদার একটু বিচলিত হলেন। কিন্তু ডাক্তার ডাকবেন কি-না ঠিক বুঝে উঠতে পারলেন না। ডাক্তার এলে কি তাকে উঠতে দেবে ? বরং পূর্ণ বিশ্রামের ফতোয়া দিয়ে তারই ইচ্ছা পূরণ করবে।

তিনি বললেন, "আচ্ছা, এখন এক ঘণ্টা বিশ্রাম করতে পারো। একটু ভালো বোধ করলে নিচে গিয়ে একটুখানি বসবে, তারপর উঠে আসবে। কেমন ?"

"আমি খাব না।"

"না, খেতে হবে না। এমনি এক আধ মিনিট গল্প করে আসবে। একটু কুশলবিনিময়।"

অশোকা অসাড়ভাবে বলল, "তা হলে একখানা স্ট্রেচার জোগাড় কর।"

মিসেস তালুকদার মেয়ের দিকে কটমট করে তাকালেন। তারপর সশব্দে প্রস্থান করলেন। স্নেহময়কে এখন বোঝাবেন কী! আপনিই বুঝতে পারছেন না মেয়ের রঙ্গ। মা'কে এমনভাবে let down করা কি মেয়ের কাজ!

ভাবী শাশুড়ীর মুখভাব নিরীক্ষণ করে স্নেহময়ের মনোভাব যা হলো তা এক কথায়, তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়। সে আজ সারা দিন তাসের কেল্লা বানিয়েছে। সীজারের মতো আসবে, দেখবে আর জয় করবে। অশোকা যেই জ্ঞাপন করবে তার সম্মতি স্নেহময় অমনি তার একটি হাত ধরে একটি আঙুলে পরিয়ে দেবে আজকের কেনা একটি আংটি। বলবে, "এই বা কী! যেদিন বাগ্‌দানের উৎসব হবে সেদিন পরিয়ে দেব দুনিয়ার সেরা আংটি।" তার পরে ভাবী

শাশুড়ীকে প্রণাম করে তাঁর শ্রীচরণে অর্পণ করবে একটি ব্রুচ। অবশ্য পায়ে পরবার জন্যে নয়, কিন্তু যেখানে পরবার জন্যে সেখানে কী স্নেহময় পরিয়ে দিতে সাহস পাবে! বলবে, "এই বা কী! যেদিন বাগ্‌দানের উৎসব হবে সেদিন—"

"ওর ভীষণ মাথা ধরেছে, স্নেহময়। ওকে আজকের মতো একস্‌কিউজ কর তো বিশেষ অনুগৃহীত হব।"

"নিশ্চয়। নিশ্চয়।" স্নেহময় ভগ্ন কণ্ঠে উচ্চারণ করল। "আমি কি তাঁর কোনো রকম কাজে লাগতে পারি?"

"থ্যাঙ্ক ইউ। তোমার মতো মহৎ যুবা," তিনি মাথা নাড়লেন, "খুব বেশী দেখেছি বলে মনে পড়ে না।"

স্নেহময় প্রতিবাদ করতে চেষ্টা করলে তিনি বললেন, "আমি কল্পনাও করিনি যে তোমাকে আজ নিরাশ হতে হবে। কী করি বল, মাথা ধরার উপর কি কারো হাত আছে?"

ইতিমধ্যে স্নেহময়েরও প্রায় মাথাধরার দাখিল। সে মাথা দুলিয়ে বলল, "যথার্থ। যথার্থ।"

"তা হলে তুমি এক্‌স্‌কিউজ করলে। কেমন?"

"সানন্দে।" স্নেহময়ের অন্তরাত্মা বলছিল, অগত্যা।

এক্‌স্‌কিউজ কথাটা শুনে সে একটু ঘাবড়ে গেছল। কেননা তারাপদ কুণ্ডু তাকে শিক্ষা দিয়েছিল মেয়েদের কাছে যখন বিবাহের প্রস্তাব করবে তখন যেন ভণিতা করে "এক্‌স্‌কিউজ মী" বলে। আজকেও অশোকাকে নেপথ্যে ডেকে নিয়ে বলত, "এক্‌স্‌কিউজ মী, অশোকা। তোমাকে জিজ্ঞাসা করে জ্বালাতন করতে পারি কি—তুমি কি আমাকে আজীবন সুখী করবে?" সেই এক্‌স্‌কিউজ অবশেষে অশোকার জননীর মুখে শুনতে হলো। হা হতোঽস্মি।

"তোমার মহত্বের তুলনা," মিসেস তালুকদার জোর দিয়ে বললেন, "ছুনিয়ায় ছু'দশ হাজারের বেশী নেই। কিন্তু স্নেহময়, তুমি কি দয়া করে আরেক দিন আসবে?"

"দয়া!" স্নেহময় বলতে চাইল দয়া কাকে বলছেন, ও যে আমার সর্বশ্রেষ্ঠ সুখ। কিন্তু বলতে বাধল। সে কথাবার্তায় কাঁচা। তার মনের ভাব মুখে যেটুকু ব্যক্ত হয় তাতে শব্দের অভাব।

অশোকার মা স্নেহময়কে আন্তরিক স্নেহ করতেন। সার বংশ-লোচনের বংশধর তথা অংশধর। কিন্তু সেই তার একমাত্র যোগ্যতা নয়। অন্যান্য অভিজাতনন্দনদের মধ্যে ক'জন তার মতন লম্বায় ঠিক ছ' ফুট? তা ছাড়া সে একজন বিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা, প্রয়োজন হলে মুষ্টির সহায়তায় নারী উদ্ধার করবে। নারীহরণের দেশে কতো বড় একটা ভরসা। লেখাপড়ায় তেমন উজ্জ্বল নয় বটে, কিন্তু মুরুব্বির জোর থাকলে সরস্বতীর কৃপাবিহীনরা লক্ষ্মীর বাহন হয়ে থাকে। মিসেস তালুকদার তাই আই সি এস, আই এম এসদের অন্বেষণ করেন নি, স্নেহময়কে হাতের কাছে পেয়ে নিরুদ্‌বেগ হয়েছেন।

তা বলে তাকে অসময়ে কন্যাদান করতে কিছুমাত্র ত্বরা ছিল না তাঁর। আগে তার পড়াশুনা সারা হোক, কোনো নামকরা ফার্মে যোগ দিক সে। ইংলণ্ডে হলেই সোনায় সোহাগা হয়, যেহেতু এই দেশেই তালুকদার সাহেব পেনসন ভোগ করবেন স্থির হয়েছে। স্নেহময় যে এক ঝোঁকে বিয়ে করতে চায় এ যেন ভারতবর্ষের স্বরাজ। মিসেস তালুকদার দান করতে রাজি আছেন, কিন্তু আজ নয়। দেবেন কিস্তিবন্দী ভাবে। আপাতত বাগ্‌দানের কথাবার্তা চলুক, তারপরে এক সময় হয়ে যাক বাগ্‌দান, পরে অনির্দিষ্ট মেয়াদের শেষে পরিণয়।

স্বামী কলকাতায়। তিনি একা তাঁর ছুটি সন্তানের শিক্ষার জন্যে

লণ্ডনে প্রবাসী। আপদে বিপদে উপকার পাবেন আশা করে তিনি ইংরেজ ও ভারতীয় উভয় জাতির পরিচিত ও অপরিচিতদের মাসে মাসে পার্টি দেন। সেই সূত্রে সুধী নামে একটি নবাগত যুবককে ডেকেছিলেন, সে আজ অনেক দিনের কথা। তখন তো জানতেন না, এখনো জানেন না, অশোকার সঙ্গে সুধীর কী সম্পর্ক দাঁড়াবে। জানলে বাধা দিতেন, কেননা স্নেহময়ের সঙ্গে সুধীর তুলনাই হয় না। কী আছে সুধীর? বংশগৌরব, না বিত্তসৌরভ? আছে বিদ্যা, কিন্তু ও বিদ্যায় লক্ষ্মীর অনুগ্রহ নেই, ওতে শুধু সরস্বতীর সন্তোষ।

"তা হলে স্নেহময়, তুমি এক্‌স্‌কিউজ করে আজ বাঁচালে। তোমাকে কী বলে ধন্যবাদ দেব জানিনে। এখন চল তোমাকে নিয়ে ডিনারে বসি।"

স্নেহময় বলতে চাইল, ধন্যবাদ কেন, আমি তো আপনার চির বশংবদ। কিন্তু সরস্বতী তার স্বর কেড়ে নিলেন।

৫

সে রাত্রে অশোকা স্নেহময়ের সঙ্গে দেখা করল না। তবু তার মাথার উপরে ঝুলতে থাকল বাগ্‌দানের খড়্‌গ। সুধীর সাহায্য বিনা রক্ষা নেই। অশোকার কি এতখানি মনের জোর আছে যে সুধীকেও হারাবে, স্নেহময়কেও তাড়াবে? সুধী যদি তার সহায় হতো তা হলে সে মা'কে চটাবার ঝুঁকি নিত, মা চটলেও বাবা বুঝতেন সে অন্যায় করেনি। কিন্তু সুধীর দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়ে স্নেহময়কে প্রত্যাখ্যান করলে সে মা-বাবার সামনে দাঁড়াবে কোন ভরসায়? কার জোরে?

তার নিজের জোর যেটুকু আছে সেটুকু একটি পরগাছার। সে স্বাবলম্বী হবার স্পর্ধা রাখে না। বিয়ে তাকে করতেই হবে একদিন

না একদিন, একজনকে না একজনকে। সুধীকে না করলে স্নেহময়কে, স্নেহময়কে না করলে অন্য কোনো অপরিচিতকে। ইংরেজীতে বলে, চেনা শয়তানের চেয়ে অচেনা শয়তান ভালো। তা ছাড়া স্নেহময় তো ঠিক শয়তান নয়। স্নেহময়কে সে পছন্দ করেছিল, প্রশ্রয় দিয়েছিল, সুধীর আবির্ভাবের আগে। সুধীর প্রস্থানের পরে স্নেহময়েরই দাবী অগ্রগণ্য।

না, অশোকার অন্য গতি নেই। যদি জানত যে লেখাপড়া শিখে কোনো রকম মেয়েলি চাকরি করবে তা হলে স্নেহময়কে তার সেই রাক্ষুসে মোটরসহ বিদায় দিত। যে মানুষ নিজের গুণে বিকায় না সেই আসে মোটরের মুকুট পরে। শুধু তাই নয়। স্নেহময় আবার ভয় দেখান অশোকাকে না পেলে আর কাউকে মোটরে করে নিয়ে বেড়াবেন! আহা, মোটরের কিবা মহিমা! একবার স্নেহময় একটি ইংরেজ তরুণীর সঙ্গে একটু মিঠে ইয়ার্কি করেছে দেখে অশোকা জিজ্ঞাসা করেছিল, "মেয়েটি কে?" স্নেহময় বলেছিল, "A flame of mine" অশোকা তা ভোলেনি। আছে স্নেহময়ের ও-স্বভাব। সেইজন্যে স্নেহময়কে বিয়ে করতে তার বিশেষ উৎসাহ নেই। কিন্তু বিয়ে যখন করতেই হবে আর সুধী যখন বিমুখ তখন অচেনা শয়তানের চেয়ে চেনা শয়তান ভালো, যদিও স্নেহময় ঠিক শয়তান নয়। আশাকা মনকে বোঝাল যে ফ্লার্ট একটু আধটু সকলেই করে, ফ্লেম এক আধজন সকলেরই আছে।

পরদিন অশোকার মাথাব্যথা গেল, কিন্তু অনিদ্রার দরুণ অবসাদ রইল। সে বিছানায় শুয়ে থাকল, চোখ বুজে ঘুমের ভাণ করল।

তার কান কিন্তু টেলিফোনের পানে। নেলীকে বলে রেখেছিল, যদি চক্রবর্তী নামে কেউ তার খোঁজ করেন তা হলে নিচে থেকে

চেঁচানো চলবে না, চুপি চুপি উপরে এসে চাপা গলায় খবর দিতে হবে। নইলে মা টের পাবেন। এই লুকোচুরির দরকার হতো না, যদি সুধী সুপাত্র হতো। অশোকা সুধীর উপর রাগ করে আর সুধীর টেলিফোনের জন্যে কান পাতে।

ব্যর্থ প্রতীক্ষা। টেলিফোন এলো বটে, কিন্তু সুধীর নয়, স্নেহময়ের। সে নাকি অশোকার জন্যে অতীব উদ্‌বিগ্ন, সন্ধ্যায় দেখা করতে উদ্‌গ্রীব। যদি শোনে অশোকা একটু ভালো আছে তা হলে সে বাগ্‌দানের প্রস্তাব করবেই, আর যদি শোনে অশোকার শরীর তেমন ভালো নয় তা হলেও তার আগমন অনিবার্য। অশোকা কিছুতেই তার সঙ্গে কথা কইতে রাজি নয়, তাকে দর্শন দিতেও প্রস্তুত নয়। মনের ধারা যেদিকে বইছে সেদিক থেকে সহসা অন্যদিকে ফিরতে পারে না, ফিরতে সময় লাগে। অসময়ে মনকে ফেরাতে গেলে মনের প্রতি অত্যাচার করা হয়, সে অত্যাচার রক্তপাতের মতো ভীষণ। অশোকা নেলীকে দিয়ে বলে পাঠাল, তার বিশ্রামের ব্যাঘাত করলে তার স্বাস্থ্য সারবে না।

ব্যর্থ প্রতীক্ষা সুধীর জন্যে, সুধীর কণ্ঠস্বরের জন্যে। সুধী কি সত্যি তাকে ভালোবাসে না, এক ফোঁটাও না, এক কণিকাও না, এক পরমাণুও না? তবে কি সে সুধীর ভালোবাসার পাত্রী নয়, কোনো দিন ছিল না? যদি তাকে ভালোবাসত সুধী তবে কি এমন করে উপেক্ষা করত? এ কি স্বাভাবিক? মানুষ কখনো পারে এমন পাষাণ হতে? না হয় বুঝলুম সুধীর একটা পণ আছে, একটা প্ল্যান আছে, যার তুলনায় অশোকা তুচ্ছ। কিন্তু একবার ফোন করতে দোষ কী? যাকে ভালোবাসত সে কেমন আছে তা কি জানতে নেই?

অশোকা ভাবল সুধী ফোন করতে সংকোচ বোধ করছে, কিন্তু চিঠি লিখবে। চিঠির আশায় সে রাত দশটা অবধি জাগল, তবু চিঠি

এলো না। তখন ধরে নিল পরদিন সকালের ডাকে আসবেই। ভালো ঘুম হলো না, চিঠির চিন্তা তাকে উতলা করল। কী থাকবে চিঠিতে কে জানে! হয়তো সুধী অনুতপ্ত, হয়তো অশোকার শর্তে সম্মত। হুরে!

হয়তো শুধু ক্ষমা চেয়ে চিঠি লিখবে। বলবে, আমি নাচার। আমার কাছে তুমি কেন অমন প্রত্যাশা করলে? আমার দেশ আগে, তার পরে তুমি।

অশোকা মনে মনে তর্ক করে। তার অভিমান উদ্বেল হয়, প্লাবিত হয় তার উপাধান। কী নিষ্ঠুর তার মনুয়া! যে নারী ওকে ভালো-বাসবে সে মরবে। অশোকা যদি না মরে তবু ক'দিন বাঁচবে! ভাবতে প্রবৃত্তি হয় না যে সে স্নেহময়ের সঙ্গিনী হবে। হলেও সুখ নেই তার কপালে। সুখ যা ছিল তা সুধী শেষ করে দিয়েছে।

দীর্ঘ সুখহীন জীবনের শঙ্কা তাকে ব্যাকুল করে। ভাবে, সুখহীন যদি হয় তবে দীর্ঘ যেন না হয়। দীর্ঘ যেন না হয়।

সকালেও চিঠি এলো না,। অশোকা বালিশে মাথা খুঁড়তে খুঁড়তে সুধীকে অভিশাপ দিল। কী অভিশাপ তা লিখে কাজ নেই। পরক্ষণে বলল, না, না, ছি! আমার অভিশাপ তোমায় স্পর্শ করবে না, প্রিয়তম। তুমি সুখী হবে, তোমার মতো নিষ্পাপ পুরুষ সুখী না হবে কেন? সুখ তো তোমার অঙ্গে, তোমার সঙ্গে। নারী যেমনই হোক না কেন, তাকে নিয়ে তুমি সুখী হবে, কেননা সুখ তো নারীতে নয়, সুখ তোমাতে।

অশোকা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল। সুখ তার তরে নয়, তার সব সুখ ফুরিয়েছে। বিয়ে করতেই হবে একজনকে, স্নেহময়ের অপরাধ কী! কিন্তু বিয়ে করলেও যা, না করলেও তাই, সুখ তার অদৃষ্টে নেই। একা থাকলেও সুখী হবে না, স্নেহময়ের সাথী হলেও সুখী

হবে না, সুখী হওয়া যেন প্রশ্নের অতীত। সুখহীন জীবন কল্পনা করতে শিউরে ওঠে, তেমন জীবন দীর্ঘ হলেও জীবন্ত কবর।

অশোকা হাহুতাশ করে, মা'কে সংবাদ পাঠায় তার বুকে ব্যথা, তিনি ডাক্তারকে ফোন করেন। ডাক্তার বলে, বুকের কাঁপন অস্বাভাবিক দ্রুত। সম্পূর্ণ বিশ্রাম আর যথাবিহিত ঔষধসেবন, এ ছাড়া উপায় নেই।

অশোকার মা স্নেহময়ের কথা ভেবে বিরক্ত হন, মেয়ের দশা ভেবে বিরক্তি চাপেন। হঠাৎ কেন এমন হলো কে বলতে পারে? তিনি কার উপর রাগ করবেন বুঝতে না পেরে স্বামীকে দোষ দেন, স্বামী তো বেশ আছেন কলকাতায়, এদিকে দুটি নাবালক নাবালিকা নিয়ে বিদেশে বেসামাল হচ্ছেন তিনি। সেই যে এডিনবরার ভাদুড়ী তাঁর ভাই, তাঁকেই টেলিগ্রাম করবেন কি না চিন্তা করলেন।

তার পরদিনও যখন সুধীর চিঠি পেলো না তখন অশোকার মাথা মাটিতে মিশিয়ে গেল। এত নিষ্ঠুর তার মনুয়া! ওকে চিঠি না লিখে উপায় কী! লিখতেই হবে গায়ে পড়ে। সাধতে হবে আবার। অভিমানে বুক ফাটলেও মুখ ফোটে না যাদের অশোকা তাদের মতো নয়। অশোকা পারে না অভিমান পুষে রাখতে, হয় হোক মাথা হেঁট। নিজের উপর তার রাগ হয়, কেন এত দুর্বল তার স্বভাব? যে মানুষ সেদিন আলটিমেটাম দিয়ে এলো সেই মানুষ কী করে আজ কাকুতি মিনতি করবে? লজ্জা নেই কী?

লিখব? লিখব না? লিখব? অশোকা আপনাকে শুধায়। একটি পুরো দিন কাটল এই দোটানায়। তার পরে আর বাগ মানল না তার মন। নির্লজ্জের মতো হাত পাতল সেই দরজায় যেখানে পেয়েছে প্রত্যাখ্যানের অপমান। ভিখারিণীর কিবা লজ্জা কিবা মান

অশোকা তার দুই গালে দুটি চড় মারল। বলল, ধিক, ধিক আমার অহংকারকে!

মনে মনে গুন গুন করে গাইল, সকল অহংকার হে আমার ডুবাও চোখের জলে। আমার মাথা নত করে দাও হে—

কাগজ কলম নিয়ে অনেক বার খসড়া করার পর এই রকম দাঁড়াল তার চিঠি। "মানছি তুমি পারো মনের ব্যথা মনে চেপে রাখতে, পারো নীরব থাকতে। কিন্তু আমি তা পারিনে। তুমি ভাববে, মেয়েটা কী বেহায়া, সেদিনকার সেই কাণ্ডের পরে আবার চিঠি লেখে যে! মহুয়া, যাকে তুমি খুশি বলে ডাকতে তার মনে খুশি কোথায়? তুমি তো দার্শনিক, তোমার সুখ তোমার অন্তরে, কেউ তোমাকে অসুখী করতে পারে না। কিন্তু আমি কী করে সুখী হব? আমার সুখের কী ব্যবস্থা করেছ? যদি সত্যি ভালোবাসতে তবে সুখের ব্যবস্থাও করতে। প্রিয়তম, আমি যে তোমার আলোয় আলোকিতা, তোমার আলো না পেলে নির্বাপিতা। তোমার খুশি চির অসুখী হোক এই কি তুমি চাও? চির অসুখীরা ক'দিন বাঁচে?"

চিঠিখানা ডাকবাক্সে পাঠিয়ে অশোকার ইচ্ছা হলো ফিরিয়ে আনে, ছিঁড়ে কুটি কুটি করে। তার নির্লজ্জতার এত বড় সাক্ষী আর নেই। সুধী পড়ে হাসবে, তুলে রাখবে তার ভাবী বান্ধবীর জন্যে। ছি ছি। কোনদিন কার হাতে পড়বে ও চিঠি, কে কী ভাববে! অশোকা কেঁদে আকুল হলো।

৬

অশোকা যে সুধীর কাছে ঠিক কী আশা করেছিল তা সে নিজেই জানত না। বোধ হয় চেয়েছিল একটুখানি সঙ্গসুখ, তাও পত্রযোগে।

এবার ব্যর্থ হল না তার প্রতীক্ষা। সুধীর উত্তর ফিরতি ডাকে এলো। সুধী লিখেছিল, "ভালোবেসে কেউ কাউকে সুখী করতে পারে না, খুশি। তাই ভালোবাসার কাছে সুখের প্রত্যাশা করতে নেই। ভালোবাসা আপনি একটা সুখ। যে ভালোবাসতে জানে সে ভালোবেসেই সুখী। আমাকে তুমি দার্শনিক বলেছ, আমি কি সেইজন্যে সুখী? আমি প্রেমিক, আমি ভালোবাসি প্রকৃতিকে, মানুষকে। আমি ভালোবাসি বিশুদ্ধ সৌন্দর্য, পরিপূর্ণ কল্যাণ। আমার এই সব ভালোবাসা আমাকে সুখ দেয়, নির্জলা সুখ। সুখের জন্যে আমি পরনির্ভর নই। খুশি, তুমিও স্বনির্ভর হও।"

এর পরে লিখেছিল, "মনে রেখো আমার ধ্যানের থেকে আমি অবিচ্ছিন্ন। আমাকে তুমি বিচ্ছিন্নভাবে চেয়েছিলে, তাই এমন হলো। তোমাকেও আমি নিছক নিজের জন্যে চাইনি, তাই এমন হলো। যা হবার তা তো হয়েছে। এবার দ্বিধাহীন পদে অগ্রসর হও, খুশি। যাকে পিছনে রাখলে তাকে পিছনে ফেলে যাও।"

পড়তে পড়তে অশোকার চোখ থেকে ধারা ছুটল। নিজের জন্যে ততটা নয়, যাকে পিছনে রাখল তার জন্যে। সেদিন সে কি সুধীর সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করেছে? সুধীকে পিছনে ফেলে একবারও থামে নি।

সম্পূর্ণ বিশ্রামের ছল পুরোনো হয়ে আসছিল, স্নেহময়কে ঠেকানো যায় না। অথচ স্নেহময়কে কথা দেবার পর সুধী চিরকালের মতো পর হয়ে যায়, অশোকা হয় পরের বাগ্‌দত্তা। তখন তো চিঠি লিখতে সাহস হবে না, চিঠি পেতেও ভয় করবে। তেমন চিঠিতে রস থাকবে কী করে?

সব সুখ ফুরিয়েছে, সুখের আশা আর নেই। মনে মনে জপ করে

অশোকা। নেই, নেই, বৃথা সময় নষ্ট করে ফল কী? সোজা স্নেহময়কে কথা দিয়ে বাস্তবের সম্মুখীন হতে হবে। নিষ্ঠুর বাস্তব।

আশোকা দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছিল। এমন প্রচণ্ড সংঘাত তার জীবনে ঘটেনি, এমন প্রবল দোটানা। এক দিকে স্নেহময় অন্যদিকে সুধী হলে কথা ছিল না। একদিকে জননীর নির্বন্ধ, অন্যদিকে সুধীর ধ্যান। মাঝে মাঝে সুধীর ধ্যান তাকে মুগ্ধ করে, তারা হবে চাষা আর চাষানী, স্বামী সারাদিন মাঠে কাজ করবে, স্ত্রী করবে গোদাহন, দধি মন্থন। স্বামী ধান আনবে, স্ত্রী ধান ভানবে। এমনি কত স্বপ্ন। কিন্তু অশোকার স্বভাবটা প্র্যাকটিক্যাল। যা সম্ভব নয় তার ধ্যানে বিভোর থাকা মুগ্ধতা অর্থাৎ মূঢ়তা। সে সুধীকেই চায়, কিন্তু ধ্যানের থেকে বিচ্ছিন্নভাবে চায়। সে স্নেহময়কে চায় না, কিন্তু স্নেহময় যে জীবনপথের পথিক সে পথ ছাড়া অন্য পথ চায় না। সুধীর ধ্যান ও স্নেহময়ের মোটর, দুটোর মধ্যে যদি একটাকে বেছে নিতে হয় তবে মোটরকেই সে বেছে নেবে। যদিও সেটা রাক্ষুসে তবু সেটা প্র্যাকটিক্যাল।

সুধীকে অশোকা তার শেষ চিঠি লিখল। আলটিমেটামের সুরে নয়, *Swan Song*এর সুরে।

"তুমি বেশ বলেছ যে তোমাকে আমি তোমার ধ্যানের থেকে বিচ্ছিন্নভাবে চেয়েছিলুম, তাই এমন হলো। কিন্তু, প্রেমিক, তোমার অতি সম্ভবপর বধূর প্রতি কি তোমার বিন্দুমাত্র কর্তব্য নেই? তোমার ধ্যানের মহিমা আমি মানি, কিন্তু আমার দুর্বলতা কি তুমি স্বীকার করে নেবে না? তুমি উঠতে চাও হিমালয়ের শৃঙ্গে, কিন্তু আমি যদি সে পরিমাণ শৈত্য সইতে না পারি তবে কি তুমি আমার খাতিরে সমতল ভূমিতে নামবে না? মনুয়া, তোমাকে একদিন অনুতাপ করতে

হবে। তুমি পাবে না এমন মেয়ে যে তোমার ছায়ার মতো অনুগতা হয়ে প্রতি কথায় সায় দেবে। হয়তো বিয়ের আগে সবতাতেই রাজি হবে, কিন্তু বিয়ের পরে একে একে গররাজি। মনুয়া, তুমি ঠকবে, যদি মেয়েমানুষের মুখের কথা বিশ্বাস কর। তোমার জন্যে আমার সত্যি ভয় হয়, তুমি দেখবে কোনো মেয়েই তোমাকে ও তোমার ধ্যানকে একত্র ভালোবাসবে না। কেউ ভালোবাসবে তোমাকে, কেউ তোমার প্ল্যানকে। হয়তো তুমি এমন নারী পাবে যে তোমার কল্পনা সম্বন্ধে তোমার চেয়েও উৎসাহী। কিন্তু সে কি তোমার জন্যে তোমাকে ভালোবাসবে? এক সঙ্গে দুই হয় না, সুধা। সুধা, তুমি পাবে না তাকে যে তোমার মানসী। সংসারে সে নেই, আছে তোমার মনে। প্রিয়তম, এখনো আমি তোমার। আরো দু' এক দিন থাকব, তারপরে থাকতে পারব না। কারণ আমি দুর্বল। আমাকে তুমি সবল করতে যদি আমার কথা রাখতে। আমার হাতের মুঠো শক্ত করতে, যদি—থাক, নাম করব না। বার বার সেই একই উক্তি শুনে তোমার অরুচি ধরেছে। আমাকে আমার এই দুর্বল মুহূর্তে বল দাও, বন্ধু। তোমার ধ্যানলোক থেকে একটুখানি নামো। এই প্রার্থনা কি অত্যধিক প্রার্থনা? একটি নারীর জীবনের অতিশয় সংকটে তার প্রিয় পুরুষের কাছে এইটুকু প্রার্থনা কি সত্যই অত্যধিক?

তুমি কি উত্তর দেবে তা অনুমান করা কঠিন নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি আশা করব যে তুমি আমাকে পরের হাতে সঁপে দেবে না। তাতে মহত্ত্ব নেই, সেটা কাপুরুষতা। যদি তাই করতে তোমার মর্জি হয় তবে এইখানেই বিদায়, চির বিদায়, ওগো প্রেমিক।"

অশোকা চোখ মুছতে মুছতে এ চিঠি লিখল। লেখা শেষ হ'তে না হ'তে আবার চোখের জলে ভাসল।

তার সুখের ইতি হল যেই লিখল "ইতি।" তার জীবনের উপর যবনিকা পড়ল যেই স্বাক্ষর করল নাম।

ওদিকে স্নেহময় তাড়া দিচ্ছিল মা'র মারফৎ। অশোকা মা'কে ডেকে বলল, "আমার বিশ্রাম তো প্রায় সারা হয়ে এলো। স্নেহময়দাকে নেমন্তন্ন করছ কবে? পরশু?"

"বেশ। পরশু।" মিসেস তালুকদার মঞ্জুর করলেন।

অশোকা মনটাকে প্রস্তুত করে নিল। যা হবার তা তো হয়ে রয়েছে। যে মালা সুধীর কণ্ঠে দেবার সে মালা স্নেহময়ের গলায় দেবে। তৃতীয় পন্থা নেই।

না, নেই। অকারণে দিন ক্ষয় করলে সুধীকেও পাবে না, স্নেহময়কেও হারাবে। স্নেহময় অনেক অপেক্ষা করেছে, আর করবে না। এখন তার মোটর হয়েছে, সেই আগুনে কত পতঙ্গ ঝাঁপ দেবে। কিংবা সেই পতঙ্গ কত শিখা সন্ধান করবে। মানুষ দুর্বল, স্নেহময়ও মানুষ। সকলে তো সুধী নয় যে আকাশে বিহার করবে। সাধারণের বিহার ভূতলে। সেখানে কত রকম স্খলন, কত রকম পতন।

যদিও বিশেষ ভরসা নেই তবু অশোকা আশা করে। কে জানে হয়তো সুধী দুর্বলকে বল দিতে, রক্তহীনকে রক্ত দিতে, আত্মত্যাগ করবে। শিবিরাজা মাংস দিয়েছিলেন, দধীচি প্রাণ দিয়েছিলেন, সুধী কি তার ধ্যান দেবে না? ধ্যানেরও সবটা নয়, অশোকা যা চায় তা ভগ্নাংশ।

সুধীর উত্তর যেদিন এলো অশোকা দৃঢ়চিত্তে চিঠির প্রত্যেকটি শব্দ রয়েসয়ে পড়ল। এই সম্ভবতঃ শেষ চিঠি। সুতরাং চরম উপভোগ।

"প্রিয়ে, তোমাকে প্রথমেই বলে রাখি, আমি এ জীবনে বিবাহ করব না। একদা স্বপ্ন দেখেছিলুম বৈরাগ্য নিয়েছি, তাই সত্য হলো।

তোমার সঙ্গে পরিচয়ের পর থেকে কত বার মনে হয়েছে, এ কি কখনো সম্ভব যে তুমি আমার সহগামিনী হবে! মন বলেছে, না, যা হবার নয় তার জন্যে নিজেকে সুলভ কোরো না। তবু আমি আশা করেছি—আমিও দুর্বল—জীবনে কত অলৌকিক ঘটনা ঘটে। তুমিও মিরাক্ল ঘটাবে। সত্যবানের কীই বা ছিল! তবু সাবিত্রী তো তাকেই বরণ করে বনবাসিনী হলো। তার আয়ু নেই জেনেও তার সঙ্গে ভাগ্যযোজনা করল। যে দেশে সাবিত্রী সম্ভব হয়েছে সেই দেশের কন্যা তুমি, অশোকা। কেন আমি তোমার কাছে ক্ষুদ্র প্রত্যাশা করব? প্রত্যাশাকে ক্ষুদ্র করলে বৃহতের প্রতি অন্যায় করা হয়। রাণীর কাছে কখনো খুদ চাইতে আছে? আমি তাই খুদ চাইনি, রাণী। চেয়েছি মণিহার। যা তুমি পৃথিবীতে কারো জন্যে করতে না তাই আমার খাতিরে করবে এই ছিল আমার দুরাশা। আর আমি তো কেবল আমি নই, আমি ও আমার দেশ অভিন্ন। দেশের জন্যে কতো মেয়ে কতো ত্যাগ করছে, ইউরোপে তার দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি। ভারতে সে দৃষ্টান্ত অধিক নেই বলে ভারতেরও কোনো অধিকার নেই। নারী দুর্বল, পুরুষ দুর্বল বলে দেশও দুর্বল। আশা ছিল তুমি ও আমি হব আমাদের দেশের সবল নারী ও পুরুষ। ত্যাগবলে সবল। দুরাশা, তবু দুরাশাও শ্রেয়, নিরাশা নিঃশ্রেয়। আমি দুরূহ পথের পথিক, তুমি আমার হাত ধরলে আমার নিঃসঙ্গতা সঙ্গীতে ভরে উঠত।

তা হবার নয়। দুঃখ কী! যেটি যার সত্যিকার সীমা তার শাসন মানতে হয়। তুমি তোমার সীমা বুঝতে পেরেছ, সীমার শাসন মেনেছ। তুমি ভুল করনি। আমিও ঠিক করেছি। এই পরিণতি এ জন্মে চরম। পরজন্মে তোমার প্রতীক্ষা করব, প্রিয়ে। ইহজন্মে তোমার জন্যে তপস্যা করব।”

৭

সুধীর চিঠি পড়ে অশোকা সরল মনে হাসল। বলল, কথায় তোমার সঙ্গে কে পারবে, ময়ূরা ? তুমি কথার সওদাগর।

তারপরে ভ্রূকুটী ভরে উচ্চারণ করল, কাপুরুষ! যে নারী পায়ে পড়ে সাধছে তাকে কোলে টেনে নিতে জানে না। কাপুরুষ!

আর কী ? এই শেষ। এর পরে যা আসছে তা সুধী-অশোকার উপাখ্যান নয়, স্নেহময় ও অশোকার।

নিমন্ত্রণের রাত্রে স্নেহময় বলল, "কতো কাল তোমাকে দেখিনি। কেমন আছ, অশোকা ?"

"ভালোই আছি, স্নেহময়দা। ধন্যবাদ।"

অন্যান্য কথাবার্তার পর আহারের ফাঁকে স্নেহময় চুপি চুপি বলল, "এক্স্‌কিউজ মী, অশোকা—"

অশোকা এ গৌরচন্দ্রিকা আগেও শুনেছে। বুঝল তার মরণ-মুহূর্ত ঘনিয়ে এসেছে। নিয়তিকে এড়িয়ে বেড়াবে কতো কাল! সে আজ ক্লান্ত, অপরিসীম ক্লান্ত! ধরা দিয়ে মরতে চায়, না দিলে বাঁচবে না।

"কী বলছিলে, স্নেহময়দা ?"

"বলছিলুম, তুমি কি—"

"আমি কি—"

"কষ্ট করে····এই যে, কী বলছিলুম, কষ্ট করে—"

"বল না স্পষ্ট করে ?" অশোকা ফিস ফিসিয়ে ধমক দিয়ে উঠল। এই নিয়ে কতো বার প্রস্তাব করা হলো, এখনো সংকোচ গেল না স্নেহময়দার। অত্যন্ত অচল অভিনেতা, পদে পদে প্রম্প্‌ট্ করতে হয়।

"তুমি কি কষ্ট করে রাজি হবে আমাকে—"

"তোমাকে মার দিতে ?"

স্নেহময় সভয়ে বলল, "না, না, তা কি বলেছি ?"

"বল না কী দিতে ? তোমার দিকে চাট্‌নীটা পাস করে দিতে ?

"না, ধন্যবাদ। চাট্‌নী খেলে আমার অম্বল হয়।"

বহু পরিশ্রমে স্নেহময় যা ব্যক্ত করল অশোকা তা ভালো করে না শুনেই ফস করে বলে বসল, "হাঁ, আমি কষ্ট করে তোমাকে বিয়ে করতে রাজি আছি।"

তার পরে রহস্য করে বলল, "কেমন ? তর সইবে তো ? না আজকেই ?"

এ আরেক অশোকা। স্নেহময় এতোটা ভাবেনি। ভ্যাবাচাকা খেয়ে বলল, "আজ আমি সাক্ষী কোথায় পাব ? ম্যারেজ রেজিষ্ট্রার রাজি হবে কেন ?"

"Come, Come !" অশোকা তার ভাবী স্বামীকে দাম্পত্য কথোপকথনের নমুনা শোনাল। "মা'র কাছে কে বলেছিল এক নিঃশ্বাসে বিয়ে করে কন্টিনেণ্টে হানিমুন করতে যেতে ?"

স্নেহময়টা নিতান্ত নীরেট। বলল, "সে রকম অভিপ্রায় ছিল বটে। তা বলে আজকেই তো বিয়ে করতে পারিনে। মানে আমি পারি, কিন্তু—"

"Stop it !" অশোকা স্নেহময়কে হতবাক করল। কিন্তু তার স্বর এত উচ্চে উঠল যে তার মা বুঝতে পারলেন ঠিক প্রেমালাপ নয়, অন্য কিছু।

"কী হয়েছে, ডারলিং ?"

"কিছু নয়, মা। স্নেহময়দা প্রপোজ করেছেন, আমি—"

"তুমি কী বলেছ ?" মা ব্যস্ত হয়ে কণ্ঠক্ষেপ করলেন।

"আমি বলেছি, আমি তো রাজি।"

"থ্যাঙ্ক গড।" মিসেস তালুকদার ভগবানের উদ্দেশে ঊর্ধ্বমুখী হলেন। তারপরে মুকুলকে ধরিয়ে দিলেন, "থ্রী চীয়ার্স।"

মুকুল থ্রী চিয়ার্স দিতে ওস্তাদ। তার স্কুলে তো হিপ হিপ হুরে লেগেই আছে।

চীয়ার্স শুনে নেলী ছুটে এল, রাঁধুনীও। কুকুরটাও ঘেউ ঘেউ করে চীয়ার্স জানাল। হৈ চৈ যখন থামল তখন স্নেহময়কে দেখা গেল অশোকার সামনে দাঁড়িয়ে আংটি পড়িয়ে দিতে উদ্যত। অশোকা কি সহজে পরতে চায়! আঙুলগুলোকে এমন করে বাঁকায় যে স্নেহময় দস্তুরমতো বক্সিং করে। যেই আংটিটি পরিয়ে দেয় অমনি টপ করে নীচে পড়ে যায়। কুড়াতে কুড়াতে স্নেহময় হায়রাণ।

স্নেহময় তার ভাবী শাশুড়ীকে ঢিপ করে একটা প্রণাম করল দেখে সব চেয়ে আশ্চর্য হলেন তিনি স্বয়ং। একটু নত হয়ে দেখলেন তাঁর পায়ের কাছে রয়েছে একটি ঝক্ঝকে সোনার ব্রুচ। "ওহ্, হাউ ভেরি নাইস" বলে তিনি সেটি সযত্নে তুলে নিলেন। "থ্যাঙ্ক ইউ, মাই চাইল্ড" বলে তিনি স্নেহময়কে আশীর্বাদ করলেন।

"হে আমার বৎসগণ," তিনি ইংরেজীতে বললেন, "তোমরা আজ আমাকে যেমন সুখী করলে ভগবান তোমাদেরকে তেমনি সুখী করুন।"

স্নেহময় উচ্ছ্বাসভরে কী যেন নিবেদন করতে চাইল, কিন্তু অশোকার মুখভাব নিরীক্ষণ করে নিবৃত্ত হলো।

মিসেস তালুকদার বললেন, "বাকি থাকল পাঁজি দেখে বাগ্দানের দিন ফেলা।"

"পাঁজি দেখে ?" স্নেহময় চমৎকৃত হল। পাঁজি দেখে বিয়ের দিন

পড়ে তা সে শুনেছে, কিন্তু বাগ্‌দানের দিন ? ও হরি ! পাঁজিতে যদি সুদিন না থাকে তবে কি ছ'মাস ধৈর্য ধরতে হবে ?

"পাঁজি কেন, ক্যালেণ্ডার—" স্নেহময় অনুযোগ করতে যাচ্ছিল।

তিনি তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "ভুলে যেয়োনা, আমরা হলুম হিন্দু।"

তা বটে। স্নেহময়রা যদিও ব্রাহ্ম, অশোকারা তা নয়, তারা ক্রিয়া কলাপে হিন্দু। যাকে বলে রিফর্মড হিন্দু। স্নেহময়ের তার জন্যে মাথাব্যথা নেই, শ্বশুর শাশুড়ী যখন তার ইষ্টদেবতা তখন শ্বশুর শাশুড়ীর ইষ্টদেবতার কাছে মাথা নোয়াতে তার কিসের আপত্তি ? কিন্তু পাঁজি মানতে গেলে সবুর করতে হয়।

"মুকুল, যাও তো নিয়ে এস হিন্দু almanac. সাবধান! হিন্দু almanac বলেছি। Old Moore চাইনি।"

পাঁজিতে বাগ্‌দানের কথা ছিল কি না জানিনে, মিসেস তালুকদার উল্লাসভরে বললেন, এই যে! ১লা আষাঢ় অতি শুভদিন।"

তারপর স্নেহময়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমার দিক থেকে দেখলে একটু দেরি হয়, তা মানি। কিন্তু অশোকার বাবার পক্ষে ওই সুবিধা।"

বেচারা স্নেহময়। তার উপর ফরমাস হলো সেই রাত্রেই তার ভাবী শাশুড়ীর খরচে তার ভাবী শ্বশুরকে cable করতে, বাগ্‌দানের দিন ১৫ই জুন। উপস্থিতি একান্ত আবশ্যক।

হায়! পাণিপ্রার্থী যুবকের বেদনা কেউ বোঝে না। টেবিলের উপর মদিরা ছিল। মিসেস তালুকদার যদিও পছন্দ করেন না, তবু এই উপলক্ষে পানীয় পরিবেশন করতে হয় বলে করা হয়েছিল। তবে তাঁর ধারণা ছিল তাঁর ভয়ে কেউ তা স্পর্শ করবে না। দেখা গেল স্নেহময় তাঁর উদ্দেশে গ্লাস উঁচিয়ে এক গণ্ডূষে নিঃশেষ করেছে।

অশোকা লক্ষ্মী মেয়ে। কিন্তু কী যে খেয়াল চাপল তার, সেও এক চুমুক খেয়ে আজকের দিনটিকে স্মরণীয় করল।

সে রাত্রে অশোকা যখন ঘরে গেল তখন তার মাথা ঘুরছিল, পা টলছিল। বিছানায় আছাড় খেয়ে বালিশ চাপড়াতে চাপড়াতে বলল, "ওগো আমি কী করলুম! কী করলুম!"

পশু যেমন ফাঁদে পড়লে করে তেমনি ভাবে ছট্‌ফট্ করতে করতে বলল, "হে ঈশ্বর! হে ঈশ্বর!" ব্যাকুল স্বরে বলল, "অন্তর্যামী, আমি তো মনে বলি নি, মুখে বলেছি। ফিরিয়ে নিতে পারিনে?"

তারপর উঠে গিয়ে মাথায় ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দিল। বলল, "আমার সুখ? আমার সুখ? আমার সুখ বুঝি ফুরাল?"

তার আবোল-তাবোলের আওয়াজ শুনে তার মা এসে শুধালেন, "কী হয়েছে, মণি? নেশা হয়েছে?"

অশোকা বলল, "না মা! ও কিছু নয়।"

তার মা তাকে নিজের ঘরে ধরে নিয়ে গেলেন, নিজের পাশে শোয়ালেন। সে ক্রমে শান্ত হল, ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমঘোরে একবার শুধু বলল, "কাপুরুষ!"

দেয়ালে ঝুলছিল হর-পার্বতীর পট, অশোকার মা নিত্য পূজা করেন। তিনি হঠাৎ উঠে প্রণাম করলেন সেখানে। বললেন, "এতোদিন পরে মেয়ে আমার পরের হাতে পড়ল। বুঝতে পারছ মা'র মনের কষ্ট। কী করে এই অবোধ মেয়ে পরের ঘর করবে, কী করে একে ছেড়ে আমি বাঁচব? আশীর্বাদ কর। আমার অশোকা, আমার স্নেহময় চির সুখী হোক। হর-পার্বতী, তোমাদের কৃপায় হর-পার্বতীর মতো আদর্শ দম্পতী হোক তারা।"

ঝাঁপ

১

না, না, আপনাদের ও ধারণা ভুল। তারাপদ চোর নয়, জোচ্চোর নয়, ধড়িবাজ নয়। তারাপদ হচ্ছে গভীর জলের মাছ। সেই যে তিনটি মাছের গল্প আছে তাদের মধ্যে যেটির নাম অনাগতবিধাতা সেটির নাম তারাপদ কুণ্ডু।

ভারতবর্ষে যেদিন স্প্র্যাট ও ব্র্যাডলী গ্রেপ্তার হন ইংলণ্ডে সেদিন তারাপদর চোখে সর্ষে ফুল। তারপর যেদিন মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা রুজু হয় সেদিন তারাপদর মনে জুজুর ভয়।

"কমরেড কুণ্ডু, এ কী খবর?" তাকে ঘেরাও করে তার সাগরেদরা।

"কেন, কী হয়েছে?" তারাপদর ঠাণ্ডা মেজাজে পাইপ ধরায়। "কে না জানত যে এমন হবে? আমি তো সেই কবে থেকে ভবিষ্যদ্বাণী করে আসছি যে ইণ্ডিয়া গবর্নমেণ্ট একদিন জাল গুটিয়ে আনবে, তখন ধরা পড়বে সেই সব মাছ যারা ডুব দিতে না শিখে বুক ফুলিয়ে বেড়ায়। কেমন, ফলল কিনা আমার কথা?"

কোন দিন যে তারাপদ অমন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল তা অবশ্য কারো স্মরণ ছিল না। স্বয়ং তারাপদ কোনো দিন কল্পনাও করেনি যে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ উঠতে পারে।

"যাক, এ নিয়ে তোমরা উদ্‌বেগ বোধ কোরো না।" তারাপদ অভয় দেয়। "মামলা তো? আর তো কিছু নয়? সাজা হলে তার

উপর আপীল আছে। আপীলে হারলে বড় জোর জেল বা দ্বীপান্তর।"

"সাকো আর ভানজেটির যে প্রাণদণ্ড!" বলে উঠল এক বেরসিক।

"হুঁ। প্রাণদণ্ড অত সোজা নয় ভারতে।" তারাপদ বলতে বলতে তলে তলে শিউরে ওঠে। কে জানে, যদি প্রাণদণ্ডই হয়। "হলেই বা। আমার মনে হয় আমাদের প্রাণ এতোটা মূল্যবান নয় যে আমরা ইতস্ততঃ করব। করবে তোমরা কেউ?"

আত্মা প্রসাদের আত্মারাম জানেন প্রাণ দিতে তিনি ইতস্ততঃ করবেন কি না। বললেন, "যে কোনো নির্যাতনের জন্যে আমরা প্রস্তুত।"

"মৃত্যুর সঙ্গে," হাইদারী বললেন, "আমার বিয়ের কথা আছে।"

তারাপদ তার অমাত্যদের অসমসাহস দর্শন করে হৃষ্ট হল, কিন্তু সেই মুহূর্তে স্থির করে নিল ইংলণ্ডে আর বেশি দিন নয়! কী জানি কোন দিন না রুজু হয় ফিন্‌স্‌বেরী কন্‌স্পিরেসী কেস!

নির্বাচনকার্যে তারাপদর উৎসাহ একটুও কমল না, অপরের বিমনাভাব তার তামাশার খোরাক হল। "পুলিশের স্বপ্নে বিভোর থেকো না হে। পুলিশ একদিন শুভাগমন করবেই।...ধন্য তোমার প্রাণ, যার জন্যে তুমি এতো চিন্তিত। আমাদেরও তো প্রাণ আছে। কই, প্রাণের চিন্তা তো নেই।"

তারাপদ সকলের পিঠ চাপড়ে দেয়, বগলে হাত গুঁজে দিয়ে জড়িয়ে ধরে। "সাবাস, কমরেড। খুব খাটছ তুমি। এই তো চাই। কমিউনিজম প্রত্যাশা করে, প্রত্যেক কমরেড তার কর্তব্য করবে।"

বাদলের সঙ্গে তারাপদর ক্বচিৎ দেখা হয়। এক বাড়িতেই থাকলে কী হবে, নির্বাচনের গোলমালে কে কোথায় ছিটকে পড়ে তার ঠিক

থাকে না। হঠাৎ দেখা হয়ে গেলে তারাপদ বাদলের হাতে ঝাঁকানি দিয়ে বলে, "খুব নাম কিনলে। কই, কাউকে তো দেখলুম না তোমার মতো রক্ত জল করে দিনরাত খাটতে। সাকলাতওয়ালা জিতবেনই। এবং একমাত্র তোমার জন্যে।"

বাদল অপ্রস্তুত বোধ করে। বাস্তবিক সে এতোটা প্রশংসার যোগ্য নয়। তার অনেকটা সময় যায় ব্রনস্কির ফ্ল্যাটে। সেখানে মাদাম ব্রনস্কি তার মূর্তি নির্মাণ করেন আর ব্রনস্কি করেন তার সঙ্গে তর্ক। মূর্তিটা কিছুতেই তার পছন্দ হচ্ছে না। গাল দুটো চোপ্‌সা, মাথার চুল স্বল্প। বেশ, তা না হয় বাস্তবতার খাতিরে সহ্য হয়। কিন্তু বাদলের পরম সম্পদ্ তার চোখ দু'টি। গোয়েন বলতেন, "বাদল, তোমার চোখে চোখ রেখে আমি কাকে দেখতে পাই, জানো? যীশুকে।" তার সেই আশ্চর্য দু'টি চোখ মাদাম ব্রনস্কির কল্যাণে না থাকার সামিল। বাদল তাই রোজ একবার গিয়ে চোখের সঙ্গে চোখাচোখি করে, দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে জানায়, "হলো না।" মাদামের অসীম ধৈর্য। একটি মূর্তি ভালো হলে দশটির অর্ডার আশা করেন, ভারতীয় ছাত্রেরা নিশ্চয় সকলেই রাজপুত্র।

"আমি," বাদল সসংকোচে বলে, "কীই বা করেছি! তোমার তুলনায় আমার—"

"থাক, থাক, বলতে হবে না। তোমার সঙ্গে আমার সেই প্যাক্ট্ মনে আছে তো? এবার সাকলাতওয়ালা, এর পরের বার বাদল সেন, তার পরের বার তারাপদ কুণ্ডু। অবশ্য ততোদিনে হয়তো পার্লামেণ্ট উঠে যাবে, সোভিয়েট গজাবে। কিন্তু মনে রেখো, কমরেড। Gentlemen's agreement."

এমনি করে সবাইকে তারাপদ হাতে রাখে। যদি বা আগে

কখনো কখনো মেজাজ গরম করেছে মীরাট মামলার পর থেকে তার মেজাজটি একেবারে বরফ। ডিক্‌টেটারগিরি ফলাতে আর যার প্রবৃত্তি হোক, তারাপদর প্রবৃত্তি নির্বাচনের ফলাপেক্ষী। সাকলাত-ওয়ালার জয় হলে তার ভয় কিছু কমবে, অন্তত কমিউনিস্টদের পক্ষ নিয়ে পার্লামেণ্টে প্রশ্ন করবার কেউ থাকবে। সাকলাতওয়ালা যদি হারেন তবে তারাপদর ইংলণ্ডে বাস করা নিরাপদ হবে না। ভারতে ফেরা তো প্রশ্নের অতীত।

তারাপদর মস্ত একটা গুণ, মনের কথা মনে মনে রাখে, কাউকেই জানতে দেয় না। তার অভিন্নহৃদয় বন্ধু কমসে কম আট জন কি দশ জন। সেই সব অন্তরঙ্গদের সঙ্গে তার কতো রঙ্গই হয়, নাইট ক্লাব তো তারাপদ এখনো ছাড়েনি। কিন্তু যা গোপনীয় তা এক জানে তারাপদ, আর জানেন বিধাতা (যদি থাকেন)। মীরাট মামলার খবর পেয়ে তারাপদ যে প্যারিসের দিকে পা বাড়াবার চেষ্টায় আছে তা সকলের অগোচর।

ফ্রান্সে গিয়ে পসার জমানোর জন্যে মূলধন দরকার। শুধু হাতে সে দেশে গিয়ে করবে কী? তা হলে জোগাড় করতে হয় টাকার। টাকা যা ছিল তার সবটা খাটছে কারবারে। কারবার গুটিয়ে নেবার উপায় নেই। কারবার থেকে কিছু কিছু তুলে নেওয়া চলতে পারে। তারাপদ প্রথমে সেই ফন্দী আঁটল। কিন্তু তাতেও যথেষ্ট হয় না। কাজেই ঠকাতে বাধ্য হয়। চুরি করতেও। যারা রাজনৈতিক কর্মী তাদের এসব নৈতিক শুচিবাই থাকা সঙ্গত নয়, থাকলে কাজ মাটি হয়। দেশের জন্যে ডাকাতি করে তারাপদর পিসেমশাই জেলে গেছলেন, ডাকাতীর মাল কুণ্ডু পরিবারের তেজারতীর মূলধন হয়েছিল। এও কমিউনিজমের জন্যে।

"আমার কী!" তারাপদ মনকে বোঝায়। "আমি কি টাকা নিয়ে স্বর্গে যাচ্ছি? যাচ্ছি তো মৃৎ স্বর্গের সন্ধানে। একদা যদি শ্রেণীশূন্য সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় তবে তা আমারই মতো নিষ্কাম কর্মীর নিরবচ্ছিন্ন এক্স্পেরিমেণ্টের ফলে। ইংলণ্ডে না হয় তো ফ্রান্সে হবে। সেখানে না হয়, জার্মানীতে। রাশিয়া তো হাতের পাঁচ।"

এ বাসার নিয়ম এই যে ছোট ছোট স্যুটকেস যার যার শোবার ঘরে থাকে, বড় বড় স্যুটকেশ ও ট্রাঙ্ক সার্বজনীন গুদাম ঘরে। যেমন জাহাজের নিয়ম। চাবীটি তারাপদর পকেটে। সেটি নিয়ে সে বাইরে বেরিয়ে গেলে তুমি আমি নাচার। তাই তাকে চব্বিশ ঘণ্টা নোটিস দিয়ে রাখতে হয়, যদি গুদামে ঢুকে বাক্স খুলতে ইচ্ছা যায়।

নির্বাচনের কিছুদিন আগে তারাপদ আবিষ্কার করল যে বেসমেণ্টের গুদামঘরে মেরামতের অবকাশ আছে, মেরামত করলে ওর পরিসর বাড়বে। অমনি হুকুম দিল মালগুলো ওখান থেকে সরিয়ে তার আফিসে পাঠাতে। সকলেই নির্বাচন উপলক্ষে ব্যস্ত, বেশির ভাগ বাইরে ঘুরছে। তারাপদর হুকুমনামা যদিও সকলের ঘরে পৌছাল তবু চোখে পড়ল মাত্র দু'একজনের। তাঁরা আপত্তি জানালেন না। সুতরাং মাল চালান হলো ইণ্টারন্যাশনাল ফিল্ম এক্স্চেঞ্জের আপিসে। সেখানে হাজির হবার দিন দুই পরে সাকলাতওয়ালার পরাজয়। তা শুনে তারাপদই সর্বপ্রথম তার করে ব্যথা নিবেদন করল। আর সেই দিনই মালগুলি প্রেরণ করল বিভিন্ন pawn shopএ।

কেবল স্যুটকেস ও ট্রাঙ্ক নয়। কতজনের কতরকম শখের জিনিস ছিল। বাদলের বই, ব্রাকনারের chewing gum, রবসনের ski খেলার সরঞ্জাম, এমনি কত কী। এ সব তো অল্ কমরেড্স্ ফ্রী

য়্যাসোসিয়েশনের। ইণ্টারন্যাশনাল ফিল্ম একস্‌চেঞ্জের বহু ফিল্ম সোভিয়েট রাশিয়া থেকে আমদানি হয়েছিল। সেগুলিও চলল প্যারিসে। ছিল কতকগুলি জার্মান ফিল্মও। সব ধার করা। তারাপদ দাম দিয়ে কিনত না, ধারে আনত, ফেরৎ দিত। তার সঙ্গে কী একটা বন্দোবস্ত ছিল, খুঁটিনাটি আমরা জানতুম না। ও ব্যবসা তারাপদর একার, ওতে অন্যান্য কমরেডদের অংশ ছিল না। তবে টাকা তারাপদ সকলের কাছ থেকে নিত। বলত, "লোকসান হলে টাকার আসলটা পাবে। লাভ হলে পাবে টাকার সঙ্গে বোনাস। সুদ কিংবা মুনাফা আশা কোরো না, কারণ কমিউনিজম ওর বিপক্ষে।"

অবশ্য এ কথা বলত কমিউনিস্টদের। মিসেস গুপ্ত ইত্যাদি বুর্জোয়াদের কাছে তার অন্য রূপ। তাঁদের বলত, "টাকায় টাকা লাভ। তা ছাড়া এটা আমাদের নিজেদের ঘরোয়া ব্যাপার। আমরাই অভিনেতা, আমরাই অভিনেত্রী, আমরাই ডিরেক্টর। আপনি কোন পার্ট পছন্দ করেন, বলুন। একবার স্টুডিওটা খোলা হোক, তারপর দেখবেন ওটা আপনারই রাজত্ব।"

২

সেইদিনই বিলাতী মুদ্রাগুলি ফরাসী মুদ্রায় রূপান্তরিত করে ফরাসী ব্যাঙ্কে স্থানান্তরিত করে তারাপদ নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচল। এবার শুধু বাকি থাকল পাসপোর্ট ও টিকিট। তারাপদ বাসায় ফিরল।

"কমরেড কুণ্ডু," তারাপদকে ঘিরল তার কমরেডের ঝাঁক, "এ কী অঘটন! সাকলাতওয়ালার তো হারবার কথা নয়।"

তারাপদ অম্লানবদনে উত্তর করল, "চক্রান্ত। ক্যাপিটালিস্টরা

সব বেটাই একজোট হয়েছে। জমিদার, ব্যাঙ্কার, ব্যারিস্টার, ডাক্তার, সিবিল সার্ভেন্ট, দোকানদার—কতো নাম করব, একধার থেকে সব শালাই চক্রান্ত করেছে, যাতে আমাদের ভোটসংখ্যা কম হয়।"

কমরেডরা তো তাজ্জব। এত বড় একটা চক্রান্ত চলছিল সে সংবাদ তাদের কানে যায়নি বলে নিজের নিজের কানের উপর তাদের রাগ ধরছিল, নিজের কান না হলে মলতে রাজি ছিল।

"কমরেডস্, তোমরা তোমাদের যথাসাধ্য করেছ। সাকলাত-ওয়ালার পক্ষ থেকে আমিই তোমাদের অজস্র ধন্যবাদ দিই। কিন্তু যাদের উপর ব্যালট বাক্সের ভার তারাই যদি অসাধু হয় তবে তোমরা করবে কী? আমার হাতে সাক্ষী প্রমাণ আছে, আমি চ্যালেঞ্জ করতে পারি, কিন্তু জানো তো? পুলিশও ক্যাপিটালিস্ট, আমাকে ধরে নিয়ে হাজতে আটক করবে। নইলে দেখতে, আমি এমন চ্যালেঞ্জ করতুম যে চারদিকে টিটি পড়ে যেত।"

এই দায়িত্বহীন উক্তি কেউ বিশ্বাস করল না। কেননা ইংলণ্ডের নির্বাচন ব্যবস্থা এমন নিখুঁৎ যে তাতে অসাধুতার অবকাশ নেই। তারাপদও বুঝতে পারল যে চালটা বেচাল হয়েছে। কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, "কোথাকার পচা পার্লামেন্ট, তার আবার নির্বাচন! আমি যা বলতে চেয়েছিলুম তা এই যে এখন থেকে আমরা আমাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করব প্রত্যক্ষ সংগ্রামে। নির্বাচনের দিকে ফিরেও তাকাব না।"

তারাপদর আস্তানায় ভাঙন ধরল। তারাপদ যেমন সাকলাত-ওয়ালাকে তার করেছিল ওসমান হাইদারী তেমনি তার করল প্রধান মন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাক্‌ডোনল্‌ডকে। আর আত্মা প্রসাদ তো কার্ড দিয়ে দেখা করে এলো ভারত-সচিব ওয়েজউড বেন সাহেবের সঙ্গে।

পাসপোর্টের জন্যে যে কয়দিন দেরি হল সে কয়দিন তারাপদ অর্থকরী বিদ্যায় প্রয়োগ করল। ধার করল চোখ বুজে। একটি যুবক একদিন অক্‌স্‌ফোর্ড স্ট্রীট দিয়ে যাচ্ছে, তাকে পাকড়াও করে বলল, "কেমন আছেন, মিঃ বোস? নমস্কার।"

যুবকটি বলল, "আমার নাম তো বোস নয়, আপনি ভুল করেছেন।"

"বোস নয়? তবে তো ভারি ভাবনায় পড়লুম। ঐ যে ব্যাঙ্ক দেখছেন ওখানে গেছলুম টাকার আশায়। গিয়ে দেখি ব্যাঙ্ক বন্ধ হবার মুখে। ওদিকে আমার মোটর রয়েছে পুলিশের পাহারায়। তেল নেই, তেল বিনা অচল। কী করি, বলতে পারেন, সার?"

যুবকটি বিশ্বাস করল। কিন্তু পকেটে তার কয়েকটি রৌপ্যমুদ্রা ছিল, পাঁচ ছয় শিলিং মাত্র।

"নিন না, সার, আমার এই চেকখানা। এ নিয়ে একটা পাউণ্ড দিন, দয়া করে। লয়েড্‌স ব্যাঙ্কের চেক, বিশ্বাস করতে পারেন।"

যুবকটি তা দেখে বোকা বনল। "থাক, আপনার চেক নিয়ে আমার কাজ নেই। আপনি এক পাউণ্ড চান, আমি আপনাকে পাঁচ শিলিং দিতে পারি। ওতে আপনার পেট্রল কেনা হবে।"

তাই নিল তারাপদ। "থ্যাঙ্ক ইউ, মিঃ রায়।"

মিঃ রায় পরে আফসোস করেছিলেন কেন তারাপদর চেক নেননি। নেননি রক্ষা। তারাপদর চেক যারা যারা নিয়েছিল তাদের অনেকের কাছে পুলিশ গেছল তার ঠিকানার তল্লাসে।

তারাপদর শেষটা এমন হয়েছিল যে সে বন্ধুবান্ধবের ওভারকোট পর্যন্ত ধার করত—ওভারকোট বা রেন কোট। বলা বাহুল্য সেগুলি সেকণ্ডহ্যাণ্ড পোশাকের দোকানে বিক্রী করত। যথালাভ।

একদিন স্নেহময়ের ওখানে উপস্থিত হয়ে তারাপদ বলল, "বড়

বিপদে পড়ে তোমার দ্বারস্থ হলুম, স্নেহময়। নইলে তোমার সেই punch আমি জীবনে ভুলব না। যাকে বলে ওস্তাদের মার। বাব্‌বা, আমার ঘাড়ের উপর যে মুণ্ডুটা আছে সে কেবল আমি তারাপদ কুণ্ডু বলেই। আর কখনো কাউকে অমন একখানি punch দিয়ো না হে। কে কখন অক্কা পেয়ে তোমায় মক্কা পাঠাবে।”

স্নেহময় খোশ মেজাজে ছিল। অশোকা তাকে কথা দিয়েছে। তারাপদকে অভ্যর্থনা করে বলল, “আমি তো শুধু তোমার টুঁটিটা এক্‌খানি টিপে ধরেছিলুম। ওকে তো punch করা বলে না।”

“যার নাম চালভাজা তারই নাম মুড়ি। আমি তোমার মতো বিখ্যাত বক্‌সার নই, আমি ওকেই বলে থাকি punch. কিন্তু শোন হে। আমার একটু উপকার করতে পারো?”

স্নেহময় বলল, “নিশ্চয়। যদি আকাশের চাঁদ পাড়তে না বল।”

“না, আমাদের মতো গরিব মানুষের ও দুরাশা নেই। চাঁদ পাবে তোমরাই। আপাতত আমাকে একখানা পাসপোর্ট পাইয়ে দাও হে।”

“কেন? কী ব্যাপার? কোথায় যাচ্ছ? আমার বাগ্‌দানের আগে তোমার যাওয়া কিছুতেই হতে পারে না। তুমি গেলে আমার best man হবে কে?” স্নেহময় কখনো এক সঙ্গে এতোগুলি কথা বলে না।

“শুনে খুশি হলুম তোমার বাগ্‌দানের বার্তা, আশা করি দেরি নেই। ততোদিন যদি থাকি তো অবশ্য যোগ দেব, আমাকে না ডাকলেও আমি আসবই। কিন্তু ইতিমধ্যে একটু দয়া কর। সার অতুল তোমাকে চেনেন, মিঃ মল্লিকও তোমার পিতার বন্ধু বলে শুনেছি। ওঁরা যদি এক লাইন লিখে দেন তা হলে আমার পাসপোর্ট পেতে এত হাঙ্গাম পোহাতে হয় না।”

"কেন? হয়েছে কী?"

"হবে আর কী! আমি যে একজন কমরেড।"

"I see! আচ্ছা, আমি সার অতুলকে বুঝিয়ে বলব। তোমার যদি বিশেষ তাড়া না থাকে তা হলে একদিন ডিনারে ওঁর সঙ্গে দেখা হবে। আমার শাশুড়ী—"

"ভাই, তোমার যখন এমন শাশুড়ীভাগ্য তখন তুমি আজ এখনি আমার উপকার করতে পারো। তুমি ওঁকে, উনি সার্ অতুলকে ও তিনি পাসপোর্ট অফিসারকে টেলিফোন করলে মোট পনেরো মিনিটে কাজ হাসিল হবে। ততক্ষণ আমি বসে বসে তোমার ড্রেসিং গাউনটা পরখ করি। খাটি জিনিস হে। কোথায় কিনলে?"

কাকে দিয়ে কোন কাজ সমাধা হয় তারাপদ তা অভ্রান্তরূপে জানত। স্নেহময়ের দৌত্যে সেইদিনই পাসপোর্ট পাওয়া গেল। দক্ষিণাস্বরূপ তারাপদ স্নেহময়ের ড্রেসিং গাউনটি হস্তগত করল। "ওহে একদিনের জন্যে এটি ধার দিতে পারো? কালকেই—বুঝলে?"

স্নেহময়ের তখন দিল্‌খুশ। সে শুধু ভাবছে তার বাগ্‌দানের কথা। বলল, "কাল কেন, যেদিন তোমার সুবিধা।"

তারাপদ যেদিন অদৃশ্য হল তার বহু পূর্বেই তার অস্থাবর সম্পত্তি দেশান্তরিত হয়েছিল। সঙ্গে একখানি য়্যাটাশে্ কেস নিয়ে সে সহজ ভাবে বাসার বাইরে গেল। কেউ অনুমানও করল না যে লোকটা ফ্রান্সে যাচ্ছে।

রাত্রে ফিরল না। তাও এমন কিছু অস্বাভাবিক নয়। পরদিনও কেউ সন্দেহ করত না, কিন্তু পুলিশের লোক এসে খোঁজ করতে শুরু করল।

তারপর কী করে যে রাষ্ট্র হয়ে গেল, একে একে বাড়িওয়ালা কসাই

মুদি দুধওয়ালা ইত্যাদি, যাবতীয় পাওনাদার এসে কলরব বাধাল। তখন কমরেডদেরও মনে পড়ল যে বেসমেণ্ট মেরামত হবার নামে বড় বড় স্যুটকেস ও ট্রাঙ্ক বাসা থেকে অন্যত্র সরানো হয়েছে। যাদের টাকা ছিল তারাপদর কাছে তারা হিসাব করে দেখল যে প্রায় হাজার-খানেক পাউণ্ড একা কমরেডদেরই। হাইদারী, আত্মা প্রসাদ এরা বাসা ছেড়েছিল বটে, কিন্তু টাকা ফেরৎ নেয়নি, সেই টাকা ফেরার হয়েছে দেখে তাদের টনক নড়ল। কমিউনিস্ট হয়েও তারা টাকার শোকে পুলিশের কাছে হাঁটাহাঁটি অভ্যাস করল।

বাদল অন্যমনস্ক ছিল, জানত না কোথাকার জল কোথায় গড়িয়েছে। ব্রনস্কিদের ফ্ল্যাটে তার মূর্তি নির্মাণ শেষ হলেও কিসের আকর্ষণে সে পুনঃপুনঃ সেখানে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে আসত, বুঝ সাধু যে জানো সন্ধান। তার হুঁস হলো যখন পুলিশের লোক তার ঘরে ঢুকে খানাতল্লাসী করে গেল। পেলো না বিশেষ কিছু। তারাপদর ঠিকানা বাদলের ঘরে থাকবে, তারাপদ এত কাঁচা ছেলে নয়। কিন্তু বাদলের আক্কেল হলো। সে খবর নিয়ে টের পেলো তার স্যুটকেস ইত্যাদি তারাপদর মতো উধাও। তার টাকা তো গেছেই, খাতা কেতাব চিঠি পত্র সব গায়েব।

৩

বাদল মাথায় হাত দিয়ে বসল। বই চুরি গেলে কেনা যায়, কিন্তু বাদলের কোনো কোনো বই দুর্মূল্য। বই তবু ব্রিটিশ মিউজিয়মে গেলে পড়তে পাওয়া যাবে, কিন্তু বাদল তার চিন্তাধারার ক্রমবিকাশের খেই খুঁজে পাবে কোথায়, তার নোটগুলি যদি না মেলে? প্রতিদিন

যখন যে ভাবনা মনে উদয় হতো এক এক টুক্‌রো কাগজে টুকে রাখত। কখনো খবরের কাগজের মার্জিনে, কখনো বাসের টিকিটের পিঠে। এ ছাড়া তার একরাশ খাতাও ছিল, তাদের পাতায় পাতায় কতো রকম আইডিয়া। এ সব মালমশলা তারাপদর কাজে লাগবে না, কিন্তু যদি কোনো ভাবুকের হাতে পড়ে তবে বাদলের আইডিয়াগুলি পরের নামে প্রচারিত হবে। চিন্তা করে মরল বাদল আর নাম করে অমর হল অন্য কোনো ভাবুক! বাদলের কান্না পায়।

"আমার স্বাক্ষর! আমার স্বাক্ষর"! বাদলের চোখে বাদল নামে। "আমার চিন্তার অঙ্গে আমার স্বাক্ষর রয়েছে, আমার খাতার পাতায় আমার অদৃশ্য স্বাক্ষর! আমার নাম চুরি গেল যে! আমার নাম!"

কিন্তু এ দহনও অসহন নয়। বাদল যদি বেঁচে থাকে তবে আরো কতো কী লিখবে। তার মগজ যতোদিন আছে তার কাগজ চুরি গেলেও সর্বনাশ হয়নি। কিন্তু সর্বনাশ হয়েছে তার চিঠিগুলি গিয়ে। ওসব চিঠি সে কাকে দিয়ে আবার লেখাবে! তার অগণ্য ভক্ত তাকে অসংখ্য প্রশ্ন করেছে, সে সব প্রশ্নের সে রাত জেগে জবাব লিখেছে। ভক্তির সঙ্গে প্রীতিও পেয়েছে অশেষ, প্রীতির সঙ্গে প্রশস্তিও। কোনো কোনো চিঠি মনীষীদের লেখা, বাদলের প্রশ্নের উত্তর। যাঁদের অটোগ্রাফও উঁচু দরে বিকায় তাঁদের স্বহস্তের লিপি। হায়, তারাপদ কি এগুলির মর্ম বুঝবে! তারাপদর যেমন বিদ্যা সে ডি. এইচ. লরেন্স ও টি. ই. লরেন্স-এর পার্থক্য জানে না।

চিঠির শোকে বাদল পাগলের মতো পায়চারি করতে লাগল, মাথার চুল যে ক'টি অবশিষ্ট ছিল সে ক'টি প্রায় নিঃশেষ হতে চলল।

"আমার চিঠি! আমার চিঠি কোথায় পাব! সে সব দিন কি আর ফিরবে, সে সব চিঠি কি কেউ লিখবে!" বাদল যে কেন ওসব

চিঠি নিজের কাছে না রেখে গুদামঘরে পাঠাল এর দরুণ নিজেই নিজের বিরুদ্ধে নালিশ করল।

"Are there two such fools in the world?" বাদল শুধাল বাওয়ার্সকে।

বাওয়ার্স সব শুনে বললেন, "It seems there are."

তাঁরও যথাসর্বস্ব গেছে। বাদলের যা গেছে তা ব্যক্তিগত, কিন্তু বাওয়ার্সের কাছে অনেক রাজনৈতিক দলিল ছিল, ওসব ইতিহাসের সামিল। গত জেনারল স্ট্রাইকের সময় বাওয়ার্স ছিলেন ধর্মঘটীদের পক্ষে, তখন তাঁর হাত দিয়ে বহু কাগজপত্র চলাচল করেছিল। বাওয়ার্স কোনোটার নকল, কোনোটার আসল নিজের কাছে রেখে দিয়েছিলেন। পরে ইতিহাস লিখতেন!

"কিন্তু সেন," বাওয়ার্স বাদলের হা হুতাশ এক নিঃশ্বাসে থামিয়ে দিলেন, "আমি কি জানতে পারি কখন তুমি যাচ্ছ?"

বাদল যেন আকাশ থেকে পড়ল। "যাচ্ছি! কেন, যাব কোথায়?"

"তুমি কি লক্ষ্য করনি যে একে একে প্রত্যেকেই গেছে কিংবা যাচ্ছে?" এ বাসা কুণ্ডুর নামে ইজারা। ভাড়া বাকি পড়েছে।"

বাদল অবশ্য লক্ষ্য করেছিল যে সাকলাতওয়ালার পরাজয়ের পর থেকে বিস্তর কমরেড ইস্তফা দিয়ে বিদায় নিয়েছেন। তা হলেও বাড়ি ছেড়ে দেবার প্রশ্ন ওঠেনি। বাড়ি ছেড়ে দেওয়া দূরে থাক, সে সুধীদাকে কথা দিয়েছে যে ইচ্ছা করলে এখানে এসে থাকতে পারে। সে তো এমন কোনো আভাস পায়নি যে তারাপদ অন্তর্ধান করবে।

"আমি যে ভয়ানক অপ্রস্তুত হব, বাওয়ার্স," বাদল বলল, "যদি এ বাসা একেবারে খালি হয়ে যায়। আমি যে একজনকে এখানে এসে থাকতে বলেছি। আমার সেই বন্ধুর কাছে এখন মুখ দেখাব কী করে?"

"কুণ্ডু আমাদের সকলের মুখে কালি মাখিয়ে দিয়ে গেছে। লজ্জার বাকী আছে কী?"

এ বাড়ির আরামের পর এমন আরাম আর জুটবে না। তা বাদল অন্তরে অন্তরে জানত। হাজার দোষ থাকুক, তারাপদ মানুষকে আরামে রাখত। এমন সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা বড় বড় হোটেলেও নেই। অথচ তারাপদর চার্জ মানুষের অসাধ্য নয়। আছে, তারাপদর পক্ষে বলবার আছে। লোকটা জাঁহাবাজ হলেও শক্তিমান। এই তো সাজানো বাড়ি পড়ে রয়েছে। চালাক দেখি কেউ? পালাতে সবাই ওস্তাদ। দায়িত্ব নেবার বেলায় একা তারাপদ। সর্দার বটে।

"আচ্ছা, বাওয়ার্স, আমরা কি একটা কমিটি করে এ বাসা চালাতে পারিনে?"

"না, সেন। দারুণ ঝঞ্ঝাট।"

"আচ্ছা, একটা সোভিয়েট করে?"

"না, সেন। সোভিয়েট করলেও এত ঝঞ্ঝাট পোষাবে না।"

বাদল উষ্ণ হয়ে বলল, "সোভিয়েট করে একটা বাসা চালাতে পারো না, স্বপ্ন দেখছ একটা রাষ্ট্র চালাবার! বাওয়ার্স, তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত।"

"আমি লজ্জিত নই। বাসার সঙ্গে রাষ্ট্রের তুলনা মন্দ উপমা।"

বাদল রাগান্বিত হয়ে বলল, "কোণঠাসা হলে তোমরা ওকথা বলবেই। কিন্তু তথ্য হচ্ছে এই যে একা কুণ্ডু যা পারত একটা সোভিয়েট তা পারে না। স্টালিন যে ডিক্‌টেটর হয়েছে তা শুধু এইজন্যে যে সোভিয়েট যারা করেছে তারা তোমার আমার মতো অকেজো, অপদার্থ, ভাবপ্রবণ, তার্কিক, কলহপ্রিয়, পলায়নতৎপর।"

বাওয়ার্স মৃদু হেসে বললেন, "হয়েছে না আরো আছে? শেষ কর তোমার ফর্দ।"

"দায়িত্বহীন, দলাদলির দালাল, স্বার্থপর, যে যার খুঁটি আগলাতে ব্যস্ত, কর্তার অভাবে দিশাহারা!"

"বলে যাও, বলে যাও।"

বাদল উত্তেজনার মুখে বলে বসল, "ট্রট্স্কির প্রতি অকৃতজ্ঞ!"

"এইবার ধরা পড়েছ, সেন।" বাওয়ার্স টেবল চাপড়ে হো হো করে হাসলেন। "ব্রনস্কির ওখানে শিক্ষা পাচ্ছ বেশ।"

বাদল ঘেমে উঠল। বাস্তবিক, ব্রনস্কির শিক্ষাই বটে। তবু গম্ভীর ভাবে বলল, "হয়তো আমার ভুল হয়েছে. কিন্তু এটা তো মানবে যে যারা একটা বাসা চালাতে পারে না তারা একটা রাষ্ট্রের ভার নিলে মহা ঝঞ্ঝাটে পড়বে। না ঝঞ্ঝাট কি কেবল বাসায়?"

"পয়েণ্ট তা নয়।" বাওয়ার্সকে তর্কে হারানো দুষ্কর। "পয়েণ্ট হচ্ছে এই যে এ বাসার দেনা দাঁড়িয়েছে অনেক। দেনা শোধ করবে কে? তোমার আমার দু'জনের একটা সোভিয়েট করা সহজ। কিন্তু তুমি আমি কি নিজের পকেট থেকে সমস্ত দেনাটা শোধ করতে পারি? তোমার বন্ধু যদি আসেন তিনিও দেনার জন্যে দায়ী হবেন, অথচ দেনা তো তাঁর জন্যে করা হয়নি। কেন তিনি আসতে চাইবেন, যখন শুনবেন দেনার দায়িত্ব তাঁর উপর বর্তাবে?"

বাদল চিন্তিত হলো। তাই তো। দেনাটিও সামান্য নয়।

"তা হলে বুঝতে পারছ, সেন, সোভিয়েট করলে সোভিয়েট এই দেনাটি বহন করে তোমাকে আমাকে ও আমাদের মতো দু'চারজনকে দোহন করতে বাধ্য হবে। দেনা শোধ করার অন্য উপায় নেই। যদি আমরা কলমের এক খোঁচায় সমস্ত দেনাটা ঘাড় থেকে ঝেড়ে

ফেলতে পারতুম, যদি পাওনাদারকে দরজা থেকে হাঁকিয়ে দিতে পারতুম তা হলে আমাদের সোভিয়েট গঠন করা সার্থক হতো, যেমন রাশিয়ায় হয়েছে। সেখানেও পূর্ববর্তী গভর্নমেণ্টের ঋণ অস্বীকার করা হয়েছে। নইলে সেই ঋণের দায়ে সোভিয়েট ব্যর্থ হতো।

বাদল বলল, "ঠিক। কিন্তু তোমার কি বিশ্বাস বর্তমান গভর্নমেণ্ট যে সব দেনা করেছে তোমার সোভিয়েট—যদি কোনো দিন এদেশে সোভিয়েট হয়—সে সব দেনা মুছে ফেলবে? সে কি সম্ভব?"

"যদি সম্ভব না হয় তবে সোভিয়েট ব্যর্থ হবে, এই পর্যন্ত লিখে দিতে পারি। যাতে সম্ভব হয় সেই চেষ্টা করতে হবে।"

"বৃথা চেষ্টা, বাওয়ার্স।" বাদল প্রত্যয়ের সহিত বলল। "পরিষ্কার শ্লেট কেউ কোনো দিন পায় নি। তোমাদেরও ঘাড়ে চাপবে পর্বতাকার ঋণ। সে ঋণ শোধ না করলে পাওনাদারের দল তোমাদের বিরুদ্ধে অভিযান পাঠাবে, পরাজিত হলে তোমাদের সঙ্গে অসহযোগ করবে। তোমরা অনশনে মরবে।"

বাওয়ার্স বাদলকে একটা সিগরেট বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "আশা করি আমরা অনশনে মরার আগে অপর পক্ষকে মরণের মুখে পৌঁছে দিয়ে যাব। আমরা আক্রমণ করব. সেন। আক্রমণও আমাদের শাস্ত্রে আছে।"

বাদল ঠিক এই জিনিসটিকে ভয় করত। শ্রেণী সংঘর্ষ! যুদ্ধ বিগ্রহ! এসব যদি অনিবার্য হয় তবে কি মানবজাতি নির্বংশ হবে না? মানবজাতির নির্বাণ ঘটলে কাকে নিয়ে জগতের বিবর্তন, কাকে নিয়ে প্রগতি, কার জন্যে সভ্যতা, কার জন্যে সংস্কৃতি? ক্যাপিটালিজম ও কমিউনিজম এদের বিরোধ যে মানবধ্বংসী!

৪

বাদলের উক্তি শুনে বাওয়ার্স বললেন, "এর উত্তরে লেনিন যা বলেছিলেন তাই শেষ কথা! সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্যে যদি পৃথিবীর বারো আনা মানুষকে মরতে ও মারতে হয় তা হলেও মাত্র চার আনা মানুষের জন্যে সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে।"

"যদি ষোল আনা মানুষই মরে—"

"তা হলেও জগতের শেষ দু'টি মানুষ সাম্য প্রতিষ্ঠার দ্বন্দ্বে পরস্পরকে হত্যা করবে, কিছুতেই বৈষম্যের সঙ্গে সন্ধি করবে না।"

বাদল এসব তত্ত্ব এই নতুন শুনল তা নয়। এ বাসায় এই হচ্ছে ডালভাত। তবে এর সঙ্গে সত্যিকার ডালভাত ছিল বলেই এ সব পেটে সইত।

"তুমি কি তবে বলতে চাও, বাওয়ার্স," বাদল করুণ স্বরে বলল, "বিরোধ অনিবার্য?"

"অনিবার্য।"

"কী করে এতোটা নিশ্চিন্ত হলে? যদি ক্যাপিটালিস্টরা স্বেচ্ছায় গদি ছেড়ে দেয়।"

"স্বেচ্ছায়?" বাওয়ার্স একটি চোখ বন্ধ করে অপর চোখে হাসলেন। "স্বেচ্ছায় যেমন রাশিয়ার জার সিংহাসন ছাড়লেন? অসম্ভব নয়। তবে তার আগে আমাদেরও ইচ্ছাপ্রয়োগ করতে হবে, নইলে ওদের ঐ স্বেচ্ছাটুকু অনিচ্ছায় পর্যবসিত হবে।"

"আমার মনে হয়," বাদল গবেষণা করল, "উভয় পক্ষে সম্মানজনক সন্ধি সম্ভব।"

"তুমি," বাওয়ার্স বললেন, "খ্রী উইলে আস্থাবান। আর আমি

বদ্ধ ডিটারমিনিস্ট। যা হবার তা হবেই, কেউ ঠেকাতেও পারবে না, কেউ এড়াতেও পারবে না। যাদের ঘরে টাকা আছে তারা তা স্থদে মুনাফায় খাটাবেই। যাদের মারফৎ খাটাবে তারা তা অন্যত্র খাটাবার পরিসর না পেলে যুদ্ধের সম্ভার নির্মাণে খাটাবে। যুদ্ধের সম্ভার জমতে জমতে যুদ্ধের হেতু জমবে। সহসা একদিন যুদ্ধ বেধে যাবে—শ্রেণীতে শ্রেণীতে নয়, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে। যুদ্ধে যে দেশ বিব্রত হবে সে দেশে শ্রেণী সংগ্রাম বাধবে, যেমন গত যুদ্ধের সময় রাশিয়ায়। এবার কেবল একটি দেশে নয়, সব দেশেই, কেননা বিব্রত হবে সব দেশ।"

বাদল বলল, "ওটা তোমার wishful thinking."

বাওয়ার্স বললেন, "এটা বিশুদ্ধ জ্যোতিষ। যেমন চন্দ্রগ্রহণ সূর্যগ্রহণ। প্রচলিত ব্যবস্থা জনসাধারণের অসহনীয় হয়ে উঠেছে। শুধু এক আধটি দেশে নয়, সব দেশে। তবু মাতব্বরদের ধারণা আমূল পরিবর্তন না করলেও চলে, জনসাধারণকে পরস্পরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে যুদ্ধে লিপ্ত করে স্থদ মুনাফা দুই হাতে লুট করলেও চলে, জনসাধারণকে পরস্পরের দ্বারা উজাড় করিয়ে বেকারসংখ্যা নির্মূল করলেও চলে! সেন, এ ধারণা ইতিহাসে অসিদ্ধ। এ বাসা ভাঙবেই। একে তুমি খাড়া করে রাখতে পারবে না। কমিটি দিয়েও না, সোভিয়েট দিয়েও না। আর একটি যুদ্ধ বাধলেই এর পতন অনিবার্য।"

"কিন্তু যুদ্ধ যে মানবধ্বংসী। তুমি নিজেই তো বললে যে জনসাধারণকে পরস্পরের বিরুদ্ধে লিপ্ত করে উজাড় করানো ভালো নয়।"

"ভালো নয়, কখন বললুম? ভালো মন্দের প্রশ্ন উঠছে না, সেন। যা ঘটবেই তা ভালো নয় বলে অঘটিত থাকবে না। তুমি কি মনে

করেছ ঘটনার স্রোত উল্টো দিকে বইবে, যদি শ্রমিকদের দু'চারটে খুচরো সুবিধা দেওয়া হয়? তাদের পারিশ্রমিক বাড়িয়ে দিতে পারো, তাদের জমানো টাকা কারবারে খাটিয়ে তাদের মুনাফা জোগাতে পারো, তাদের ছেলেদের বিনা বেতনে পড়াতে পারো, সব পারো, কিন্তু একটি জিনিস পারো না। পার না যুদ্ধ রোধ করতে। আর যুদ্ধ যদি একবার বাধে তবে সে শুধু আমাদেরই সুবিধা করে দিয়ে যাবে—কমিউনিস্টদেরই সুবিধা।"

বাদল অনেকক্ষণ চিন্তা করল। তারপর বলল, "তোমরা বোঝ কেবল একটি কথা। তোমাদের সুবিধা। কিসে মানবের দুঃখমোচন হয় সে ভাবনা তোমাদের নেই। হয়তো ছিল গোড়ার দিকে। ইতিমধ্যে নিবেছে। এখন তোমাদের একমাত্র স্বপ্ন কিসে তোমাদের সুবিধা হয়। তোমাদের ইতিহাসের, তোমাদের জ্যোতিষের। কিসে তোমাদের শ্রীহস্তে power আসে। কেমন?"

বাওয়ার্স আরক্ত হয়ে বললেন, "অমন ভাবে বললে কথাটা ভোঁতা শোনায়। কিন্তু আমি মানছি কথাটা সত্য। আমরা চাই power, কেননা আমরাই ওর সদ্‌ব্যবহার করতে পারি, অন্য কেউ পারে না।"

বাওয়ার্স ভাবাকুল স্বরে বললেন, "সেন, পৃথিবীতে স্তরে স্তরে তেল, লোহা, কয়লা, কাঠ, ধান, গম, কত রকম ভোগ্য। যে সম্পদ্ আছে ধরণীতে তার হিসাব নিয়ে তাকে ঠিকমতো ব্যবহার করতে জানলে তার দ্বারা সকলের সব দুঃখ যাবে। কেউ অভুক্ত থাকবে না, কেউ অপরিহিত থকেবে না। সকলের শিক্ষাদীক্ষা চিকিৎসা জুটবে। সকলে গাড়িঘোড়ায় চড়বে, ভালো বাড়িতে থাকবে। সর্ব ধনে ধনী যে ধরণী তার বক্ষে থেকে লক্ষ লক্ষ লোক কেন সর্বহারা? কারণ যে ব্যবস্থা এতোদিন চলে আসছে সে ব্যবস্থার কোথাও একটা মারাত্মক

ভুল আছে। সে ভুল যারা চোখে দেখতে পায় না তারা অন্ধ। সেই সব অন্ধের দ্বারা নীয়মান হয়ে পৃথিবীর আজ এই দশা। সেই সব অন্ধ একদিন মানবজাতির রথ পরিচালন করে এমন গর্তে পড়বে যে সেখান থেকে আর উদ্ধার নেই। তখন আমাদের যদি শক্তি থাকে আমরাই ঠেলে তুলব। যে ক'টি মানুষ বেঁচে থাকবে সেই ক'জনকে নিয়ে নবীন ব্যবস্থার পত্তন হবে। যদি কেউ আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করে তবে মানবসংখ্যা আরো কমবে বলে কাতর হব না, অকাতরে কমাব।"

বাদল স্তব্ধ হয়ে শুনছিল। স্নিগ্ধ স্বরে বলল, "তোমার মতো বাগ্‌বৈদগ্ধ্য আমার নেই। আমি যা বলি তা ভোঁতা।"

"কিন্তু আমি যা বললুম তা কি সত্য বলে মনে হয় না?"

"অর্ধ সত্য। কেননা মানবের প্রতি ওদের যেমন দরদ নেই তোমাদেরও নেই দরদ। ওরা যেমন ওদের ব্যবস্থাকে বজায় রাখার জন্যে মানুষকে পাঠাবে মরতে ও মারতে তোমরাও তেমনি তোমাদের ব্যবস্থাকে বাধাহীন করার জন্যে মানুষকে পাঠাবে মারতে ও মরতে। মানুষের জন্যে ব্যবস্থা না ব্যবস্থার জন্যে মানুষ?"

"মানুষের জন্যেই ব্যবস্থা, কিন্তু তেমন ব্যবস্থাকে বাধা মুক্ত করাও আবশ্যক।"

"বাধা," বাদল বলল, "বাধা কি একটি? পরিশেষে ট্রটস্কি।"

"হাঁ, প্রয়োজন হলে তাঁকেও সরাতে হয়।"

"ঐ করেই উৎসন্ন যাবে রাশিয়া। আর তোমাদের যদি মানুষের প্রতি দরদ না জন্মায় তবে তোমরাও।"

বাওয়ার্স উঠতে যাচ্ছিলেন, বাদল তাঁকে আরো খানিকক্ষণ বসাল। "এ বাসা যদি ছাড়তে হয় কোথায় যাব জানিনে। আবার কবে তোমার সঙ্গে দেখা হবে কে জানে!"

"আমারও সেই ভাবনা। কিন্তু দেখা হবে মাঝে মাঝে। যদিও আমাদের মিল ততো নয় অমিল যতো, তবু বাক্যালাপের দ্বারা মনটা পরিষ্কার হয়।" বাওয়ার্স বাদলকে আর একটা সিগরেট নিতে বললেন। সে নিল না।

বাদল দুই হাতে দুই গাল চেপে কী যেন ভাবছিল। বলল, "সোশ্যালিজম, কমিউনিজম, আধুনিক যুগের যাবতীয় ইজম, প্রত্যেকের যাচাই হবে একই নিকষে। সে নিকষের নাম দুঃখমোচন। তুমি ধরে নিয়েছ যে দুঃখ প্রধানতঃ অন্নবস্ত্রের দুঃখ। পৃথিবী যখন অন্নপূর্ণা তখন কেন অন্নাভাব? এই প্রশ্ন থেকে তোমার মতবাদ শুরু। আমার কিন্তু তা নয়। আমার কাছে দুঃখ প্রধানতঃ অপচয়ের দুঃখ। মানুষ যখন এতো বুদ্ধিমান, এতো হৃদয়বান তখন দিকে দিকে কেন এতো অপচয়? প্রাণের অপচয়, আয়ুর অপচয়, যৌবনের অপচয়? ধনের অপচয় তো বটেই, যারা নির্ধন তারাও অপচয় করছে তাদের সামর্থ্য ও সময়। কী করে বাঁচতে হয় তাই আমরা জানিনে, কী করে মরতে ও মারতে হয় তাই এতোকাল শিখেছি। তুমি ইতিহাসের দোহাই দিচ্ছ। ইতিহাস আমাদের কি এই শিক্ষা দেয় না যে মারামারি কাড়াকাড়ি করে কারো মঙ্গল হয়নি? ওটা অপচয়।"

"আমি তোমার সঙ্গে একমত।" বাদলকে স্তম্ভিত করে দিলেন বাওয়ার্স। "কিন্তু মাই ডিয়ার চ্যাপ, এই প্রচলিত ব্যবস্থা রসাতলে চলেছে। একে তলিয়ে যেতে দাও, বুদ্ধিমান। এর স্থলে অভিষিক্ত হবে নবীন ব্যবস্থা, নূতন শৃঙ্খলা। তাকে রক্ষা কর, হৃদয়বান।"

বাদল দুই হাতে দুই বাহু পিষতে পিষতে বলল, "ভগবান আছেন কি না জানিনে। কিন্তু আমি তো আছি। এই তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করছি, বাওয়ার্স, দুঃখমোচনের কষ্টিপাথরে যা সোনার দাগ রেখে

যাবে না তাকে আমি কোনোমতেই স্বীকার করব না, সর্বতোভাবে বাধা দেব। না ক্যাপিটালিজম, না কমিউনিজম, কোনোটাই ইতিহাসের লিখন নয়। যুদ্ধ যাতে না বাধে সেই হবে আমার একান্ত প্রয়াস, কিন্তু যুদ্ধের পরিবর্তে এমন কিছু আমি উদ্‌ভাবন করব যার দ্বারা যুদ্ধের উদ্দেশ্য সাধিত হবে, সমাজের হবে আমূল পরিবর্তন। কী করে তা সম্ভব, তা আমি জানিনে। কিন্তু বিনা যুদ্ধে আমি যুদ্ধেরই ফল চাই আর বিনা বিপ্লবে কমিউনিজমের।"

"প্রলাপ।" বলে বাওয়ার্স গা তুললেন।

৫

যুদ্ধের নাম শুনলে বাদল ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। মানব সে, মানবের প্রতি তার দায়িত্ব আছে, সে তো দায়িত্বহীন হতে পারে না। যে আগুনে পাড়াপড়শী সকলেরই ঘর পুড়বে, পুড়ে মরবে শিশু ও নারী, সে আগুন যারা লাগাবে তারা যদি হয় নরপিশাচ তবে সে আগুন লাগলে যাদের সুবিধা তারাও নরাধম। যার অন্তরে লেশমাত্র মানবতা আছে সে বলবে, চাইনে সুবিধা। চাই শান্তি।

অথচ শান্তি বলতে পচা পুকুরের বদ্ধ জল ও পুঞ্জীভূত পাঁক নয়। শান্তি হবে বেগবান স্রোত, মুক্ত ধারা। শান্তির মধ্যে যুদ্ধের ভাব থাকবে, থাকবে শৌর্য, থাকবে সাহস, থাকবে প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা। বাদল অহিংসাবাদী নয়, প্রয়োজন হলে হত্যা করতেও সে পরাঙ্মুখ হবে না। কিন্তু আধুনিক যুগের মারণাস্ত্রগুলি দিন দিন যেমন উন্নত হচ্ছে সে উন্নতি যুদ্ধকে দিন দিন এগিয়ে আনছে, কেননা অস্ত্রপরীক্ষার অন্য কোনো পন্থা নেই। বাদলের বন্ধু কলিন্স এরোপ্লেনের

পাইলট হতে চায়, কারণ সে পরীক্ষা করতে চায় এরোপ্লেনগুলো যুদ্ধকালে কার্যকর হবে কি না। ক্রমে একদিন সেই কলিন্স কেবলমাত্র পাইলট হয়ে তুষ্ট থাকবে না, বোমারু হতে চাইবে। পরীক্ষা করতে চাইবে বোমাগুলো যুদ্ধকালে কার্যকর হবে কি না। এইভাবে পরীক্ষা করতে করতে পরম পরীক্ষার পিপাসা জাগবে। রক্তপাতের পিপাসা। তখন "প্রয়োজন হলে হত্যা করব" এ নীতি কোথায় উবে যাবে। এর বদলে উদয় হবে "জয়ের জন্যে হত্যা করব" এই নীতি। এমনি করে মানুষ মানুষকে উজাড় করবে। মুখে আওড়াবে, "জয়ের জন্যে।" যেই জিতুক না কেন, কোটি কোটি মানুষ মরবে, মরণের মাত্রা ছাড়িয়ে যাবে। জয়ের নেশা যেমন দুটো ষাঁড়কে পেয়ে বসলে দুটোকেই সাবাড় করে তেমনি দুটো দেশকেও, দু'দল দেশকেও। মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে সমগ্র পৃথিবীকেও। না, বাদল অহিংসাবাদী নয়, কিন্তু মাত্রাবাদী। হিংসা যদি মাত্রা না মানে, প্রয়োজনের সীমানা না মানে, তবে যে ভীষণ অপচয় হয় তা মানবদেহের রক্তাপচয়ের মতো প্রাণঘাতী। শরীরের নখ কাটা, চুল ছাঁটা মাঝে মাঝে প্রয়োজন। চিকিৎসকের নির্দেশে অস্ত্রোপচারও কদাচ কখনো প্রয়োজন। কিন্তু নেশার ঘোরে নিজের কণ্ঠচ্ছেদ বা বক্ষভেদ যে আত্মহত্যা।

আপাতত যুদ্ধের উপর রাগ করে বাদল বই খাতা চিঠির শোক ভুলল। চলল ব্রনস্কির ওখানে। ব্রনস্কি ছিলেন না। ছিলেন তাঁর তরুণী ভার্যা। তিনিই প্রথম বাদলকে নাম ধরে ডাকতে শুরু করেন।

"অল্‌গা," বাদল বলল ক্লান্ত স্বরে, "আমি যে প্রায় গৃহহারা।"

বাদলের মুখে বিবরণ শুনে আল্‌গা বললেন, "বাদল, তুমি তো জানো, একটি জায়গা আছে যেখানে তুমি সব সময় স্বাগত।"

বাদল বলল, "জানি। রাশি রাশি ধন্যবাদ। কিন্তু আমার যে কী গভীর তৃষা।"

তৃষার কথায় মাদাম ঠাওরালেন বাদলের তেষ্টা পাচ্ছে। তিনি বললেন, "চা, না শীতল পানীয় ?"

বাদল তাঁর দিকে চেয়ে বলল, "দিতে মর্জি হয় তো দিতে পারো শীতল চা। কিন্তু তাতে আমার তৃষা যাবে না। এ আমার কিসের তৃষা বলব ? জনতার সঙ্গে এক হয়ে যাবার তৃষা। আমার স্বাক্ষর গেছে, গৃহ নেই। এখন আমি চাই নামহীন গৃহহীন অচিহ্নিত জীবন, জনপ্রবাহের সঙ্গে ওতপ্রোত। বোঝাতে পারছিনে, অল্‌গা। বোঝার মতো চেপে রয়েছে বুকে নতুন একটা ভাব, নিঃশ্বাস ফেলছে বুকে নতুন একটা অভাব।"

এই বলে বাদল অন্যমনস্ক হল। অল্‌গাও উঠে গেলেন।

বাদল ভাবতে থাকল, ও বাসা থেকে যেখানেই যাক টাকা লাগবে। টাকার জন্যে বাবাকে লিখতে রুচি হয় না, কোন অধিকারে নেবে ওঁর টাকা। যদি উনি শুনতে পান বাদল কোথায় ঘুরছে, কী করছে, তা হলে আপনাআপনি টাকা বন্ধ করবেন। অথচ বাদলের উপার্জন এক কপর্দক নয়। লিখে যদি বা কিছু পেত, খাতা চুরি যাবার পর সে আশাও নেই। বাদল তা হলে করবে কী ? কার কাছে হাত পাতবে ? কোন অধিকারে ? একটা চাকরি—না, চাকরি করতে আগ্রহ নেই, যদি না সে চাকরি হয় স্বাধীনতার নামান্তর। চিন্তার স্বাধীনতাকে, বাক্যের স্বাধীনতাকে বাদল স্বাধীনতা বলে।

"ধন্যবাদ, অল্‌গা। তোমার সঙ্গে আর কবে দেখা হবে, জানিনে। তোমার সেই মূর্তি নিয়ে যে কী করব, কোথায় রাখব, সেও এক সমস্যা। কেননা," বাদল তার নিজের মনে যা অস্পষ্ট ছিল তাকে যুগপৎ

স্পষ্ট করল ও ব্যক্ত করল, "আমি হয়তো জিপসীর মতো পথে পথে বেড়াব।"

অল্‌গা বিশ্বাস করলেন না, মিষ্টি হাসলেন। বাদলকে এতদিন সামনে বসিয়ে অধ্যয়ন করছেন, তার মধ্যে যে একজন জিপসী আছে তা কী করে বিশ্বাস করবেন? বাদল চা চেয়েছিল, কিন্তু একবার মুখে ছুঁইয়ে আর মুখে দিল না।

"তুমি যদি অন্য কোথাও স্থান না পাও," তিনি পুনরুক্তি করলেন, "তবে একটি জায়গা আছে সেখানে তুমি সব সময় স্বাগত।"

"কিন্তু আমি যে রিক্ত, আমি যে কপর্দকহীন।"

এ কথাও তিনি বিশ্বাস করলেন না। বললেন, "সত্যি?" তাঁর ভ্রূভঙ্গিটি বাদলের ভালো লাগল।

"সত্যি।" বাদলও তাঁর অনুকরণ করল।

"তা হলেও আমার নিমন্ত্রণ রইল।" তার পর হেসে বললেন, "তুমি কি জানো না যে আমরাও নিঃস্ব?"

বাদল জানত। সেইজন্যেই তো মূর্তির অর্ডার দিয়েছিল।

ব্রনস্কি এসে পড়লেন। এই গ্রীষ্মকালেও তাঁর পায়ে জুতোর উপর স্প্যাট্‌স্‌। দস্তানা একটি পকেটে, একটি হাতে। পরিপাটী সম্ভ্রান্ত পোশাক, চোখে সোনার চশমা। চুলগুলি কাঁচাপাকা, কিন্তু যত্ন করে কাটা।

"আহ্‌!" হাত বাড়িয়ে দিলেন বাদলের দিকে, "সুখী হলুম তোমাকে দেখে। কতক্ষণ এসেছ?"

"কী জানি!" বাদলের খেয়াল ছিল না, সে যেমন অন্যমনস্ক।

"বেশিক্ষণ না।" মাদাম উত্তর দিলেন।

"কমরেড ব্রনস্কি", বাদল যেন এতক্ষণ তর্কের সুযোগ অন্বেষণ

করছিল, "আপনি যে ডিটারমিনিস্ট তা অবশ্য জানা আছে আমার। তবু জিজ্ঞাসা করি, আপনি কি মনে করেন যুদ্ধ অনিবার্য ?"

"অন্য রূপ মনে করে এমন কি কেউ আছে ?"

"কেন, আমি। আমি তো মনে করি অনিবার্য যারা বলে তাদের কিছু না কিছু স্বার্থ বা সুবিধা আছে।"

"অন্যের উপর দোষারোপ করে কী হবে? যা অনিবার্য তা অবশ্যম্ভাবী। কবে হবে সেই একমাত্র জিজ্ঞাস্য।"

বাদল গরম হয়ে বলল, "জ্যোতিষে লেখা নেই ?"

ব্রনস্কি স্ত্রীকে পানীয় আনতে বলে বাদলের দিকে ফিরে বললেন, "তুমি আমার কথা শুনতে চাও না তোমার কথা শোনাতে চাও? আমি বলছি, শোন। যুদ্ধ বাধবেই, তবে কার সঙ্গে কার তা আমি আন্দাজে বলতে পারব না।"

"আর বিপ্লব ?"

"বিপ্লবও বাধবে। কিন্তু ওর পরিণাম সম্বন্ধে আমি সংশয়ী। তুমি তো জানো, আমার মতে জনগণ যতোদিন না দৃঢ়সংকল্প হয় ততোদিন বিপ্লব একটা চোরাবালি। ওতে কমিউনিজম ভিত্তিভূমি পায় না, পায় তার কবর। রাশিয়ায় যা ঘটছে তা কমিউনিজমের অন্ত্যেষ্টি। জনগণ দৃঢ়চেতা নয়, বোঝে না যেই রক্ষক সেই ভক্ষক। বিপ্লব বাধলে অন্যান্য দেশেও স্টালিনের মতো কুচক্রীর খপ্পরে ক্ষমতা যাবে, জনগণ যে অক্ষম সেই অক্ষম।"

রাজা চর্লসের মুণ্ডুর মতো স্টালিনের নাম যেমন করে হোক উঠবেই। বাদল বলল, 'তা হলে আপনার মতে বিপ্লবও অনিবার্য, কিন্তু কমিউনিজম অবশ্যম্ভাবী নয়।"

ব্রনস্কি তাড়াতাড়ি সংশোধন করলেন, "কমিউনিজমও অবশ্যম্ভাবী,

কিন্তু আগে যেমন আমার ধারণা ছিল বিপ্লব হলেই কমিউনিজম হবে এখন আমার সে ধারণা নেই। কমিউনিজম হবে, যেদিন জনগণ দৃঢ়পণ হবে। সেদিন যে কতো দিন পরে তা আমি বলতে পারব না। শুধু বলতে পারি যে, আসবে, সেদিন আসবে।"

"কিন্তু," বাদল বলল, "কমিউনিজমের সঙ্গে আমার বিবাদ নেই, আমার বিবাদ শ্রেণীসংঘর্ষের সঙ্গে। পার্লামেন্টে সংখ্যাভূয়িষ্ঠ হয়ে যদি কোনো দল কমিউনিজম প্রবর্তন করে তবে আমি আদৌ দুঃখিত হব না। কেননা পরবর্তী নির্বাচনে ও দলটিকে হারিয়ে দেওয়ার সম্ভাবনা থাকবে।"

ত্রনস্কি বললেন, "হায়, বাদল, সেইখানেই তো ফ্যাসাদ। আমি স্টালিনকে বললুম, আমাকে যদি গুলি করতে চাও, কর। এই আমি খুলে দিচ্ছি বুক।" এই বলে তিনি সত্যি সত্যি কোট খুললেন। বাদল ত্রস্ত হয়ে ভাবল, তাই তো। গুলি করবেন নাকি নিজেকে? তা নয়। ত্রনস্কি বললেন, "অসহ গরম। আমি যদি কোট খুলি তোমার আপত্তি আছে, বাদল? তোমার, অল্‌গা?"

"এই আমি খুলে দিচ্ছি বুক। কিন্তু স্বীকার কর যে আমি জনগণের শত্রু নই। মিথ্যা অপবাদ রটিয়ে আমার মরণ ব্যর্থ কোরো না। আমি তোমার প্রতিপক্ষ, যেমন সব দেশেই থাকে অপোজিশন। শুনল স্টালিন ও কথা?"

৬

বাদল স্থির হয়ে বসে থাকতে পারছিল না। তার ইচ্ছা করছিল জিপ্‌সীর মতো টো টো করে বেড়াতে। জিপ্‌সীর মতো বেপরোয়া,

জিপ্সীর মতো চালচুলোহীন। কোথায় খাবে, কোথায় শোবে সে ভাবনা বাদলের নয়, বাদলের চিন্তা মানবনিয়তি।

"চললুম, কমরেড ব্রনস্কি। চললুম, অল্গা!"

"সে কী, এর মধ্যে? ব্রনস্কি তখনো তাঁর আখ্যায়িকা জমিয়ে তোলেননি। তারপরে কী হলো তাই বলতে যাচ্ছেন। বাদলকে উঠতে দেখে সচকিত হলেন।

"আমাকে ঝাঁপ দিতে হবে।" বাদল তার সংকল্প ব্যক্ত করল। "যাই, তার উদ্‌যোগ করিগে।"

"ঝাঁপ!" ব্রনস্কি বিস্মিত হলেন।

"হাঁ, কমরেড। আমাকে তলিয়ে যেতে হবে। তবে যদি এ সমস্যার তল পাই।"

"ঝাঁপ! সমস্যা!" ব্রনস্কি আরো বিস্মিত হলেন। "এসব কী, বন্ধু সেন!" ভাবলেন ছোকরা হয়তো কারো সঙ্গে প্রেমে পড়েছে। তাঁর ঘরণীর সঙ্গে নয় তো?

"যুদ্ধ না করে যুদ্ধের ফল, বিপ্লব না করে বিপ্লবের ফল, কী করে লাভ করা যায় এই আমার সমস্যা।" বাদল তাঁকে আশ্বস্ত করল। "যদি সমাধান পাই তবে দুঃখ না দিয়ে দুঃখমোচন করা চলবে। নতুবা দুঃখমোচন করতে গিয়ে দুঃখবর্ধন করা হবে, যেমন রাশিয়ায়।"

রাশিয়ার উল্লেখে ব্রনস্কি উল্লসিত হয়ে বলতে যাচ্ছিলেন যে স্টালিন বিদ্যমান থাকতে রাশিয়ার দুঃখের পরিসীমা থাকবে না, কিন্তু বাদল তাঁকে বলবার সুযোগ দিল না।

"চললুম, অল্গা। তোমার নিমন্ত্রণ মনে থাকবে।" এই বলে বাদল দু'জনকে গুডবাই জানিয়ে পথে বেরিয়ে পড়ল।

এখন মার্গারেটকে খুঁজে পায় কোথায়? মার্গারেট আগেই ঝাঁপ

দিয়েছে। "ঝাঁপ" শব্দটি তাঁরই। বাদলের কাছে তার একখানা পুরাতন চিঠি ছিল, চুরি যাবার মতো চিঠি নয়, বাদল তা থেকে একটা ঠিকানা উদ্ধার করে সেখানে ও সেখান থেকে অন্য কয়েক জায়গায় ঘোরাঘুরি করে শেষকালে নাগাল পেল মেয়ের। সেটা একটা রুটির দোকান, মার্গারেট সেখানে রুটি বেক করছিল।

"ও কে, বাদল নাকি? সুখী হলুম দেখে।" এই বলে মার্গারেট তাকে দোকানের সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল।

"মার্গারেট, তোমার কি আজ সময় হবে?" বাদল বলল কানে কানে। "কথা ছিল।"

বাদল 'বান' খেতে ভালোবাসে। অনুরোধ অগ্রাহ্য করলো না। এত ঘুরে তার ক্ষিদেও পেয়েছিল।

বাদলের সমস্যা শুনে মার্গারেট বলল, "কিন্তু জিপ্‌সী কেন? ইচ্ছা করলে শ্রমিক হতে পারো।"

"শ্রমিক! উহুঁ।" বাদল মাথা নাড়ল। "শ্রমিকেরা ঠাওরাবে তাদের রুটি কেড়ে নিচ্ছি।"

"জিপ্‌সীরাও তা ঠাওরাবে। যার রুটির দরকার সে যদি খেটে খায় তবে তো সে সত্যি কেড়ে নিচ্ছে না।"

"জিপ্‌সী হলে," বাদল পাশ কাটিয়ে বলল, "আহারনিদ্রার জন্যে ভাবতে হয় না। শ্রমিকের সে ভাবনা আছে।"

"জিপ্‌সীদের সম্বন্ধে তোমার ও ধারণা রোমান্টিক।" মার্গারেট হাসল। "ভাবনা যেমন শ্রমিকের তেমনি জিপ্‌সীর।"

"কিন্তু আহারনিদ্রার জন্যেই যদি ভাবতে হলো তবে অন্য ভাবনা ভাবব কখন? আমার যে একেবারেই সময় নেই বাজে ভাবনা ভাবতে। অথচ ওদিকে টাকার ঘরে শূন্য।" বাদল সব খুলে বলল।

মার্গারেট নিজের উদাহরণ দিয়ে বলল, "আমার আহারনিদ্রার দায় তাদের উপরে যাদের জন্যে আমি খাটি। তুমি যদি আত্মকেন্দ্রিক না হও তোমার আহারনিদ্রার ভার অন্য অনেকে নেবে। তারা হয়তো সম্পূর্ণ অচেনা লোক, প্রতিদিন নতুন।"

"তোমার কি তাই অভিজ্ঞতা?"

"হাঁ, বাদল। আমি নিজের জন্যে এক মিনিটও ভাবতে রাজি নই। আমার সমস্ত সময় যায় পরের জন্যে খাটতে। কেউ না কেউ খেতে বলে, খাই। শুতে দেয়, শুই। দেখলে তো আজ রুটি বেক করছিলুম, কাল কয়লা বয়ে বেড়াব। যেদিন যেখানে ডাক পড়ে সেদিন সেখানে গিয়ে জুটি।"

"পরকেন্দ্রিক হতে আমার স্বভাবের বাধা।" বাদল বলল। "নইলে পরের জন্যে খাটতে কি আমার অনিচ্ছা?"

ওরা চলতে চলতে টেমস নদীর ধারে এসে পড়ল।

বাদল সহর্ষে বলে উঠল, "পেয়েছি। পেয়েছি।"

"পেয়েছ? কী পেয়েছ, শুনি!"

"রাত্রে নদীর বাঁধে শোব। একটা ভাবনা তো মিটল। বাকি থাকল আর একটা।"

মার্গারেট উৎসাহ দিল না। "ওটা একটা য়্যাডভেঞ্চার, বাদল। ওতে তোমার সমস্যার সমাধান হবে না।"

বাদল তর্ক করল। কত লোক নদীর ধারে শোয়। সে কি তাদের তুলনায় ভীতু? না তার শরীর অপটু?

"তা নয়। তোমার সমস্যা তো গোড়ায় এই যে তুমি জনগণের সঙ্গে এক হয়ে যেতে চাও?"

"আমার সমস্যার সমাধানের জন্যে জনগণের সঙ্গে যেটুকু এক হওয়া

একান্ত আবশ্যক সেটুকু এক হতে আমি উৎসুক ও ইচ্ছুক, তার অধিক নয়।”

“আমি ভুল বুঝেছিলুম, বাদল।” মার্গারেট ব্যথিত হলো। “অমন করে তুমি যুদ্ধের ফল পাবে না, বিপ্লবের তো নয়ই। মাঝখান থেকে জনগণের সঙ্গে এক হওয়ার যে বিশুদ্ধ আনন্দ তাও মিলবে না।”

বাদল স্বীকার করল না, তর্ক শুরু করল। মার্গারেট তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, “তুমি যদি একটা য়্যাডভেঞ্চার চাও তো নিরাশ হবে না। নদীর বাঁধে রাত কাটানো তোমার জীবনে এই প্রথম হলেও অপরের জীবনে তা নয়। কিন্তু তার সঙ্গে জনগণের সম্পর্ক কোথায়? আর তোমার মনেও তো জনগণের প্রতি অহেতুক প্রীতি নেই, তাদের সঙ্গে এক হয়ে যেতে তোমার স্বভাবে বাধে।”

বাদল তার সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে কত রকম যুক্তি আবিষ্কার করেছিল এই কয়েক মিনিটে। কিন্তু মার্গারেটের মুখ দেখে মনে হলো সে কোনো যুক্তি শুনবে না। আসলে বাদল পরের বাড়ি শুতে প্রস্তুত নয়, কেউ শুতে ডাকলে সে শোবে না, তার লজ্জা করবে। তাই নদীর বাঁধ ছাড়া তার গতি নেই।

“য়্যাডভেঞ্চার বলে সব জিনিস যদি উড়িয়ে দেওয়া হয় তবে করবার কিছু থাকে না।” বাদল অনুযোগ করল।

“সব জিনিস নয়। যাতে পরের পরিতৃপ্তি তাতে নিজেকে নিয়োগ করলে দেখবে নিজেরও তৃপ্তি আছে। য়্যাডভেঞ্চারের তৃপ্তি কেবল নিজের।”

“মার্গারেট,” বাদল প্রশ্ন করলো, “তুমি কি কমিউনিজম ছেড়ে দিলে?”

“কে বলল? না,” মার্গারেট প্রতিবাদ করল, “আমি আমার

মতবাদে অটল আছি। জগতে যতকাল শোষণ থাকবে ততকাল কমিউনিজমের প্রয়োজন থাকবে, শোষণ নিবারণের অন্য কোনো পন্থা নেই। কিন্তু দিনরাত লোকদের উসকানি দিয়ে বেড়ালে ফল হয় উল্টো, লোকের মন ক্রমে বিমুখ হয়, লোকে ভাবে এরা শুধু ঐ একটি বিদ্যা জানে।"

"এবার নির্বাচনে কমিউনিস্টদের একজনও জিতল না তার কারণ বোধহয়," বাদল কী বলতে যাচ্ছিল, মার্গারেট কেড়ে নিয়ে বলল, "এই যে আমাদের উপর লোকের আস্থা জন্মায়নি। লেবার পার্টির কর্মীরা অনেকদিন ধরে অনেক কষ্ট সয়েছে, ত্যাগ করেছে, সাধারণের সঙ্গে একাত্ম হয়েছে, সাধারণ তাদের চেনে ও বিশ্বাস করে। আমরাও যদি চরিত্রের দ্বারা হৃদয় জয় করি তবে মতবাদের দ্বারা রাজ্য জয় করব। চরিত্রকে উপহাস করে আমরা ভুল করেছি। আমরা ভুল ভেবেছি যে শক্তি আসে কেবলমাত্র সংঘবদ্ধ সংগ্রাম থেকে।"

এসব শুনে বাদল বলল, "তোমার পার্টি কি তোমার সঙ্গে একমত?"

মার্গারেট সখেদে বলল, "না। বিশুদ্ধ রাজনীতি ওদের মাথা খেয়েছে। ওরা বোঝে না যে লেবার পার্টির জয়ের পিছনে বিশুদ্ধ রাজনীতি নয়, খানিকটে ধর্মনীতি রয়েছে। রাশিয়াতেও যারা কমিউনিজম পত্তন করেছিল তারা ধর্ম না মানলেও যা মানত তার জন্যে প্রাণ দিয়েছিল, দিতে উদ্যত ছিল, ত্যাগে অভ্যস্ত ছিল, ভোগে বিতৃষ্ণ ছিল।"

বাদল ইতিমধ্যে অন্যমনস্ক হয়েছিল। মার্গারেটকে নাড়া দিয়ে বলল, "দেখছ ও কে? ওই তোমাদের কালকের বাদল। আমি দেশলাই ফেরি করব।"

"আর একটা য়্যাডভেঞ্চার!" মার্গারেট যেন ঠাণ্ডা জল ঢালল।

"নদীর বাঁধে শোওয়া, দেশলাই বেচে খাওয়া, এই করলেই আমি শ্রেণীচ্যুত হব। তা হলে আমি টের পাব কোথায় জুতো চিমটি কাটছে। তারপরে আমি আবিষ্কার করব আমার কলকাটি, যা দিয়ে ঘটাব রুধিরহীন বিপ্লব।"

৭

যাবার সময় মার্গারেট বলল, "কাল এসো, তোমাকে দেশলাই-ওয়ালার বেশে সাজাব। এই পোশাক পরে তো কেউ দেশলাই বেচে না।"

তা শুনে বাদলের চেতনা হলো। তাই তো। মোটা কাপড়ের পচা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড কোট প্যান্টলুন, টাই কলারহীন গেরো দেওয়া গলাবন্ধ, তালি পড়া জুতো। ইশ! গা ঘিন ঘিন করে।

কিন্তু উপায় নেই। সেই যে বলে, উট গিলতে আগুয়ান, মশা গিলতে পেছপাও। তেমনি দেশলাই বেচতে উদ্যত, দেশলাইওয়ালার বেশ পরতে বিমুখ। অমন করলে চলবে কেন?

"আচ্ছা, কাল আসব, মার্গারেট।" বাদল নিরুপায়ভাবে বলল।

তারপরে সুধীদা।

সুধীদার ওখানে গিয়ে দেখল সুধীদা নেই, শুনল কোথায় বেরিয়েছে, ফিরতে রাত হবে না। তখন বসল সুধীদার ঘরে, স্বভাবের দোষে বই ঘাঁটল, কিন্তু মন লাগছিল না কিছুতেই।

জুন মাস। রাত আটটা বাজলেও দিনের আলো ঝকমক করছে, কে বলবে যে এটা দিন নয়, রাত। কিন্তু সে তো বাইরে। বাদলের অন্তরে কিন্তু অন্ধকার, ঘোর অন্ধকার।

কী দরকার, বাপু! তুমি এসেছিলে বিলেতে পড়াশুনা করতে, পাশ করে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যেতে। তা না করে তুমি রইলে মানবনিয়তির বোঝা বইতে, দুঃখমোচনের দুঃখ সইতে। এবার তুমি তলিয়ে যেতে চাও জনসাগরে, সেখান থেকে উঠে আসবে কোন মুক্তা নিয়ে কে জানে! তোমার চারদিকে সাগরজল—নিচে উপরে, এ পাশে ও পাশে। হে ডুবুরি, তোমার সাহস আছে তো?

বাদল একটু পায়চারি করল। তারপর সুধীর বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম করল। তারপর আবার পায়চারি। তারপর চেয়ারে বসে গম্ভীরভাবে ভবিষ্যতের ধ্যান করতে লাগল।

"কে? বাদল? তোর খাওয়া হয়েছে?"

বাদল চমকে উঠে চেয়ে দেখল সুধীদা। বলল, "তোমার এখানে টেলিফোন নেই, অগত্যা সশরীরে আসতে হলো। শুনবে? তারাপদ ফেরার।"

সুধীও শুনেছিল অশোকার বাগ্‌দানের বৈঠকে। বাদল বিবরণ দিল।

তার নিজের কিছু নিয়েছে কি না বলতে গিয়ে বাদল ভেঙে পড়ল। ছোট ছেলের মতো আকুল হলো কেঁদে।

"ভাবী কাল আমার জীবনের চিহ্ন পাবে না। আমার সাধনার নিদর্শন পাবে না। Posterity আমার নাম পর্যন্ত জানবে না। আমার স্বাক্ষর চিনবে না। Oh, my signature! My signature!" বাদল লুটিয়ে পড়ল।

তার পরে সুধী তাকে অনুরোধ করল সঙ্গে থাকতে, সুধীর ওখানে। বাদল খুলে বলল। পথে পথে দেশলাই বেচবে, কাগজ ফেরি করবে। শোবে টেমস নদীর বাঁধে।

"তুই কি উন্মাদ হলি?" সুধী বলল। "চোরের উপর অভিমান করে—"

"না, না, আমাকে ভুল বুঝো না, ভাই।" বাদল বুঝিয়ে বলল যে তারাপদ তার কীই বা চুরি করেছে, কেন অভিমান করবে!

বলল, "আমার আশা চুরি গেছে, আমি যে এক রশ্মি আলো দেখতে পাচ্ছিনে। অন্ধকার! চারিদিকে অন্ধকার!"

সুধী বাদলের দু'টি হাত ধরল। দুই বন্ধু বসে রইল নীরবে।

বাদলের মনে পড়ল, "সুধীদা, তোমার সঙ্গে আমার হিসাবনিকাশের কথা ছিল। কত যে কথা ছিল তোমার সঙ্গে আমার। কবে সে সব হবে?"

সুধী বলল, "সেইজন্যেই তো বলছিলুম আমার সঙ্গে থাকতে।"

বাদল বলল সে নিজেই আসবে দেশলাই বেচতে, সুধীদাকে।

তার পরে তাদের দু'জনের কথাবার্তা হলো সমাজব্যবস্থাকে ঘিরে। বাদল বলল, সে একটা শ্রেণীসংগ্রাম বাধাতে চায় না, তার জন্যে অন্যান্য শক্তি কাজ করছে। সে এমন একটা টেকনিক উদ্‌ভাবন করবে যা কেউ এত দিন পারেনি, যা মৌলিক। কিন্তু তা করতে হলে তাকে সকলের চেয়ে নিচু হতে হবে, অধমেরও অধম।

সুধী বাদলের হাতে চাপ দিল সস্নেহে।

"সবাই ভুলে যাবে যে বাদল বলে কেউ ছিল।" বাদল আরো কত কী বলল। "তার পরে—ধর, বিশ বছর পরে—আমি কথা কইব। কথা কইব দু'চার জনের কাছে। আর আমার সেই কথা হবে এমন কথা যার জন্যে সমস্ত জগৎ, সমস্ত যুগ, চেয়ে রয়েছে কান পেতে। এক দিনেই আমার কথা আকাশে আকাশে চারিয়ে যাবে, বাতাসে বাতাসে

ছড়িয়ে যাবে। আমি বিশেষ কিছু করব না। একটি বোতাম টিপব, আর অমনি তোমার সমাজব্যবস্থা সমভূম হয়ে যাবে।”

“কিন্তু এখন,” বাদল বলে চলল, “এখন আমার চোখে আলোর রেখাটিও নেই। আঁধারের পর আঁধার, তারপরে আঁধার, তার পরে আরো আঁধার। এই আঁধার পারাবার পার হব কী করে? বিশ বছর এর গর্ভে গর্ভবাস করব কী করে?” বাদল চোখে দেখতে পাচ্ছিল না দিনের আলো আছে কি গেছে। আকাশে তখনো আলোর আভাস ছিল।

কথা রইল বাদলের সম্বল যা কিছু আছে তা সে সুধীকে পাঠাবে, সুধী বিলিয়ে দেবে, ব্যবহার করবে, যেমন খুশি।

সুধীদার ওখান থেকে বাসায় ফিরে বাদল দেখল পীচ তার জন্যে খাবার নিয়ে অপেক্ষা করছে। সকলে শুতে গেছে, তারও ঘুম পাচ্ছে, কিন্তু বাদলকে না খাইয়ে সে নড়বে না।

“আমার খাবার টেবলে ঢাকা দিয়ে রেখে গেলে পারতে, কমরেড জেসী। মিথ্যে কেন রাত জাগলে?”

“আপনার যেমন ভোলা মন। খেতে ভুলে যেতেন।” পীচ হাসল। “হয়তো দেখতেই পেতেন না যে খাবার ঢাকা রয়েছে।”

আর একবার অমন ঘটেছিল বটে। বাদল সেবার অপ্রস্তুত হয়েছিল জেসীর কাছে। তাই এবার জেসী রাত জাগছে।

“তোমার ঋণ জন্মে ভুলব না।” বাদল আবেগের সঙ্গে বলল। শুধু এই নয়, জেসী তার কত সেবা করেছে ছোট বোনের মতো।

“ও কী বলছেন? আপনি তো কোথাও চলে যাচ্ছেন না।

“চলে যাচ্ছিনে কী রকম? কালকেই তো যাবার কথা।”

“কালকেই!” পীচ বিশ্বাস করল না। কিন্তু কাঁদতে বসল। তার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। বাদল তা প্রথমটা লক্ষ করল

না। তার এমন ক্ষিদে পেয়েছিল যে এক গ্রাসে একটি কোর্স নিঃশেষ করল।

"ও কী! তুমি কাঁদছ যে!" বাদল সহসা লক্ষ করল। "তোমার চাকরি থাকবে না বলে মনে খুব কষ্ট হচ্ছে বুঝি? বাস্তবিক, এ বাসা উঠে যাবার দাখিল। তোমাকে অন্য কোথাও কাজ খুঁজে নিতে হবে, জেসী। তা তুমি পাবেও।" বাদল তাকে অভয় দিল।

তা সত্ত্বেও তার অশ্রু থামল না, বরং আরো অঝোর ঝরল।

মেয়েদের রীতিনীতি বাদলের অবোধ্য। সে আশ্বাস না দিয়ে বলল, "কাজ খুঁজে নিতে একটু অসুবিধে হবে বৈকি। তবে বেশি দিন বসে থাকতেও হবে না। আমরা সবাই তোমাকে এক একখানা সুপারিশপত্র দিয়ে যাব। তা হলে তোমার আর ভয় নেই। কেমন?"

তাতেও থামে না বর্ষণ।

তখন বাদল বলে, "বুঝেছি। প্রথম মাসটা হয়তো তোমাকে ধার করতে হবে। ভাবনার কথা বৈকি। আচ্ছা, আমরা সবাই তোমাকে কিছু কিছু বকশিষ দিয়ে যাব। আমার—ভালো কথা, আমার যা কিছু সম্বল আছে তুমিই কেন নাও না, জেসী? এই স্যুট ছাড়া আর কিছুই আমি সঙ্গে নিচ্ছিনে।"

পীচ অবাক হল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার চোখের জল বাগ মানল না। এ দিকে বাদলেরও কিছুতেই খেয়াল হলো না যে মানুষের প্রতি মানুষের মায়া মমতা জন্মায়। মানুষ মানুষকে যেতে দিতে চায় না। তাই কাঁদে।

বাদলের ঘুম পাচ্ছিল। বলল, "রাত হয়েছে। যাও, ঘুমিয়ে পড়।"

পীচ কিন্তু সরল না, যেমন দাঁড়িয়েছিল তেমনি দাঁড়িয়ে রইল।

কী করে? ঘর থেকে ঠেলে বার করে দিতে পারে না, অথচ

পীচ যতক্ষণ আছে ততক্ষণ শুতে যেতেও সংস্কারে বাধে। বাদল কী ভেবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, গিয়ে বাইরে পায়চারি করল। সকলের ঘর বন্ধ, কোথাও আলো নেই, একমাত্র তারই ঘর ছাড়া।

যখন ঘরে ফিরল তখনো পীচ তেমনি দাঁড়িয়ে, তবে ঘরের মাঝখানে নয়, জানালায় ঝুঁকে। তার চোখ বোধহয় তারার দিকে।

বাদল তার কাছে গিয়ে তার হাতে হাত রাখল। বলল, "জেসী, রাত হয়েছে। যাও, ঘুমিয়ে পড়। কাল সকালে এসো, তোমার জন্যে কী করতে পারি দেখব।"

জেসী শুনল কি না বোঝা গেল না। তার হাত অসাড়, তার ভঙ্গিও। তার অশ্রু থেমেছে, রয়েছে একটা থমথমে ভাব।

"জেসী, কাল তোমাকে সব জিনিস দিয়ে যাব। যা আমার আছে।"

এতক্ষণে তার মুখ ফুটল। "আমি চাইনে।"

"তবে তুমি কী চাও? তোমার জন্যে কী করতে পারি?"

"কিছু না।" এই বলে সে আবার চুপ করল।

৮

বাদলকে অবশেষে সংকোচ বিসর্জন দিয়ে বলতেই হল যে তার ঘুম পেয়েছে, জেসী যদি দয়া করে যায় তো সে বাধিত হয়।

জেসী দয়া করল। তখন বাদল শোবার কাপড় পরে আলো নিবিয়ে বিছানায় গা ঢেলে দিল। ভাবল, আহ্ কী আরাম! কিন্তু কাল কোথায় থাকবে বিছানা বালিশ, কাল ঘুম হবে কী করে?

আর একটু হলেই সে ঘুমিয়ে পড়ত। অসাধারণ ক্লান্ত। কিন্তু তার মনে হলো দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে কে যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে

কাঁদছে। বাদল ইতস্তত করল, বিছানা থেকে উঠতে তার শক্তি ছিল না, ঘুমে তার চোখ জড়িয়ে আসছিল। তবু উঠতেই হলো, পরকে যদি কাঁদতে দেয় তবে দুঃখমোচন করবে কার!

যা ভেবেছিল তাই। জেসী।

"কী হয়েছে, জেসী। তুমি ঘুমোতে যাওনি?"

জেসী উত্তর দিল না। তখন বাদল তাকে বারংবার প্রশ্ন করে এইমাত্র উদ্ধার করল যে তার দিদি ইতিমধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে, যে ঘরে তারা দু'জনে শোয় সে ঘর ভিতর থেকে বন্ধ। দিদিকে জাগাতে সাহস হয় না, ডাকাডাকি করলে বাড়িশুদ্ধ সবাই জাগবে।

কী আপদ! বাদল কী করবে এত রাত্রে জেসীর জন্যে? বাড়ির সবাইকে জাগানো ঠিক হবে না। বাইরে সারা রাত জাগিয়ে রাখাও অন্যায়।

"আচ্ছা, বসবার ঘরে তো ঘুমাতে পারো। বালিশের দরকার থাকলে আমি দিতে পারি।"

"না, আমার একলা ভয় করবে।"

বাদল ভাবল জেসীকে তার ঘরটা ছেড়ে দিয়ে সে নিজেই বসবার ঘরে গিয়ে শোবে। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও সেই একই উত্তর। আমার একলা ভয় করবে।

অগত্যা বাদল জেসীকে তার ঘরে স্থান দিল। হাতের কাছে যা পেলো, সুটকেস, য়্যাটাশে কেস, বড় বড় বই, সব একত্র করে মেজেতে একটা মঞ্চ গড়ল। তার উপর বিছানা পেতে নিজেই সেখানে শুয়ে পড়ল। জেসী কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকল। বাদলের খাট দখল করবে জেসীর এমন স্পর্ধা ছিল না।

তখন বাদল বাধ্য হয়ে নিজের খাটে শুলো, জেসীকে বলল মেজের

বিছানায় শুতে। সে তা করল কি না দেখবার আগে বাদল ঘুমিয়ে পড়ল।

ভোরের দিকে বাইরের আলো লেগে তার ঘুম পাতলা হয়ে এল। সে অনুভব করল কে যেন তার পাশে শুয়ে তার গলাটি জড়িয়ে ধরেছে। ক্রমে তার জ্ঞান হলো জেমীর ঘুমন্ত মুখখানি তার মুখের কত কাছে। ভোরের আলোয় কী সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে। যেমন সরল তেমনি মধুর তেমনি পরনির্ভর।

বাদলের তখন ভাববার সাধ্য ছিল না, ঘুমের ঘোরে তার মস্তিষ্ক নিষ্ক্রিয়। তবু সে চেষ্টা করল চিন্তা করতে। তার বেশ আরাম লাগছিল সেইভাবে ঘুমোতে। কিন্তু অন্তরে একটা অস্বস্তির ভাবও ছিল। সে বিবাহিত পুরুষ, সেইজন্যে কী? না, সেজন্যে নয়। সে মুক্ত পুরুষ, বিবাহে তাকে বাঁধেনি। কেন তবে অস্বস্তি?

পাছে জেমীর ঘুম নষ্ট হয় সেই ভয়ে বাদল নড়চড় করতে পারছিল না। ওদিকে আলো পড়ছিল তার চোখের উপর, তাতে তার ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছিল। অস্বস্তি কি সেইজন্যে?

ষোল সতের বছর বয়সের এই নির্মল মেয়েটি একটি হাতে বাদলের গলাটি জড়িয়ে বিনা কথায় কী বলতে চায়? "যেতে নাহি দিব।" বলতে চায়, "যাও দেখি, যাবে কেমন করে?"

এক মুহূর্তে বাদলের কাছে সব স্পষ্ট হয়ে গেল। জেমী বাদলকে যেতে দেবে না, বেঁধে রাখবে। তাই তার কাঁদন। কাঁদন দিয়ে সে বাঁধন রচনা করবে, যাবার বেলায় বাধা দেবে। তাই তার কাঁদন।

এই হৃদয়দৌর্বল্যকে প্রশ্রয় দিতে নেই। বাদল ধীরে ধীরে জেমীর হাতখানি সরিয়ে সোজা হয়ে উঠে বসল। জেমীরও ঘুম ভেঙে গেল। সে হঠাৎ উঠে বসে অপ্রতিভ হয়ে এক দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

তখন বাদল দু'তিন বার হাই তুলে ভাবল আর একটু শোয়া যাক। শুতে শুতে আবার ঘুমিয়ে পড়ল, এবার চোখে বালিশ চেপে। কয়েক ঘণ্টা বাদে তার দরজায় কে টোকা দিচ্ছে শুনে তার ঘুম ছুটে গেল। সে চোখ না চেয়ে চেঁচিয়ে বলল, "Come in."

"কী! তুই এখনো বিছানায় পড়ে!" সুধী বলল ঘরে ঢুকে। "প্রায় ন'টা বাজে, তা জানিস?"

"তাই নাকি?" বাদল লাফ দিয়ে উঠে বসল। "ন'টা বাজে!"

"বলে বেড়াস তোর নাকি দারুণ অনিদ্রারোগ। কই, আমি তো কোনো দিনও লক্ষ করলুম না যে তুই সকালবেলা জেগে আছিস!"

"কী করে লক্ষ করবে? আমার অনিদ্রা তো রাত্রে। জানো, সুধীদা, কাল রাত্রে আমি কখন ঘুমিয়েছি? দেড়টায়।"

কখন এক সময় জেসী এসে বাদলের মাথার কাছে একটা টি-পয়তে চা ইত্যাদি রেখে গেছল। আর তুলে দিয়েছিল মেজের বিছানা। বাদল মনে মনে ধন্যবাদ জানাল, শুধু চায়ের জন্যে নয়, বিছানা তোলার জন্যেও। নইলে সুধীদা শুধালে কী কৈফিয়ৎ দিত?

চা খেতে খেতে বাদল বলল, "তুমি কিছু খাবে না, সুধীদা?"

"আমি খেয়ে বেরিয়েছি। থাক।"

মাদাম ব্রনস্কি বাদলের যে মূর্তি নির্মাণ করেছিলেন সেটা সুধী এই প্রথম দর্শন করল। "কার মূর্তি? তোর?"

বাদল সগর্বে বলল, "কেমন হয়েছে? রোদাঁর ভাবুক মূর্তির চেয়ে খারাপ?"

সুধী হেসে বলল, "কতকটা সেই রকম দেখতে। তুই কী সমস্তক্ষণ ওই ভাবে বসেছিলি?"

বাদল লজ্জিত হয়ে বলল, "তা কেন? আমি কি জানতুম যে উনি

আমার মূর্তি গঠনের জন্যে নক্‌সা এঁকে নিচ্ছেন ? আমি আপন মনে বসে বসে কী যেন চিন্তা করছিলুম। আমার ধারণাই ছিল না যে আমাকে রোদাঁর ভাবুকের মতো দেখতে।”

সুধী হাসি চেপে বলল, “মাদাম বোধহয় রোদাঁর শিষ্যা।”

ইঙ্গিতটা বাদলের মর্মভেদ করল না। সে উচ্ছ্বসিত ভাবে বলল, “এ মূর্তি গঠন করতে অধিক সময় লাগেনি, এর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে সপ্তাহের পর সপ্তাহ লেগেছে। ঐ যে চোখ দু'টি দেখছ ওর জন্যে মাদামকে আমি রোজ একবার সিটিং দিয়েছি। বল দেখি, কেমন হয়েছে ?

“ভালোই।” সুধী বলল, “মাদামের চোখ আছে।”

“এখন এ মূর্তি নিয়ে আমি করি কী ? কাকে দিই ?” বাদল ভাবুকের মতো ভাবতে বসল। “তুমি কি এর দায়িত্ব নিতে পারবে, সুধীদা ?”

“রাখতে বলিস, রাখব। দায়িত্ব কিসের ?”

“দায়িত্ব কিসের ! বল কী, সুধীদা ! আমার সর্বস্ব গেছে, ভাবীকালের জন্যে একমাত্র নিদর্শন আছে এই মূর্তি। যদি হারিয়ে যায় কি ভেঙে যায় তবে—” বাদল শিউরে উঠল।

“তবে আরো মূর্তি গড়া হবে, ছবি আঁকা হবে। ভাবনা কী, বাদল ! তুই এমন ভেঙে পড়ছিস কেন ? তারাপদ কী নিয়েছে তোর ? কোন দুঃখে তুই নদীর বাঁধে যাচ্ছিস ?”

বাদল ততক্ষণে খাওয়া শেষ করেছিল। পায়চারি শুরু করল। “তোমাকে তো বলেছি তারাপদর জন্যে আমি নদীর বাঁধে যাচ্ছিনে। যাচ্ছি আমার ক্রমবিকাশের অনুসরণে। আমার মন যেখানে এসে পৌঁছেছে সেখানকার সঙ্গে নদীর বাঁধের সংযোগ আছে। তবে

একথা ঠিক যে একদিন আগেও অতটা আমার জানা ছিল না। তারাপদ আমাকে আত্ম আবিষ্কারের উপলক্ষ দিয়ে গেছে, তাই আমি তাকে ক্ষমা করেছি।"

"তুই পায়চারি রাখ। পোশাক পরে নে। তোর একটা সামাজিক কর্তব্য আছে, সেটা করে নে। তার পরে যেতে হয় নদীর বাঁধে যাবি।" সুধী তাড়া দিল।

"মানে কী, সুধীদা?" বাদল বিস্মিত হলো।

"তোর শাশুড়ীরও সর্বস্ব না হোক অনেক ধন গেছে। তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়া দরকার।"

"বল কী, সুধীদা!" বাদল আকাশ থেকে পড়ল। "তারাপদ তাঁকেও—"

"হাঁ, তাঁকেও ঠকিয়েছে। তোর বন্ধু বলে পরিচয় দিয়ে তাঁর বিশ্বাস লাভ করেছে, তাই তোর একবার যাওয়া উচিত।"

"একবার কেন, একশো বার।" বাদল অবিলম্বে প্রস্তুত হলো। "একশো বার কেন, এক হাজার বার। আমার নাম করে একজন নিরীহ ভদ্রমহিলাকে বঞ্চনা করা কি আমি ক্ষমা করতে পারি?"

দুই বন্ধু বাইরে যাচ্ছে এমন সময় জেসীর সঙ্গে দেখা। বাদল বলল, "জেসী, ভয় নেই, আমি এবেলা যাচ্ছিনে, ওবেলা যাব।"

মেয়েটির চোখদুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল, তা সুধীর নজর এড়াল না। সুধী শুধাল, "ওটি কে, বাদল?"

"আমাদের কমরেড জেসী। বড় মিষ্টি মেয়ে। আমাকে যেতে দেবে না বলে পাহারা দিচ্ছে, দেখলে তো?"

৯

যেতে যেতে সুধী বলল, "বাদল, আমি বোধহয় বেশি দিন লণ্ডনে থাকব না, গ্রামে যাব। যে ক'দিন আছি তোর সঙ্গে থাকতে চাই, কিন্তু নদীর বাঁধে থাকতে পারব না।"

"কেন, সুধীদা? ভয় কিসের?" বাদল পাদ্রীর মতো ভজাল, "নদীর বাঁধের মতো অমন ঠাঁই পাবে কোথায়? খোলা আকাশ, খোলা বাতাস। মাঝে মাঝে দু'চার ফোঁটা বৃষ্টি পড়তে পারে, তার জন্যে এত ভয়!"

"না, বাদল।" সুধী হাসল। "তুই দেখছি না শুয়েই শোবার সুখ উপভোগ করেছিস। আমি কিন্তু এসব বিষয়ে সংশয়বাদী।"

"তুমি", বাদল মহা বিরক্ত হয়ে বলল, "কিছুই দেখবে না, কিছুই শিখবে না, কেবল মিউজিয়াম আর ঘর! তোমার মতো মানুষকে আমরা বলে থাকি এস্‌কেপিস্ট। তোমরা বাস কর গজদন্তের গম্বুজে। তুমি তো বেহালাও বাজাও।"

"বেহালা নয়, বাঁশি।"

"একই কথা।" বাদল উষ্ণ হয়ে উঠল। "পৃথিবীর সম্মুখে ঘোর সংকট। যুদ্ধ কি বিপ্লব, কী যে ঘটবে তার ঠিক নেই। আর তুমি কিনা ছিন্নবাধা পলাতক বালকের মতো," বাদলের মনে পড়ল রবীন্দ্রনাথের কবিতা "সারা দিন বাজাইলে বাঁশি!"

"বহুকাল বাজাইনি, বাদল। ইচ্ছা করে সারা রাত বাজাতে।" সুধী গায়ে পেতে নিল বাদলের অভিযোগ।

"না, তোমাকে দিয়ে কিছু হবে না।" বাদল হতাশ হয়ে হাল ছাড়ল। "তুমি এস্‌কেপিস্ট। তোমার পলাতক মনোবৃত্তি কী করে দূর হবে জানিনে। সারা রাত বাঁশি বাজানো যে সমস্যার মুখোমুখি

হতে অস্বীকার তা কি তুমি বুঝবে যে তোমাকে বোঝাব! তোমার মতো অবুঝ লোক হয়তো হেসে উড়িয়ে দেবে যে এটা সমাজের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা।"

সুধী শান্ত ভাবে বলল, "বিশ্বাসঘাতকতা কিসের?"

বাদল সর্বজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে বলল, "তুমি তা হলে Julien Bendaর বইখানা পড়নি। তোমরা বুদ্ধিজীবীরা বিশ্বাসঘাতকতা না করলে সমাজের এ দশা হতো না। তোমরা সারাদিন বাঁশি বাজিয়েছ, খোঁজ রাখনি কী করে একদল চালাক লোক পরিশ্রমীদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে ফলার করেছে। তোমাদেরকে দিয়েছে কাঁঠালের ছিবড়ে, তাই খেয়ে তোমাদের এমন নেশা জমেছে যে তোমরা সারা দিন বাঁশি বাজিয়েছ, আর ভেবেছ এ ব্যবস্থা চিরকাল চলবে।"

"এসব তো জানতুম না বাদল।" সুধী স্বীকার করল। "তুই আয়, আমার সঙ্গে থাক, আমাকে বুঝিয়ে দে কবে কেমন করে কার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছি।"

বাদল রাজি হল না। বলল, "তোমার সঙ্গে থাকতে কি আমার অসাধ! কিন্তু আমার পূর্বজীবনকে আমি পশ্চাতে ফেলে এসেছি। আমাকে এগিয়ে যেতে হবে অনিশ্চিতের অভিমুখে, অন্ধকারের গর্ভে। আমাকে আবিষ্কার করতে হবে কলকাটি। আমি এমনি করে একটি বোতাম টিপব," বাদল অভিনয় করে দেখাল, "আর সমভূম হয়ে যাবে তোমাদের এই অপরূপ সমাজব্যবস্থা। এই বর্ণচোরা শোষণব্যবস্থা।"

বাদল বোধ হয় চোখে বোতাম দেখছিল, সুধী তার হাত ধরে টেনে না সরালে মোটরের সামনে পড়ত।

"তোর জন্যে আমার ভয় হয়, বাদল। তুই যে কোন দিন দেশলাই ফেরি করতে করতে মোটর চাপা পড়বি কে জানে!"

"তা হলে তো বেঁচে যাই, সুধীদা। অহোরাত্র একটা না একটা চিন্তা নিয়ে আছি, আর সব চিন্তার গোড়ায় সেই একই চিন্তা—দুঃখমোচন। আচ্ছা, বল দেখি আমার কেন এত মাথাব্যথা! তোমার তো কই কোনো দুর্ভাবনা নেই?"

সুধী হেসে বলল, "আমি যে বিশ্বাসঘাতক।"

"না, না, পরিহাসের কথা নয়, সুধীদা। এই যে তুমি বিলেতে আছ, তোমার খরচ আসছে জমিদারির প্রজাদের কাছ থেকে কিংবা জীবনবীমার কোম্পানির কাছ থেকে। কোম্পানি ও টাকা লাভের ব্যবসায় খাটিয়েছিল, ও টাকা শোষণের টাকা। তুমি তোমার এই খরচের কী হিসাব দিচ্ছ, শুনি? দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করছ। তাতে কার কী প্রাপ্তি? প্রজারাই বা কী পাচ্ছে, শোষিতদের পাওনা কী ভাবে মিটছে? আমি তো এইজন্যে বাড়ি থেকে টাকা নেব না স্থির করেছি। বাবার টাকা যে গভর্নমেণ্ট দিচ্ছে সে তো শোষণের উপর সুপ্রতিষ্ঠ।"

"এ সব তত্ত্ব আরো ভালো করে শুনতে চাই বলে তোকে আবার ডাকছি, বাদল, তুই আয়, আমার সঙ্গে কিছু দিন থেকে আমাকে বুঝিয়ে দে এ সব। তোর সঙ্গে অনেক তর্ক আছে।"

বাদল বলল, "না। আজকেই আমাকে ঝাঁপ দিতে হবে।"

"ঝাঁপ!" সুধী চমকে উঠল।

"হাঁ। জনসাগরে তলিয়ে গিয়ে এই সমস্যার তল খুঁজব—এই শোষণ সমস্যার ও এর রুধিরহীন সমাধানের।"

"বাদল, তোকে নিরুৎসাহ করব না। কিন্তু দিন কয়েক আমার সঙ্গে বাস করে তার পরে ঝাঁপ দিতে দোষ কী?"

"সুধীদা, আমি কৃতসংকল্প।"

সুধী যে বাদলকে সকাল বেলা পাকড়াও করেছিল তা শুধু তার শাশুড়ীর প্রতি সামাজিক কর্তব্যের অনুরোধে নয়। তাকে নদীর বাঁধ থেকে নিবৃত্ত করে নিজের কাছে কিছু দিন রাখার অভিপ্রায় প্রবল হয়েছিল। সুধী গত রাত্রে ভাববার অবসর পায়নি, অশোকা তার মন জুড়েছিল। আজ ভোরে উঠে ভেবে দেখল বাদল যদি সত্যি সত্যি দেশলাই বেচে তবে তার বাবা শুনতে পেলে সুধী সম্বন্ধে কী মনে করবেন!

কিন্তু বাদলের উপর জোর খাটে না, তাকে বকলে সে রাগ করে দেশলাই কেন, জুতোর ফিতে বেচবে। নদীর বাঁধে কেন, গাছতলায় শোবে। পরে তা নিয়ে থানা পুলিশ করতে হবে।

"বেশ, তুই যা করতে চাস তা কর। কিন্তু ভুলে যাসনে এ দেশে ভবঘুরেদের জন্যে আইন আছে।"

"আইন!" বাদল আঁতকে উঠল। "তা হলে তো মাটি করেছে!" বাদল জিজ্ঞাসা করল, "তুমি ঠিক জানো?"

"তুই আইনের ছাত্র। ঠিক জানার কথা তো তোরই। আমি যে গজদন্তের গম্বুজে থাকি!"

বাদল বিচলিত হয়ে বলল, "মার্গারেট তো কাল আমাকে সতর্ক করেনি। আইন! তুমি বলতে চাও ভবঘুরে বলে সন্দেহ করে আমাকে জেলে পুরবে?"

"সম্ভব। সেই জন্যেই তো বলি, আয়, আমার কাছে কিছুদিন থাক, আইনের খবর নে। তার পরেও নদী থাকবে, নদীর বাঁধ থাকবে, তারা পলাতক হবে না।"

বাদল ধরা দিল না। বলল, "অত আটঘাট বেঁধে ঝাঁপ দেওয়া কি

ঝাঁপ! ঝাঁপ দিতে হয় চোখ বুজে। যদি জেলে নিয়ে যায় তো যাব। দেখব মানুষ মানুষকে কত কষ্ট দেয়।"

বাদলের শাশুড়ী মিসেস গুপ্ত তখন জিনিসপত্র লরীতে বোঝাই করতে দিয়ে জন কয়েক বান্ধব বান্ধবীর সঙ্গে গল্প করছিলেন। সুধীবাদলকে দেখে কাষ্ঠ হাসি হাসলেন। "এই যে তোমরাও এসে পড়েছ। কোথায় শুনলে যে আমি স্বাস্থ্যের জন্যে সুইটজারলণ্ডে যাচ্ছি? আর একটু দেরি হলে দেখা হতো না।"

সুধীর ইচ্ছা ছিল সহানুভূতি জানাবে, কিন্তু তিনি যে স্বাস্থ্যের জন্যে যাচ্ছেন এই সংবাদের পর সহানুভূতির কথা তুলে তাঁকে বিব্রত করা উচিত নয়। বাদল কিন্তু ফস করে বলে বসল, "আমি যে কী ভয়ানক লজ্জিত—"

তিনি ঠাওরালেন বাদল লজ্জিত উজ্জয়িনীর প্রতি কর্তব্য করেনি বলে। বললেন, "সুখী হলুম, বাদল, তোমার সুমতি দেখে। এখনো বেবী এ দেশ ছাড়েনি। তাকে চিঠি লিখো, সে হয়তো তোমার কাছে আসবে।"

এই বলে তিনি মুখ ফেরালেন। তাঁর অন্যান্য অভ্যাগতদের সঙ্গে আলাপ ফেনিয়ে উঠল। শুধু আলাপ নয়, ফেনিয়ে উঠল আরো একটি দ্রব্য। না, দ্রব্য নয়, দ্রব।

তাঁরাও সহানুভূতি জানাতে এসেছিলেন। তিনি তাঁদের নিরস্ত করে বলছিলেন, "ও কিছু নয়। আর্টের প্রতি আমার একটা দুর্বলতা আছে। আর্টের নামে কেউ কিছু চাইলেই অমনি দিয়ে ফেলি, ফিরে পাবার আশা রাখিনে।"

কিন্তু তাঁর মুখে গভীর নিরাশার দাগ ছিল। তাঁর চোখের চাউনি যেমন সজল তাঁর ঠোঁটের কাঁপুনিও তেমনি স্নায়বিক। সুধী উচ্চবাচ্য

করল না। বাদল আর এক বার কী বলতে চেষ্টা করছিল, সুধী তার গা টিপল।

অভ্যাগতরা বিদায় নিলে তিনি সুধীর দিকে ফিরে বললেন, "তার পর, সুধী? তোমার ভারী অদ্ভুত লাগছে, না? দেখ, আমার স্বাস্থ্য সত্যিই এদেশে টিকছে না। রাজার দেশ বলেই আছি, নইলে কোন কালে চলে যেতুম। সুইটজারলণ্ডের মতো দেশ আর হয় না। ওখানকার হাওয়ায় দু'দিনেই বেঁচে উঠব। বাদল তুমি অবশ্য ইংলণ্ডের পক্ষে ওকালতী করবে। কিন্তু এদেশ অসহ্য। তোমরাও পারো তো এসো সুইটজারলণ্ডে। বেবীকে লিখে আনাও না, বাদল? তোমারই তো স্ত্রী। আচ্ছা, এখন তা হলে গুড বাই। স্টেশনে আসতে চাও? Oh, how kind of you!" বলে তিনি কেঁদে ফেললেন।

প্রত্যাবর্তন

১

উজ্জয়িনী যাবার সময় সুধীকে অনুরোধ করেছিল, "চিঠি লিখতে একদিনও ভুলো না। ···মনে রেখো।"

সুধীও ঠিক প্রতিদিন না হলেও প্রায়ই চিঠি লেখে। না লিখলে উজ্জয়িনী টেলিগ্রাম করে, জানতে চায় অসুখ করেছে কি না। বেচারিকে অযথা খরচ করিয়ে লাভ কী? তার চেয়ে একখানা পোস্টকার্ডের পিঠে দু'চার ছত্র লিখে রোজ ডাকে দেওয়া কঠিন নয়। সুধী কিন্তু রোজ সেটুকুও পারে না, নিজের চিন্তায় মগ্ন থাকে।

তা ছাড়া তার চিঠি লেখার ধরণ এই যে সে মামুলি চিঠি লেখে না। দু' লাইন হোক, চার লাইন হোক যাই লিখুক ভালো করে ভেবে ও গুছিয়ে লেখে। তাই তার চিঠির সংখ্যা কম। উজ্জয়িনীর খাতিরে সে যেমন তেমন করে দু' চার ছত্র লিখে দায় সারতে পারে না। তাই মাঝে মাঝে গাফিলি হয়।

"শুধু লিখলে চলবে না। রীতিমতো বড় চিঠি লিখতে হবে। বুঝলে?" উজ্জয়িনী শাসন করে। "আমি যত বড় চিঠি লিখি তুমিও তত বড় চিঠি লিখবে। মনে রেখো।"

সর্বনাশ! উজ্জয়িনীর এক একটা চিঠি যে এক একখানা পুঁথি। কোথায় কী দেখেছে, কার সঙ্গে কী নিয়ে আলাপ হয়েছে, এসব তো থাকেই, থাকে সুপ্রচুর উচ্ছ্বাস। এতদিন পরে সে জীবনকে উপভোগ করতে শিখেছে, তার কোনো ক্ষোভ নেই, আক্ষেপ শুধু এই

যে সুধীদা তার মতো সুখী নয়। হতভাগা সুধীদা! তার প্রিয়া তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তা সত্ত্বেও সে কেন যে লণ্ডনে পড়ে আছে! ক্ষতি কী যদি আমেরিকা যাত্রা করে, আমেরিকার পথে ভারত?

"সুধীদা ভাই, তোমার জন্যে আমার মন সব সময় খারাপ। যখনি কিছু উপভোগ করি তখনি মনে হয়, আহা! সুধীদা তো উপভোগ করছে না। এমন দৃশ্য একা উপভোগ করা অন্যায়। সুধীদা, তোমার জন্যে দৃশ্যপট পাঠাতে পারি, দৃশ্য পাঠাতে পারিনে। কাজেই তোমাকে আমি বার বার বলি, তুমি চলে এসো, যোগ দাও আমাদের সঙ্গে।"

এর উত্তরে সুধী লেখে, "আমার জন্যে মন খারাপ করিসনে। আমি প্লেটো পড়ছি। সেও এক অপূর্ব উপভোগ।"

"আচ্ছা," উজ্জয়িনী লেখে, "এখন তো অশোকার উপদ্রব নেই, আগারও উৎপাত নেই। তোমার হাতে রাশি রাশি সময়। কেন তবে তোমার মনের ছবি কলম দিয়ে আঁকো না? আমার কত কাজ। তবু আমি রোজ রাত্রে শোবার আগে তোমাকে দশ বারো পৃষ্ঠা লিখি। তুমি যে আমার ঘুমের অংশ নিচ্ছ তার বিনিময়ে কী দিচ্ছ, বল তো?"

এর উত্তরে সুধী—"বাঃ তোর উৎপাত নেই কী রকম! তোর চিঠি পড়তে যে আমার পুরো আধ ঘণ্টা লাগে। আর তুই কি জানিসনে যে আমি স্বল্পভাষী?"

উজ্জয়িনী—"আহ্, সুধীদা! তুমি স্বল্পভাষী বলে কি এতদূর স্বল্পভাষী! অশোকার বেলায় কি এমনি স্বল্পবাক্ ছিলে? জানি গো জানি। তুমি এক একজনের কাছে এক এক রকম। না, ওসব শুনব না। বোবাকে কথা কওয়াব। যদি লম্বা চিঠি না পাই তবে—থাক, আজ আর বললুম না। আমার মাথায় অনেক দুষ্ট বুদ্ধি আছে। যথাকালে টের পাবে।"

এর পরে সুধী কিছুদিন পোস্ট কার্ডের বদলে খামে ভরা চিঠি লিখেছিল। তাতে লণ্ডনের হালচাল জানিয়েছিল। ফলে উজ্জয়িনী প্রসন্ন হয়েছিল। লিখেছিল, “তুমি পারো সবই, কিন্তু তার জন্যে শাসন দরকার। যাক, এখন লক্ষ্মী ছেলের মতো সকলের খবর দিয়ো। কে কেমন আছে—ক্রিস্টিন, সোনিয়া, বুলুদা। বুলুদা বোধহয় আমার উপর অভিমান করেছে আমি চিঠি লিখিনি বলে। কিন্তু আমিও তোমারই মতো স্বল্পবাক্। যা কিছু বলবার তা একজনকে বলতেই নিঃশেষ হয়ে যায়। অপরের জন্যে থাকলে তো বলব! ভালো কথা, মা'র চিঠি পাচ্ছিনে কেন? অসুখ করেনি আশা করি।”

ঠিক এই সময় তারাপদ ফেরার হয়। তারপর উজ্জয়িনীর মা সুইটজারলণ্ড চলে যান। যদিও বাদল সম্বন্ধে উজ্জয়িনী লেশমাত্র অনুসন্ধিৎসু নয়, তবু তারাপদর অন্তর্ধানের পরে বাদলও ঝম্পদান করে। এসব খবর দস্তুরমতো জবর। সুধী বেশ ফলাও করে লিখল। তার আশঙ্কা ছিল উজ্জয়িনী হয়তো ভাববে সুধী যথেষ্ট চেষ্টা করেনি, করলে কি বাদল অমন করে নদীর বাঁধে শুতো, দেশলাই বেচে খেত?

“চেষ্টা করলে বাদলকে আমি নিরস্ত করতে পারতুম।” সুধী সাফাই দিল। “কিন্তু সেটা হতো নেহাৎ গায়ের জোর। পরে সে এই বলে অভিযোগ করত যে আমার জন্যে তার জীবন ব্যর্থ হলো। আমি কি তার জীবনের ব্যর্থতার দায়িত্ব নিতে পারি! আমি লণ্ডনে যে কয়দিন পারি থাকব, তার খোঁজ খবর রাখব, যদি তার অসুখ করে তখন গ্রেপ্তার করে আনব। অথবা যদি সে নিজেই গ্রেপ্তার হয় তবে তার জামিন দাঁড়াব। আপাতত এই আমার পরিকল্পনা। তুই নিশ্চিন্ত মনে উপভোগ কর, বাদলের ভার আমার উপর ছেড়ে দে। আর যদি তোর ইচ্ছা করে স্বামীর ভার নিতে তবে চলে আয়,

আমেরিকা যাসনে। মোট কথা, তুই স্বাধীন, যেমন বাদল স্বাধীন।"

এর উত্তরে উজ্জয়িনী—"আমার স্বামী কাকে বলছ? তিনি ও সম্পর্ক স্বীকার করেন না, আমিও স্বীকার করতে নারাজ। তিনি ও আমি পরস্পরের কমরেড হতে পারতুম, কিন্তু সেদিন তাঁর মুখে যা শুনলুম তার পরে তাতেও আমার অরুচি। না, আমি তাঁর ভার নিতে পারব না, সুধীদা। সত্যি বলতে কী, আমি তাঁকে এড়াতেই চাই। আমার জীবন আমার একার। এ জীবন আমি যাকে খুশি উপহার দেব। তুমি শুনে অবাক হবে যে আমি তাঁর পদস্খলন প্রার্থনা করি। তা হলে আমি সেই অজুহাতে ডিভোর্স আদায় করে নেব। না, আমি যাব না লণ্ডনে! যা করবার তা তুমিই কোরো, তিনি তোমারই বন্ধু। আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত আছি।"

চিঠি পড়ে সুধী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। কী পরিবর্তন! এই উজ্জয়িনী একদিন কত ভালোবাসত বাদলকে। কী ঈর্ষান্বিতা ছিল সে! সেই কিনা লিখছে, "আমি তাঁর পদস্খলন প্রার্থনা করি। তা হলে আমি সেই অজুহাতে ডিভোর্স আদায় করে নেব।" হা ভগবান!

সুধী রাগ করে উজ্জয়িনীকে চিঠি লেখা বন্ধ করে দিল। তার টেলিগ্রামের জবাবে জানাল, শরীর ভালো আছে।

উজ্জয়িনী সুধীর কে? বাদলের স্ত্রী বলেই তার সঙ্গে সুধীর পরিচয় ও সম্পর্ক। সে যদি বাদলের স্ত্রী না হয়, ডিভোর্সের কথা তোলে, তবে তার সঙ্গে সুধীর পরিচয় বা সম্পর্ক নেই, সে সুধীর কেউ নয়।

যা শুনে সুধীর অবাক হবার কথা তা শুনে সে যে শুধু অবাক হলো তাই নয়, মর্মাহত হলো। তার জীবনে সে এই প্রথম শুনল যে স্ত্রী

স্বামীর পদস্খলন প্রার্থনা করছে। তার সংস্কারে ভীষণ ঘা লাগল। অন্য কোনো মেয়ে হলে সে উপেক্ষা করত। কিন্তু এ যে উজ্জয়িনী।

ছি ছি! কী করে এ কথা উদয় হলো উজ্জয়িনীর মনে! কই, কোনো নভেলে কী নাটকে তো এ কথার উল্লেখ নেই। থাকলে সুধী এতটা আঘাত পেতো না, ভাবত উজ্জয়িনী কোনোখানে ওকথা পড়েছে বা শুনেছে, সেইজন্যে নিজের বেলায় প্রয়োগ করছে। ওটা যে উজ্জয়িনীর মৌলিক উক্তি নয়, এ বিষয়ে সুধী নিশ্চিত হতে পারছিল না, হলে আশ্বস্ত হতো।

সুধী রাগ করল, দুঃখও পেলো। এতদিন সে উজ্জয়িনীর পক্ষে ছিল, কেননা ধর্ম ছিল উজ্জয়িনীর পক্ষে। এখন এই উক্তির পর উজ্জয়িনী সুধীর সহানুভূতি হারালো, কেননা ধর্মের সমর্থন হারালো। যে মেয়ে নিজের স্বামীর পদস্খলন প্রার্থনা করতে পারে সে মেয়ে যতই সহানুভূতির যোগ্য হোক না কেন এই উক্তির পর সহানুভূতি পেতে পারে না। না, না, সুধীকে কঠোর হতে হবে। সে ক্ষমা করবে না। অর্থাৎ ক্ষমা করবে যদি উজ্জয়িনী অনুতপ্ত হয়, যদি ঘাট মানে।

সুধী দুঃখ পেলো। যে মেয়ের কপাল খারাপ সে কেন স্বাধীন হয়েও সন্তুষ্ট হয়না, উপভোগ করেও তৃপ্ত হয় না, দেশভ্রমণ করেও ক্ষান্ত হয় না? সে যদি নারীবাহিনী গড়ে বন্দুক চালাত তা হলেও সুধী এমন দুঃখ পেত না। কিন্তু সে মেয়ে চায় জীবনটা যাকে খুশি উপহার দিতে। এবং এমন স্বার্থপর সে মেয়ে যে নিজের ডিভোর্সের জন্যে স্বামীর পদস্খলন প্রার্থনা করে। তার কি নৈতিক বোধ একেবারেই নেই? পদস্খলন কি এতই সুলভ? কেন বাদল পতিত হবে? সে কি তেমনি ছেলে? মুখে বলে কত রকম লম্বা চওড়া কথা। কিন্তু বাদল মনে প্রাণে দায়িত্ববান। সে কখনো অমন কিছু করবে না।

উজ্জয়িনীও না। ওটুকু শ্রদ্ধা উজ্জয়িনীর প্রতি সুধীর আছে। তা যদি না থাকত সুধী তাকে মুক্তকণ্ঠে উপভোগ করতে বলত না। সুধী চায় যে উজ্জয়িনী জীবনকে উপভোগ করুক, সুখী হোক, কিন্তু নীতির নিয়ম মেনে, সমাজের নিয়ম অক্ষুণ্ণ রেখে। তাই তার প্রার্থনার নমুনা শুনে হঠাৎ যেন একটা চোট পেল। এর মধ্যে নীতিবোধ, সামাজিক দায়িত্ববোধ কোথায় ?

২

একবার কল্পনা করুন সুধীর বিস্ময়। সেদিন মিউজিয়াম থেকে বাসায় ফিরে সিঁড়িতে পা দিতে যাচ্ছে এমন সময় বড় বুড়ী গন্ধ বিস্তার করে কোথা থেকে ছুটে এসে নিষ্ঠীবন বর্ষণ করতে করতে যা বলল তার মর্ম এই যে একজন ভদ্রমহিলা তার জন্যে অপেক্ষা করছেন—বসবার ঘরে।

ভদ্র মহিলা! সুধী বিমূঢ়ভাবে বলল, "আমার জন্যে!"

"ভারতীয় ভদ্রমহিলা আর কার জন্যে অপেক্ষা করবেন? তাঁর সঙ্গে বিস্তর লটবহর আছে। বোধহয় সোজা ভারতবর্ষ থেকে আসছেন।"

ভারতবর্ষ থেকে! সুধী মহাচিন্তিত হয়ে তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুয়ে বসবার ঘরে গেল।

"এ কী! তুই উজ্জয়িনী!"

"হাঁ, সুধীদা। আমিই। কেন, আমার তার পাওনি?"

"না। কোন ঠিকানায় করেছিলি?"

"মিউজিয়ামের।"

"সেখানে হাজার লোক। যাক, তোর চা খাওয়া হয়েছে?"

"দিচ্ছে কে, বল? তখন থেকে চুপটি করে বসে আছি। ওদের ধারণা আমি ইংরেজী ভালো জানিনে। তোমার বুড়ী খানিকটে অঙ্গভঙ্গি করে গেল। আমিও অঙ্গভঙ্গি করে তার জবাব দিলুম।" এই বলে সে হাসতে চেষ্টা করল।

"আচ্ছা, তা হলে আমি চা তৈরি করে আনি।"

"তুমি তৈরি করবে চা! থাক, থাক, তোমার হাত পুড়িয়ে কাজ নেই। তার চেয়ে চল কোনো রেস্টরাণ্টে যাই।"

উজ্জয়িনীর লটবহর সেই ঘরেই ছিল। সুধী লক্ষ্য করে বলল, "হুঁ।" তার মুখ শুকিয়ে গেল চিন্তায়।

তা অনুমান করে উজ্জয়িনী বলল, "কী করি, বল। মা থাকলে তাঁর কাছেই যেতুম। তোমার এখানে কোনো ঘর খালি নেই?"

"আমি যতদূর জানি, খালি নেই। খালি থাকলেও তোকে এ বাসায় থাকতে বলতুম না।"

সুধী মিউজিয়াম থেকে বাসায় ফিরে নিজের হাতে দুধ গরম করে খায়। তার সঙ্গে ফল ও রুটি। এই তার রাতের খাবার। এর পরে সে কিছুক্ষণ পায়ে হেঁটে বেড়িয়ে আসে। এবং স্নান করে ঘুমাতে যায়।

সেদিন উজ্জয়িনীকে তার খোরাকের ভাগ দিয়ে তার পরে ট্যাক্সি ডেকে তার জিনিস সমেত পাড়ার একটি হোটেলে চলল। রেসিডেন-সিয়াল হোটেল। সুধীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল ওখানকার এক পার্শী দম্পতির। তাঁরা বহুদিন থেকে সেখানে বসবাস করছেন।

ঝাবওয়ালা বললেন, "ঘর খালি আছে বৈকি। আপনারা বসুন, আমি সমস্ত ঠিক করে দিচ্ছি।"

উজ্জয়িনী কূল পেল। মিসেস ঝাবওয়ালা তার মায়ের বয়সী।

তিনি বললেন, "শুনে দুঃখিত হলুম যে তোমার মা লণ্ডনে নেই। তিনি যতদিন না ফিরেছেন তুমি এইখানেই থেকো, আর মা'কে লিখো সকাল সকাল ফিরতে।"

সুধী বলল, "কেমন, ঘর পছন্দ হয়েছে?"

"মন্দ নয়। তোমার বাসায় হলে আরো পছন্দ হত। তবু ভালো যে দূর বেশি নয়। আধ মাইল। না?"

"হুঁ।" সুধীর তখনো বিস্ময়ের ঘোর কাটে নি।

"সুধীদা", উজ্জয়িনী আবদার ধরল, "তুমিও এখানে উঠে এস।"

"আমি?" সুধী একটু থতমত খেয়ে বলল, "কেন, আমার আসার কী দরকার? এই তো ঝাবওয়ালারা রয়েছেন। তা ছাড়া আমি বোধহয় শীগগিরই লণ্ডনের বাইরে একটি গ্রামে যাচ্ছি। অনর্থক বাসা বদল করে কী হবে?"

"গ্রামে যাচ্ছ?" উজ্জয়িনী উল্লসিত হয়ে বলল, "আমাকে সঙ্গে নিতে আপত্তি আছে?"

সুধী সহসা গম্ভীর হল। উত্তর দিল না।

"তুমি বোধহয় ভাবছ", উজ্জয়িনী উপযাচিকা হয়ে কথাটা পাড়ল, "আমেরিকায় না গিয়ে আমি লণ্ডনে ফিরলুম কেন, ফিরলুম যদি তবে আবার গ্রামে যেতে চাইছি কেন?"

সুধী শুধাল, "ললিতাদি কোথায়?"

"তিনি কাল আমেরিকা রওনা হয়েছেন।"

"একলাটি গেলেন?"

"তোমার ভয় নেই। জাহাজে আরো অনেক ভারতীয় আছেন। এমন কি একজন চেনা লোকের সঙ্গেও দেখা হয়ে গেল—আমার নয়, তাঁর চেনা। মাদ্রাজী।"

সুধী উজ্জয়িনীকে জিজ্ঞাসা করল না কেন ফিরে এল সে। ধরে নিল সে অনুতপ্ত হয়ে স্বামীর ভার নিতে ফিরেছে। অভিমানিনী হয়তো ও কথা মুখ ফুটে কবুল করবে না, অন্য কৈফিয়ৎ দেবে।

"আজ তা হলে উঠি। এখন তোর বিশ্রাম দরকার। কিন্তু শোবার আগে সাপার খেতে ভুলিসনে।"

"ও কী! এরি মধ্যে উঠলে? বস, তোমার সঙ্গে কতকাল দেখা হয়নি।"

"কাল সন্ধ্যাবেলা আসব। আজ তুই বিশ্রাম কর।"

"কা—ল স—ন্ধ্যা বে—লা। আমি যদি কাল সকালবেলা তোমার ওখানে বেড়াতে আসি তোমার কাজের ক্ষতি হবে?"

"সকালে সময় কখন? প্রাতর্ভ্রমণের পর স্নানাহার করতে করতে মিউজিয়ামের বেলা হয়ে যায়।"

"যদি একসঙ্গে মিউজিয়ামে যাই?"

"বেশ তো। তোর যদি অসুবিধা না হয় আমার আপত্তি নেই।"

সুধী উঠল। তাকে এগিয়ে দিতে গিয়ে উজ্জয়িনী হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, "আমার উপর রাগ করেছ?"

"কিসে বুঝলি?"

"তোমার কথাগুলি তেমন মিষ্টি নয়, একটু ঝাঁজালো। তা ছাড়া তুমি চিঠি লেখনি এই সাত আট দিন।"

উজ্জয়িনীর প্রত্যাবর্তনে সুধীর মনটা নির্মল হয়েছিল। আহা! বেচারির উপর রাগ করা উচিত হয়নি। সে যা লিখেছিল তা ঝোঁকের মাথায় লিখেছিল। কী করবে, মরীয়া হয়ে উঠেছে বাদলের ব্যবহারে। তাই অমন কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়। সে যে আমেরিকা যাত্রার

প্রলোভন সম্বরণ করেছে এ বড় সামান্য ত্যাগ নয়। তার জন্যে কতটুকু ত্যাগ করেছে বাদল?

সুধী সেই ত্যাগশীলার প্রতি সম্ভ্রমে নতশির হলো। বলল, "রাগ করেছিলুম। কিন্তু এখন রাগ নেই।"

উজ্জয়িনী ঝর ঝর করে চোখের জল ঝরাল। সেই অবস্থায় হেসে বলল, "ওহ্! আমার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। আচ্ছা, যাও। কাল একসঙ্গে মিউজিয়ামে যাব।"

তারপর পিছু ডেকে বলল, "রাগ এখনো আছে, তা তোমার চলন দেখে বুঝেছি। কিন্তু আমি কেয়ার করিনে। বুঝলে?"

এই বলে সে চোখ মুছল ও চকিতে অদৃশ্য হলো।

জুলাই মাসের রাত। তখনো সূর্যের আলো রয়েছে। সুধী সোজা বাসায় না গিয়ে কেনসিংটন উদ্যানে কিছুকাল বায়ুসেবন করল।

এ এক নূতন সমস্যা। লণ্ডনে উজ্জয়িনীর মা নেই। বাদলও কোথায় ঘোরে, কোথায় খায়, কোথায় শোয় ঠিক নেই। উজ্জয়িনীর নিঃসঙ্গ জীবন সহনীয় হবে কী করে? কার সঙ্গে? স্বামীর ভার নিতে বলা কাগজে কলমে বেশ শোনায়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে ওর অর্থ কী? ও মেয়ে কি বাদলের অনুসরণে পথে পথে বিচরণ করবে, নদীর বাঁধে মাথা রাখবে?

সুধী নিজের উপর রাগ করল। কেন লিখেছিল স্বামীর ভার নিতে! এখন যদি সে বলে, "স্বামীর ভার নিতে চাই, কিন্তু কোথায় স্বামী? কে দিচ্ছে তাঁর ভার?" তখন কী উত্তর দেবে সুধী? কে নেবে সে মেয়ের দায়িত্ব? ললিতা রায় তো আমেরিকা চললেন, মিসেস গুপ্ত গেলেন সুইটজারলণ্ড। আর একটিও আত্মীয়া নেই, অভিভাবিকা

নেই লণ্ডনে। এক যদি মিসেস ঝাবওয়ালা একটু দেখাশোনা করেন। কিন্তু তাঁকে সে মানবে কি না সন্দেহ।

উজ্জয়িনীর যেমন জ্বর ছাড়ল সুধীর তেমনি জ্বর এলো। কী ভয়ঙ্কর দায়িত্ব যে তার ঘাড়ে এসে পড়ল! কী কুক্ষণে সে মুরুব্বিগিরি ফলিয়ে লিখেছিল স্বামীর ভার নিতে! উজ্জয়িনীর যদি ভালমন্দ কিছু হয় তবে জবাবদিহি করতে হবে তাকেই, কারণ সে-ই তো উজ্জয়িনীর আমেরিকা যাত্রায় বাধা দিয়েছে ওকথা লিখে। এখন কে কার ভার নিচ্ছে!

সুধীর সে রাত্রে ভালো ঘুম হলো না। সে স্থির করল মিসেস গুপ্তকে তার করবে। তিনি যদি রাজি হন তবে উজ্জয়িনীকে সুইটজারলণ্ডে পাঠিয়ে দেবে। কিন্তু তিনি যদি সাড়া না দেন? কিংবা রাজি না হন?

৩

সুধী যা আশঙ্কা করেছিল তাই হলো। মিসেস গুপ্ত সুধীর টেলিগ্রামের উত্তরে টেলিগ্রাম করলেন, "ওকে ওর স্বামীর কাছে পৌঁছিয়ে দাও।"

এই নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা কঠিন নয়, কারণ বাদল মাঝে মাঝে সুধীর সঙ্গে দেখা করতে আসে, তখন তার স্ত্রীকে তার হাতে গছিয়ে দেওয়া সম্ভব। কিন্তু বাদলও ওকে সাথে নেবে না, উজ্জয়িনীও বাদলের সাথী হবে না। যদি হয় তবে ভিখারী ও ভিখারিণী মিলে নদীর বাঁধে সংসার পাতবে। সে এক দৃশ্য!

অগত্যা সুধী আণ্ট এলেনরের শরণাপন্ন হলো। তিনি শুনে বললেন, "তুমি তো জানো, এই সময়টা আমরা লণ্ডনে থাকিনে, কারাভানে চড়ে

বেরিয়ে পড়ি। জিনীকে আমার ভালো লাগে, দলে টানতে ইচ্ছাও করে. কিন্তু নাবালিকার যিনি অভিভাবক বা অভিভাবিকা তাঁর অনুমতি চাই। তা ছাড়া জিনীর নিজের আগ্রহ আছে তো?"

সুধী উজ্জয়িনীকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলল, "তুমি যদি যাও তো আমিও যাই। একা ওদের সঙ্গে বনিবনা হবে না।"

তখন সুধী ব্রিজার্ডদের বাড়ী গেল। বৃদ্ধ বললেন, "জিনী যদি আমাদের সঙ্গে থাকতে আসে তো আমরা বিশেষ আনন্দিত হই। কিন্তু জানো তো? তোমার যেখানে নিমন্ত্রণ আমাদেরও সেইখানে। জিনী কি গ্রামে যেতে রাজি হবে?"

জিনীকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলল, "তুমি যদি যাও তো আমিও যাই। নতুবা—"

সুধী ভেবে দেখল যে এ ছাড়া অন্য কোনো কার্যকর উপায় নেই। হোটেলের চেয়ে ব্রিজার্ডদের বাড়ী নিরাপদ। বাদলকে যদি অভিভাবক বলে ধরে নেওয়া যায় তবে সে অতি স্বচ্ছন্দে অনুমতি দেবে। এখন কথা হচ্ছে, জিনী স্বয়ং সম্মত কি না?

"আমাকে কোথায় গিয়ে থাকতে বলছ, সুধীদা? ব্রিজার্ডদের বাড়ী? কিন্তু সে যে বহুদূর।" উজ্জয়িনী বলল।

"বহু দূর? কোনখান থেকে বহু দূর?"

"তোমার বাসা থেকে।"

"কিন্তু আমার সঙ্গে তোর এমন কী কাজ?" সুধীর স্বরে বিস্ময়।

উজ্জয়িনী কী বলতে যাচ্ছিল, ঠোঁট কাঁপল। তারপর সামলে নিয়ে বলল, "এই বিদেশে আমার আর কে আছে যে কার সঙ্গে দুটো কথা কইব! ব্রিজার্ডরা চমৎকার লোক, আমি সত্যি ভালোবাসি ওঁদের বাড়ী যেতে। কিন্তু দিনের পর দিন ওঁদের ওখানে থাকলে কি

আমি হাঁপিয়ে উঠব না, যদি না তোমার সঙ্গে দিনান্তে একবারটি দেখা হয়, ভাই সুধীদা ?"

সুধী মনে মনে স্বীকার করল যে দিনান্তে একবার দেখা হওয়ার পক্ষে আর্লস কোর্ট থেকে স্ট্রেথাম বহুদূর বটে। সুধীর অত সময় নেই। সে সপ্তাহে একবার দেখা করতে পারে, তার বেশী পারে না।

"কিন্তু হোটেল যে তোর মতো বালিকার পক্ষে নিরাপদ নয়। তুই ওখানে থাকলে যে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারিনে।"

এর উত্তর উজ্জয়িনীর জিবের ডগায় ছিল। "বেশ তো। হোটেলে থাকতে বলেছে কে ? আমি কি বলেছি যে আমি হোটেলে থাকব ? আমি চাই তোমার বাসায় একখানা ঘর। দু'খানা হলে একখানায় শুই, একখানায় বসি ও লেখাপড়া করি।"

সুধী বলল, "আমার বাসায় ঘর নেই। থাকলেও তোর অসুবিধা হতো। বুড়ীরা তোকে জ্বালাতন করত সময়ে অসময়ে মাথামাখি করে।"

"তা হলে," উজ্জয়িনী বলল, "তুমিও কেন ব্লিজার্ডদের ওখানে চল না ? আশা করি বুড়ীরা তোমাকে যাদু করেনি।"

"ব্লিজার্ডদের বাড়ী যে মিউজিয়াম থেকে অনেকটা দূরে। তা ছাড়া অমন অনুরোধ করলে ওঁদের ভদ্রতার সুযোগ নেওয়া হয়।"

"তা হলে," উজ্জয়িনী প্রস্তাব করল, "অন্য কোনো বাসা দেখ যেখানে তোমার ও আমার দু'জনের জায়গা হবে, যেখানকার ল্যাণ্ডলেডীরা মাথামাখি করবে না।"

সুধীর নিঃশ্বাস পড়ল না। বলে কী এ মেয়ে! সুধী ও উজ্জয়িনী অভিভাবকহীন ভাবে এক বাড়ীতে থাকলে কী মনে করবে সকলে !

সুধীকে নীরব দেখে উজ্জয়িনীই বলল, "চেষ্টা করিলে কেষ্টা ছাড়া কি ভৃত্য মেলে না আর ? তোমার যদি সময় না থাকে আমার সময় আছে, আমি কাল থেকে বাসার খোঁজ করব।"

"না।" সুধী শুধু বলল।

"না ? কেন, জানতে পারি ?"

"বালিকা হলেও তোর যথেষ্ট বুদ্ধি হয়েছে। তোর বোঝা উচিত দেশটা যদিও বিলেত তবু মাথার উপরে সমাজ রয়েছে, লোকনিন্দা আছে। তোর শ্বশুর যখন শুনবেন তখন কী মনে করবেন ?"

"সত্যি আমি বুঝতে পারছিনে, ভাই," উজ্জয়িনী আশ্চর্যান্বিত হলো, "কেন কেউ নিন্দা করবে। আমার শ্বশুর কাকে বলছ তুমি, আর তাঁর মনে করা না করায় কী আসে যায় !"

"তুই যেভাবে মানুষ হয়েছিস তোর পক্ষে কোন কাজের কী পরিণাম তা উপলব্ধি করা শক্ত। কিন্তু আমি তো বুঝি। আমার কর্তব্য তোকে বোঝানো।" এই বলে সুধী বিশদ করল, "সমাজের চোখে তুই বিবাহিতা মেয়ে, আমি তোর নিঃসম্পর্কীয় আলাপী। আমার যা কিছু অধিকার তা তোর স্বামীর অধিকারের অংশ। সেই অধিকার যদি তুই অস্বীকার করিস তবে আমার অধিকারও অন্তর্হিত হয়। তেমন অবস্থায় একত্র থাকা অনধিকারচর্চা। আর যদি তোর স্বামীর অধিকার তুই স্বীকার করিস তা হলে তোর শ্বশুরের অধিকারও স্বীকার করতে হয়। তিনি কিছুতেই আমাদের একত্র থাকা অনুমোদন করবেন না। যে দিক থেকেই দেখিস না কেন তোর প্রস্তাবটা অপরিণামদর্শী।"

উজ্জয়িনী চিন্তা করল।

"তা ছাড়া," সুধী বলল, "অপবাদও বিবেচনার বিষয়। এখানকার ভারতীয় সমাজটি ক্ষুদ্র নয়। আমাদের দেশবাসীরা যখন শুনবেন যে

আমরা এক বাসায় বাস করি তখন কি অত তলিয়ে দেখবেন? যা মনে করা অনুচিত তাই মনে করবেন কি না, তুই নিজে বল।"

উজ্জয়িনী জ্বলে উঠল। "কলঙ্ক কি আমার নামে এই প্রথম রটবে, যদি রটে! কে না জানে আমার পূর্ব ইতিহাস! তবে, হ্যাঁ, তোমার যদি কলঙ্ক রটে তবে সেটা হবে অন্যায়, অশিষ্ট ও অসহনীয়। তোমার শুভ্র নামে কালিমা লাগলে আমি আত্মহত্যা করব, সুধীদা।"

সুধী মুগ্ধ হলো। তার পরে ধীরে ধীরে বলল, "তবে তুই কাল রিজার্ডদের ওখানে যাচ্ছিস। কেমন?"

"অত দূর আমি যাব না," উজ্জয়িনীর কণ্ঠে রোদনের আভাস। "দূরে যাব বলে আমেরিকা গেলুম না, সুইটজারল্যাণ্ড যাচ্ছিনে। স্ট্রেথাম যাব!"

সুধী এমন সঙ্কটে পড়েনি। কী উপায়, ভেবে পাচ্ছিল না।

"আমি যাব না।" উজ্জয়িনী তার শেষ কথা শুনিয়ে দিল। তখনকার মতো ও প্রসঙ্গ স্থগিত রইল।

এর পরে যখন বাদলের সঙ্গে দেখা হলো সেই দেশলাই বিক্রেতাকে সুধী বলল, "ওহে ম্যাচ সেলার, যার সঙ্গে তোমার ম্যাচ হয়েছে তিনি হঠাৎ লণ্ডনে ফিরেছেন, তাঁর আমেরিকা যাওয়া হলো না।"

"কার কথা বলছ, সুধীদা?"

"উজ্জয়িনীর কথা। ওর জন্যে কী করা যায়, বলতে পারিস?"

সমস্ত শুনে বাদল বলল, "তুমিও যেমন! এক সঙ্গে বাসা করলে দোষ কী? বাস করলেই বা দোষ কী?"

সুধী হতভম্ব হলো স্বামীর উক্তি শুনে।

"নদীর বাঁকে," বাদল বর্ণনা করল, "কত রকম লোক কাছাকাছি শোয়, খবর রাখ? তাদের সবাই কিছু স্বামী স্ত্রী নয়।"

সুধী বলল, "তারা যে সর্বহারা। তারা তো সামাজিক মানুষ নয়।"

"সমাজ!" বাদল ফুৎকার করল। "সমাজ একটা বুজরুকি।"

"ও কথা শোভা পায় কেবল তোর মতো অবধূতের মুখে।"

"তা হলে তোমার শৌখীন সমস্যা নিয়ে তুমি বিভোর থাক। বুর্জোয়া ভাবুকদের ও ছাড়া অন্য কোনো ভাবনা নেই। ড্রইং রুম ট্র্যাজেডী, ড্রইং রুম কমেডী—বুর্জোয়াদের ঐ পর্যন্ত দৌড়।"

সুধী বাদলের কাছে বক্তৃতা শুনতে চায়নি। চেয়েছিল পরামর্শ। এবং প্রকারান্তরে অনুমতি। বাদলের সঙ্গে তার অন্যান্য কথা ছিল। বলল, "থাক, বুর্জোয়াদের ভাবনা বুর্জোয়াদের ভাবতে দে।"

"আচ্ছা, এক কাজ কর, সুধীদা। ফ্ল্যাট নাও আমার নামে। আর সেই ফ্ল্যাটে তোমারা দু'জনে থাক।" বাদল বলল অকপটে।

৪

সুধী বাদলের শাশুড়ীকে চিঠি লিখল যে বাদল বেদুইনের মতো ঘুরে বেড়ায়, তার রাতের ঠিকানা নদীর বাঁধ। উজ্জয়িনীকে ওর জিম্মা দেওয়া যায় না। ওকে আপনি স্বয়ং এসে স্নইটজারলণ্ডে নিয়ে যান।

তাঁর উত্তর এল কার্লসবাড থেকে। তিনি স্নইটজারলণ্ড থেকে চেকোস্লোভাকিয়ায় চলে গেছেন। লিখেছেন, এখানে আমি চিকিৎসাধীন আছি। উৎস জলে স্নান করছি। আমি তো ওকে আনতে যেতে পারিনে। তুমি যদি ওকে এখানে রেখে যেতে পার আমি কৃতজ্ঞ থাকব।

উজ্জয়িনীকে চিঠিখানা পড়তে দিয়ে সুধী বলল, "চল, তোকে কার্লসবাডে দিয়ে আসি।"

সে বলল, "না। তা হবে না।"

"কী হবে না?"

"তুমি যদি কথা দাও যে তুমিও কার্লসবাডে থাকবে তবেই আমি যাব। নয়ত যাব না।"

"বাঃ।" সুধী বলল, "তুই চেয়েছিলি বিদেশে দুটো কথা কইবার মানুষ। তোর মা কি সেই মানুষ নন?"

"হাসালে। মা'র সঙ্গে আমার কী সম্বন্ধ তা কি তুমি জানো না? জন্মের পর থেকেই তিনি আমাকে পর ভেবে এসেছেন। আমার বন্ধু ছিলেন আমার বাবা, আর শত্রু আমার মা।"

সুধী কিছু কিছু জানত। তবে উজ্জয়িনীর ওটা অতিরঞ্জিত অভিযোগ।

"তবে আমি তাঁকে কী লিখব? তোর কার্লসবাড না যাবার কারণটা তবে কী?"

"লিখো তোমার হাতে সময় নেই এখন। মাস তিন চার পরে যখন দেশে ফিরবে তখন আমাকে কার্লসবাড নিয়ে যাবে এবং সেখান থেকে দেশে।" বলতে বলতে উজ্জয়িনী রঙীন হয়ে উঠল।

সুধী বিরক্ত হয়ে বলল, "আমার হাতে সময় আছে কি না তুই কী করে জানলি? তুই কি আমাকে দিয়ে মিথ্যা কথা লেখাবি? ছি!"

"তবে তুমি যুধিষ্ঠিরের মতো সত্য কথাই লিখো। আমি কেয়ার করিনে মা'কে। বিয়ের পরে মা'র সঙ্গে মেয়ের কী সম্পর্ক।"

প্রত্যাবর্তনের পর উজ্জয়িনীর চেহারা যা হয়েছে তা দেখবার মতো। সুধী অবাক হয়ে ভাবে এই কি সেই লক্ষ্মী মেয়েটি? এ মেয়ে যেমন স্বাধীন, তেমনি সপ্রতিভ, তেমনি দুরন্ত। তা সত্ত্বেও আছে এর

কোনোখানে একটি অনির্দেশ্য মহিমা। উজ্জয়িনী নিজেকে সুলভ করে না, সে ইন্দ্রাণী।

"এবার আমি পাহাড়ে উঠেছি, হ্রদে সাঁতার কেটেছি, বাচ খেলেছি।" উজ্জয়িনী তার ভ্রমণকাহিনী বলে। "এবার আমি মাছ ধরেছি, ছবি এঁকেছি। স্কাই দ্বীপে প্রায় সত্তর জাতের বুনো ফুল তুলেছি। এবার আমি বাঁচতে শিখেছি, সুধীদা।"

রোজ সকালবেলা ঠিক সাড়ে আটটায় সুধীর ঘরের দরজায় টোকা পড়ে। সুধী জিজ্ঞাসা করে, "কে?"

"আমি উজ্জয়িনী।" এই বলে সে ঠেলে প্রবেশ করে, অনুমতির অপেক্ষা রাখে না। এখনো তোমার ব্রেকফাস্ট খাওয়া হয়নি? হায়, সুধীদা!"

সে বসে বসে সুধীকে খাওয়ায়। বলে, "তুমি মধু ভালোবাসো। না? সেইজন্যে তোমার ব্যবহার অত মধুর। আর আমি কী ভালোবাসি, শুনবে? গরম গরম সসেজ। সেইজন্যে আমি এমন বেপরোয়া।"

সুধীর ল্যাণ্ডলেডীদের তো সে পোকামাকড়ের মতো হেনস্তা করে। বলে, "আমি ইংরেজী ভালো বুঝিনে।" অঙ্গভঙ্গী করে ওদের ভাগায়।

মিউজিয়ামে যেই একটা বাজে উজ্জয়িনী এসে সুধীর ধ্যানভঙ্গ করে। "আমার ক্ষিদে পেয়েছে, তোমার পায়নি? চল, খেয়ে আসি!"

আগে আধ ঘণ্টায় সুধীর লাঞ্চ সারা হতো। ইদানীং উজ্জয়িনীর খাতিরে তার এক ঘণ্টা খরচ হয়। উজ্জয়িনা তাকে জোর করে খাওয়ায়। বলে, "যারা চায়ের সময় খায় না তাদের লাঞ্চ একটু ভারী হওয়া উচিত। তোমার ঐ হরলিকসের কর্ম নয়। পুডিং তোমায় খেতেই হবে। দাঁড়াও, তোমার জন্যে একটা নিরামিষ পুডিং নির্বাচন করি।"

হোটেলেই উজ্জয়িনীর স্থিতি হলো। সুধী অন্য কোনো উপায় খুঁজে পায়নি। তবে তার আশা আছে গ্রাম থেকে ফিরলে একটা উপায় মিলবে।

মার্সেলকে দেখতে সুধী রবিবারে যায়। উজ্জয়িনীও। মার্সেলের সঙ্গে তার বনে বেশ। আগেকার দিনে সুধী সাজত মার্সেলের ঘোড়া। সম্প্রতি উজ্জয়িনী সে ভার স্বেচ্ছায় নিয়েছে।

"তোমার সুজেৎটি কিন্তু মিটমিটে শয়তান।" সুধীকে বলে।

"কেন, বল তো?"

"তুমি টের পাও না, ও তোমার দিকে চুরি করে তাকায়।"

"তাতে কী?"

"তাতে কী!" উজ্জয়িনী বিরক্ত হয়। "ও কেন তোমার দিকে চুরি করে অতবার তাকাবে! ওর কী অধিকার আছে পরপুরুষকে লুকিয়ে দেখবার! ওর কি নিজের 'বয়' নেই?"

সুধী জানত সুজেতের একটি 'বয়' আছে। ওটা একটা প্রথা, সমাজের অনুমোদিত।

"যাক, তুই সুজেতের সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করিসনে। ওর মনটি বড় কোমল। কেঁদে মূর্চ্ছা যাবে।"

উজ্জয়িনী কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল, "তোমার বান্ধবীর সঙ্গে আমি রূঢ় ব্যবহার কবে করেছি, সুধীদা? মিটমিটে শয়তান বলেছি, তাও ওর অসাক্ষাতে। ভুল করেছি, লজ্জাবতী লতা বললে ঠিক হতো।"

"ঠিক তাই। সুজেৎ বড় লাজুক মেয়ে। বড় মুখচোরা।"

"তুমি যেমন ভাবে বলছ," উজ্জয়িনীর কণ্ঠস্বরে শ্লেষ, "তুমি ওকে ভালোবাসো।"

"ভালোবাসি বৈকি। সেইজন্যেই তো তোকে বলি, ওকে ভুল বুঝিসনে।"

"ওমা, কতজনের সঙ্গে তোমার প্রেম, সুধীদা! আমি তো জানতুম অশোকাই একমাত্র।"

সুধী গম্ভীর হলো। কিছু বলল না। উজ্জয়িনীও তার গাম্ভীর্য লক্ষ করে নীরব হলো।

একদিন ব্লিজার্ডদের ওখানে বেড়াতে যাবার প্রসঙ্গ উঠলে উজ্জয়িনী বলল, "দূর! সেদিন যে ঘটা করে বিদায় নিয়ে আমেরিকা রওনা হলুম, স্মৃতি উপহার নিলুম। ফিরে এসেছি দেখে ওঁরা কি টিপে টিপে হাসবেন না? আমার মাথা কাটা যাবে যে।"

"তা বটে।"

"এখন বুঝলে তো, কেন ওঁদের বাড়ী থাকতে রাজি হইনি?"

"বুঝেছি!" সুধী হাসল। মেয়েদের মন দার্শনিকেরও দুর্বোধ্য। কিন্তু গ্রামে যদি যাস ওঁদের সঙ্গে দেখা হবেই, কেননা শান্তিবাদীদের বৈঠকে ওঁরাও উপস্থিত থাকবেন।"

"ওহ্। শান্তিবাদীদের বৈঠক বুঝি! তাই বল।" উজ্জয়িনী গালে হাত রেখে বুড়ীর মতো বলল, "সত্যি কি শান্তি হবে জগতে?"

"জগদীশ জানেন। খুব সম্ভব হবে না, তবু যাঁরা তাঁর রুদ্র রূপ অবলোকন করেছে তারা তাঁর শান্ত রূপ ধ্যান করবে।"

'আমি ভাবছি তোমাদের বৈঠকে আমাকে মানাবে কী করে? আমি যে ধ্বংসবাদী।"

সুধীর মনে পড়ল উজ্জয়িনীর রিভলবার।

"তোর কি এখনো ঐ বিশ্বাস আছে?" সুধী সুধাল।

"নিশ্চয়। আমি কি একদিনও সুখী হয়েছি, না হতে পারি?

যতক্ষণ তোমার কাছে থাকি ততক্ষণ ভুলে থাকি, আবার যখন একা বোধ করি তখন রুখে উঠি।"

"কিন্তু আমার ধারণা ছিল," সুধী সস্নেহে বলল, "তোর ও রোগ সেরে গেছে।"

"আমারও ধারণা ছিল," উজ্জয়িনী সুমিষ্ট স্বরে বলল, "যাতে ও রোগ সেরেছিল তা সত্য। কিন্তু তুমিই বল, তা কি সত্য?"

"বুঝতে পারছিনে," সুধী মাথা নাড়ল, "তোর মনে কী আছে?"

"বলতে পারব না," উজ্জয়িনী রঙ্গ করে মাথা নাড়ল, "আমার মনে কী আছে। তুমি তো মনস্তত্ত্ব জানো। তুমি বুঝে নিয়ো।"

সুধী ভাবতে বসল। উজ্জয়িনী উঠে বলল, "যাই, আমার লজ্জা করছে। আমি তো তোমার সুজেতের মতো লজ্জাশীলা নই, তবে কেন আমার পালাতে ইচ্ছা করছে?"

৫

সুধীর চোখের সুমুখ থেকে হঠাৎ একটা পর্দা সরে গেল। তার স্মরণ হলো উজ্জয়িনীর আমেরিকা যাত্রার প্রাক্‌কালে সে তার বিচিত্র স্বপ্নের বিবরণ বলেছিল।

এক বছর আগে অশোকার সঙ্গে প্রথম আলাপের রাত্রে সুধী স্বপ্ন দেখেছিল—গায়ে গেরুয়া আলখাল্লা, হাতে একতারা, মাথার চুল কটা হয়ে জটায় পরিণত হতে চলেছে, উজ্জয়িনী কৌতূহলী জনতার দ্বারা বেষ্টিত হয়ে আপন মনে গান করছে। তার মুখে হাসি, চোখে জল। জনতাকে দুই হাতে ঠেলে সুধী এগিয়ে গেল। উজ্জয়িনীর সামনে দাঁড়িয়ে বলল, "উজ্জয়িনী, তুমি আমাকে তোমার বৈরাগ্য দান কর।"

উজ্জয়িনী সুধীর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে মৌন থাকল। তারপরে বলল, "সুধীদা, তোমার সম্ভবপর পত্নীকে বঞ্চিত করবার অধিকার তোমার নেই।" সুধী বলল, "বৈরাগ্য বহনের যোগ্যতা একমাত্র আমারি আছে, কারণ এই দ্যুলোক ভূলোকের অধিষ্ঠাত্রী প্রকৃতিদেবীর আমার মতো অনুরাগী আর নেই। উজ্জয়িনী, তোমার বৈরাগ্য আমাকে দান কর।" উজ্জয়িনী জানতে চাইল, "বিনিময়ে তুমি আমাকে কী দেবে ?" সুধী বলল, "আমি দেব তোমাকে কল্যাণী হবার দীক্ষা।" উজ্জয়িনী সুধীকে তার বৈরাগ্য দান করল। সুধীর কণ্ঠে এলো গান, হাতে এলো একতারা, গাত্রে এলো বহির্বাস।

এই স্বপ্নের বিবরণ শুনে উজ্জয়িনী যে কী ভেবেছিল কে জানে ? বলেছিল, "আবার যদি আমাদের দেখা হয়, যদি বেঁচে থাকি, তবে যে যা ভাবে ভাবুক, আমি তোমার সঙ্গে থাকব।"

সেদিন সুধী তাকে পাগল মনে করেছিল, কিন্তু সে সুধীকে শুনিয়ে দিয়েছিল, "পাগলী বলেই অমন কথা বলতে পারছি, অমন কাজ করতেও পারব। যাকে ভয় করি, ভক্তি করি, মনে মনে পূজা করি, সে যদি বিমুখ না হয় তবে আমি সুখী না হই, সার্থক হব।"

সুধী বুঝতে পারল উজ্জয়িনীর আচরণের মূলে রয়েছে সেই স্বপ্ন। স্বপ্নটাকে সে যে ভাবে নিয়েছে সে ভাবে নেওয়া ভুল। স্বপ্নের উজ্জয়িনীর সঙ্গে স্বপ্নের সুধী প্রেম বিনিময় করেনি, বৈরাগ্য বিনিময় করেছে। অনুরাগ ও বৈরাগ্য এক বস্তু নয়। কিন্তু উজ্জয়িনী সেইরূপ কিছু অনুমান করেছে।

"শোন, তোর সঙ্গে কথা আছে।"

"কী কথা, সুধীদা ?"

"তোর প্রত্যাবর্ত্তনের পর থেকে আমি কেমন যেন অস্বচ্ছন্দ বোধ

করছিলুম, কোথায় কী যেন বেসুরো বাজছিল। কাল যখন তুই উঠে পালিয়ে গেলি আমার মনে খটকা বাধল। তখন আমি হঠাৎ আবিষ্কার করলুম যে তুই আমার স্বপ্নের অর্থ ভুল বুঝে তোর নিজের জীবনে অনর্থ ডেকে এনেছিস।”

“কে ভুল বুঝেছে, সুধীদা? তুমি না আমি?”

সুধী তার দৃপ্ত ভঙ্গী দেখে ভয় পেয়ে বলল, “তুই—”

“ও স্বপ্নের ঐ একটি অর্থ। দ্বিতীয় অর্থ নেই। তবে তুমি যদি পিছু হটতে চাও আমার অমত নেই।”

“আমার স্বপ্ন। আমি যেমন ব্যাখ্যা করি তেমন ব্যাখ্যাই সঙ্গত।”

“স্বপ্নেই তোমার অধিকার, ব্যাখ্যায় নয়।”

“বাঃ। আমার স্বপ্ন। আমি বুঝিনে, তুই বুঝিস?”

“তুমি স্বপ্ন দেখেছ বলে তার মানেও বুঝেছ, এ কী অদ্ভুত দাবী! না, সুধীদা, তুমি আমাকে ভোলাতে পারবে না। আমি ঠিকই বুঝেছি।”

সুধী হাল ছেড়ে দিয়ে বলল, “তবে তুই কী বুঝেছিস, বল।”

“বুঝেছি—থাক, আমার লজ্জা করে।”

“তবে আমি যা বলি শোন।”

“না, তাও শুনব না।”

সুধী উত্ত্যক্ত হয়ে বলল, “বেশ, আমার মনে আর অস্বস্তি নেই। আমি আমার স্বপ্নের যে ব্যাখ্যা করি তাই সত্য।”

“মিথ্যা।” উজ্জয়িনী অম্লানবদনে বলল।

সুধী আহারে মনোনিবেশ করল। উজ্জয়িনী সুধীর রুটিতে মধু মাখাতে মাখাতে আড়চোখে তাকাতে থাকল। দুষ্টু হাসি হাসতে থাকলও। সুধীর খাওয়া শেষ হলে তার কানে কানে বলল, “এই!”

সুধী বলল, "কী?"

"মুখে মানুষ সত্যি কথা বলে না, স্বপ্নে বলে। স্বপ্নে যা বলেছ জাগ্রতে তার ভিন্ন ব্যাখ্যা কোরো না, করলে আমি মানব না। আমি বলব তোমার সামাজিক মন খোঁচা দিচ্ছে, তাই অমন ব্যাখ্যা।"

সুধী মিনতি করে বলল, "লক্ষ্মীটি, আমার কথা আগে শোন। তারপরে তোর যা খুশি মনে কর।"

"এবার তোমার গলায় ঠিক সুরটি বাজছে, কিন্তু তোমায় বেশি বকতে দিতে ভরসা হয় না, তা হলে তোমার স্বরভঙ্গ হবে।" উজ্জয়িনী শর্তাধীন অনুমতি দিল।

তখন সুধী গুছিয়ে বলল যে স্বপ্নের সুধী স্বপ্নের উজ্জয়িনীর সঙ্গে যে বিনিময় করেছিল তা বৈরাগ্য বিনিময়, যদি কেউ ভাবে সেটা অনুরাগ বিনিময় তবে ভুল ভাবে।

উজ্জয়িনী তা শুনে হেসে ঢলে পড়ল। ভাগ্যে ঘরের দরজা ভেজানো ছিল। কিন্তু কাঁচের জানালা তো খোলা।

"তোমার স্বপ্নের বিবরণ আমার স্পষ্ট মনে আছে, সুধীদা। স্বপ্নের সুধী বলেছিল, আমাকে তোমার বৈরাগ্য দান কর। ঠিক কি না?

"ঠিক।"

"স্বপ্নের উজ্জয়িনী জিজ্ঞাসা করেছিল, বিনিময়ে তুমি আমায় কী দেবে?"

"ঠিক।"

"উত্তরে স্বপ্নের সুধী বলেছিল, তোমাকে দেব অনুরাগের দীক্ষা।"

"না, না, কল্যাণী হবার দীক্ষা।"

উজ্জয়িনী সুধীর মুখে হাতচাপা দিয়ে বলল, "ওটুকু তোমার বানানো। স্বপ্নের উপর হস্তক্ষেপ করা তোমার মতো সুধীজনের পক্ষে অশোভন।"

"সত্যি। কল্যাণী হবার দীক্ষা।"

"মিথ্যা। অনুরাগিণীর হবার দীক্ষা।"

"তোর স্মরণশক্তি নির্ভরযোগ্য নয়, তুই তো মাত্র একটিবার শুনেছিস?"

"আর তুমি? তুমি তো মাত্র একটিবার স্বপ্ন দেখেছ।"

এ তর্কের মীমাংসা নেই। সুধী ক্ষান্তি দিল।

পথে চলতে চলতে উজ্জয়িনী বলল, "আচ্ছা, তোমার অত মন খারাপ করার কারণ তো দেখিনে। আমি তো বলছিনে যে তুমিও অনুরাগের দীক্ষা নিয়েছ। তুমি বৈরাগী। আমি অনুরাগিণী। এই আমাদের স্বপ্নের চুক্তি।"

সুধী বলল, "তা নয়, তা নয়।"

"উত্তম। তা স্বপ্নের চুক্তি নয়। কিন্তু বাস্তবের চুক্তি। আপত্তি আছে?"

এর পরে সুধী অসহযোগ করল। কথা কইল না।

দিন দুই পরে আবার ওকথা উঠল। উজ্জয়িনী বলল, "নিজের উপর তোমার অধিকার খাটে, কিন্তু আমার উপর তোমার কিসের অধিকার?"

"কিছুমাত্র না।"

"তা যদি হয়, তবে আমি যাকে খুশি ভালোবাসব। তোমার তাতে কী?"

"ব্যক্তি হিসাবে আমার কিছু বলবার নেই, কিন্তু সামাজিক মানুষ

হিসাবে নীতির দিক থেকে বিচার করবার আছে। তা ছাড়া বন্ধু হিসাবে তোকে সাবধান করে দেওয়া আমার কর্তব্য।"

"বন্ধু হিসাবে!" উজ্জয়িনী হাসল। "তুমি তো আমার বন্ধু নও। আর একজনের বন্ধু। তাঁর অধিকার আমি অস্বীকার করি, সুতরাং তোমার বন্ধুতাও।"

সুধী বেকায়দায় পড়ল, সহসা মুখের মতো জবাব খুঁজে পেলো না।

"আর সামাজিক মানুষের বিচারকার্যেরও স্থানকাল আছে। জগতের যত বিবাহিত মেয়ে স্বামী ব্যতীত অপরের অনুরাগিণী হয়েছে তুমি কি তাদের সকলের বিচারক নাকি?"

"কিন্তু তা বলে যা আমার প্রত্যক্ষগোচর তার দোষগুণ বিচার করব না?"

উজ্জয়িনী বলল, "করতে চাও কর। আমি তো জানি যে আমি যা করছি তা পাপ নয়—সত্যিকার ভালোবাসা কখনো পাপ হতে পারে না। আমি প্রতিদানও চাইনে, প্রত্যাখ্যানও গায়ে মাখিনে। এই নেশা যত দিন থাকবে তত দিন আমি ছায়ার মতো অনুগতা হব, যেদিন ফুরোবে সেদিন—আত্মহত্যা।"

৬

একদিন উজ্জয়িনীর সাক্ষাতে বাদলকে সুধী বলেছিল, "তোর সঙ্গে আমার বন্ধুতা যেমন নিবিড় উজ্জয়িনীর সঙ্গেও তেমনি। তোদের বিয়ে দেবার সময় আমার এই কল্পনা ছিল যে আমরা তিনটি বন্ধু একাত্ম হব। আমরা হব এক বৃন্তে তিনটি ফুল, তিনে এক, একে তিন। আমার সেই কল্পনা আজো সতেজ রয়েছে।"

উজ্জয়িনী সুধীকে স্মরণ করাল সেদিনকার সেই উক্তি। বলল, "কই সেদিন তো তুমি আমাকে বাদলের স্ত্রী হিসাবে দেখনি? স্বতন্ত্র বন্ধু হিসাবেই দেখেছ। আমরা তিনজনে এক বৃন্তে তিনটি ফুল। তিনে এক, একে তিন। কেমন, বলেছিলে কি না এ কথা?"

"বলেছিলুম।"

"যখন বলেছিলে তখন অবশ্য এমন আভাস দাওনি যে বাদল যদি অন্য কাউকে বিয়ে করত সেও তোমার সঙ্গে একাত্ম হতো। আমি যত দূর বুঝি, আমাকেই তুমি সেই সৌভাগ্য দিয়েছ, অন্য কোনো মেয়ে তোমার বন্ধুপত্নী হলে তাকে তা দিতে না। কেমন, দিতে?"

"না।"

"তা হলে, নীতিবিদ্! তোমার মুখে কত রকম উল্টোপাল্টা কথা শুনতে হবে! একদিন বলবে, আমি তোমার সঙ্গে একাত্ম। আর একদিন বললে, আমি তোমার কেউ নই, আমার স্বামী তোমার বন্ধু বলেই আমার সঙ্গে তোমার যা কিছু সম্পর্ক। আবার বলছ কিনা আমার বন্ধু হিসাবে তোমার কর্তব্য আমাকে সাবধান করে দেওয়া। কোনটা সত্য?"

সুধী উজ্জয়িনীর স্মরণশক্তির দাপটে নাজেহাল হয়ে বলল, "সব ক'টাই সত্য। বাদল এবং তুই দু'জনেই আমার প্রিয়, তোদের মতো প্রিয় আমার কেউ নেই, অশোকাও না, মার্সেলও না। তোদের দু'জনের সঙ্গে আমি একাত্ম, তার সঙ্গেও, তোর সঙ্গেও। তুই তার স্ত্রী বলেও বটে, স্ত্রী না হলেও বটে। যে দিন তোর নাম প্রথম শুনি সেদিন নাম শুনেই চিনতে পারি যে তুই আমাদের একজন।" বলতে বলতে সুধীর স্বর গভীর হলো।

উজ্জয়িনী নিবিষ্ট হয়ে শুনছিল। বলল, "তবে?"

"তবে কী? কেন তুই ভুলে যাচ্ছিস যে বাদলকে বাদ দিলে আমাদের ত্রয়ী ভেঙে যায়, আমরা ছিন্নবিছিন্ন হয়ে পড়ি? বাদল না থাকলে আমাদের বৃন্তে তুইও থাকিসনে, আমিও থাকিনে। তিনজনেই বৃন্তচ্যুত হয়ে ভূতলে লুটিয়ে পড়ি।"

উজ্জয়িনী বলল, "তা হলে স্বপ্নে কেন বাদল ছিল না?"

"পরোক্ষে ছিল। ঐ যে আমি তোকে কল্যাণী হবার দীক্ষা দিলুম তার মানে গৃহিণী হবার দীক্ষা। কার গৃহিণী? বৈরাগীর নয় নিশ্চয়ই। বাদলের।"

উজ্জয়িনী হেসে উঠল। "ও দিকে বাদলও যে বৈরাগী হয়ে উঠল। একবার দেখতে যেতে হচ্ছে নদীর বাঁধে। কিন্তু ঘরকন্না করতে নয়। আমি ওর গৃহিণী হতে নারাজ।"

ইতিমধ্যে সে বাদল সম্বন্ধে "তিনি" ছেড়ে "সে" বলতে অভ্যস্ত হয়েছিল। "বাদলবাবু" কিংবা "মিস্টার" সেন ছেড়ে "বাদল" বলত।

একদিন সন্ধ্যাবেলা তারা বাদলকে দেখতে নদীর বাঁধে যাবে স্থির হলো।

"তা বলে তুমি মনে কোরো না যে ওর বিরুদ্ধে আমার বিন্দুমাত্র ক্ষোভ আছে। ওর যদি কোনো কমরেড থাকে তবে আমি একটুও দুঃখিত হব না, বরং প্রীত হব। এই কয়েক সপ্তাহে আমি আত্মস্থ হয়েছি, সুধীদা।"

"আত্মস্থ হওয়া ভালো," সুধী মন্তব্য করল, "কিন্তু পরের পদস্খলন প্রার্থনা করা ভালো নয়। ওটা নীচতা।"

উজ্জয়িনী যেন মার খেয়ে চমকে উঠল। ফ্যাকাশে মুখ দুই হাতে ঢেকে বলল, "আমি অমন প্রার্থনা করিনি কোনো দিন। কেন করব? যা হয়ে রয়েছে তাই যথেষ্ট নয় কি?"

"কিছুই হয়নি। মিথ্যা খবর।" সুধী প্রত্যয়ের সহিত বলল। "বাদলকে আমি চিনিনে? সে খাঁটি সোনা।"

"আমি বিশ্বাস করিনে।" উজ্জয়িনী উদাস কণ্ঠে বলল।

"আমি বিশ্বাস করি।"

"তোমার কথা হয়তো সত্য। কিন্তু কী আসে যায়? আমি তো ওকে দোষ দিচ্ছি নে। আমার প্রয়োজন ডিভোর্স, সে জন্যে যেটুকু প্রমাণ করা আবশ্যক সেটুকুর বেশি জানতেও চাইনে।"

সুধী উষ্ণ হয়ে বলল, "কার প্রয়োজন ডিভোর্স? তোর? কেন?"

"প্রয়োজন হলেও হতে পারে একদিন, এখন নয়।"

"ডিভোর্স প্রয়োজন হয় তাদের যারা পুনরায় বিবাহ করতে চায়। তোর কি তেমন ইচ্ছা আছে?"

"কেন থাকবে না, সুধীদা? আপাতত নেই। কিন্তু জীবন দীর্ঘ।"

"যদি দ্বিতীয় জনের সঙ্গে সামঞ্জস্য না হয় তা হলে কি আবার ডিভোর্স ঘটবে?"

"কে জানে! অত চুল চেরা তর্ক করে ফল কী! যা হবার তা হবে। আমি তো তোমার মতো জীবনশিল্পী নই যে জীবনটাকে ছাঁচে ঢালাই করব!"

সুধী বলল, "ছাঁচে ঢালাই করা আমারও অভিপ্রায় নয়। কিন্তু আমার নিজের একটি ডিজাইন আছে। আমি চাই বাগানের মতো সাজানো জীবন। যাকে বলে ড্রিফট্—স্রোতে গা ভাসানো—তা আমার নয়।"

"আমি কিন্তু তাই পছন্দ করি। জীবন একটা স্রোতই বটে। আর স্রোতে গা ভাসানোর মতো আরামও নেই।"

সুধীর সংস্কার বিদ্রোহী। কিন্তু উজ্জয়িনী কি সহজ মেয়ে!

"আমাকে মাফ কর, ভাই সুধীদা। আমি জানি তোমার মনে লাগে, কিন্তু কী করব! আমি তোমার মানসী নারী নই। আমি মানবী। বাদলকে একদা আমি প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছি, কার্পণ্য করিনি। সে ভালোবাসা আজ নেই, এ কি আমার অপরাধ! এখন যাকে ভালোবাসি তাকে কোনো দিন ভালোবাসতে চাইনি, কিন্তু ঘটনাচক্রে সেই আমার প্রিয়। এ কি আমার অপরাধ! আমার এইটুকু জীবনে আমি অনেক আঘাত পেয়েছি, যাতে নতুন আঘাত না পেতে হয় সেইজন্যে আমি প্রতিদানের প্রত্যাশাও ছেড়েছি। আছে কেবল একটি দুর্বলতা—একটুখানি সঙ্গতৃষা। দেশে ফিরলে সঙ্গ পাব না জানি। সেইজন্যে এখনই যা পাই নিতে চাই। এ কি আমার অপরাধ!"

বাস্তবিক মেয়েটি অসামান্য দুঃখিনী। বাপ নেই, মা না থাকার সামিল। স্বামী পরিত্যাগ করেছে। কে আছে তার, কার কাছে দাঁড়াবে! সুধী স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলল, "আমি তোর কীই বা করতে পারি! তোর জীবন যদি হয় স্রোত তবে আমি স্রোতের কুটো। আমাকে আঁকড়ে ধরে তুই নিজেও ডুববি, আমাকেও ডোবাবি। তোর কিছুমাত্র তৃপ্তি হবে না, অথচ আমার মুখ দেখানো দায় হবে।"

উজ্জয়িনী বলল, "যা বলেছ সব সত্যি। আমিও ভাবি যে তোমার সুনাম নষ্ট হলে আমারি মনে কষ্ট হবে সব চেয়ে বেশি। আমরা যে একাত্ম।"

সুধী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। বাদল হলে বলত, বুর্জোয়া সমস্যা। ড্রইং রুম ট্র্যাজেডী। মার্কসীয় দৃষ্টিতে ওর বাস্তবতা নেই। ফিউডাল যুগের জের। কিন্তু সুধীর কাছে এটা সত্যিকার ট্র্যাজেডী। কোনো যুগেই এর কোনো সমাধান নেই।

"আঙ্কল আর্থার ও আণ্ট এলেনরকে দেখেছিস। ভাই বোন। একজনের বিয়ে হলো না বলে অপর জন বিয়ে করেননি।"

"শুনেছি।"

"আমরাও তাঁদেরি মতো চিরজীবন কাটাব। তবে একসঙ্গে নয়।"

"কিন্তু একসঙ্গে না থাকতে পেলে ওঁরা কি ওভাবে জীবন কাটাতে পারতেন!"

"আমাদের সাধনা আরো কঠিন, উজ্জয়িনী।"

উজ্জয়িনী চিন্তা করে বলল, "চিরজীবনের বিলি ব্যবস্থা এখন থেকে না করাই ভালো। আপাতত যে ক'মাস পারি একসঙ্গে থাকব। তার পরে যা হবার তা হবে। দেশে ফিরে গিয়ে যদি দেখি যে আন্দোলন হচ্ছে তবে ঝাঁপিয়ে পড়ব। হয়তো জেল, হয়তো মৃত্যু। যদি বেঁচে থাকি, যদি জেল থেকে মুক্তি পাই তখন হয়তো দেখব যে দেশের আবহাওয়া বদলে গেছে, তোমার সঙ্গে আমার থাকা দৃষ্টিকটু বোধ হচ্ছে না।"

"পাগলী!" সুধী করুণ হাসল।

"পাগলরাই সমাজকে ঘা দিয়ে সিধে করে, কাজেই পাগল বলে অনুকম্পা কোরো না। একদিন তোমার সমাজ আমাকে মেনে নেবেই নেবে।"

৭

উজ্জয়িনীর প্রত্যাবর্তনের খবর ঢাকা রইল না, তার পরিচিত পরিচিতাদের কানে উঠল। বুলুর দল ইতিমধ্যে গ্রীষ্মের বন্ধে লণ্ডনের বাইরে ছিটকে পড়েছিল। অর্থাভাবে দে সরকার ছিল লণ্ডনে ম্রিয়মাণ ভাবে। খবরটা শুনে তার ধড়ে প্রাণ এলো।

কিন্তু সে সুধীকে বেশ একটু ভয় করত। সুধীর কাছে ধরা পড়ার সাহস তার ছিল না। সে সন্ধান নিয়ে দেখল যে সুধী সারাদিন পাহারা দেয়; সন্ধ্যাবেলাও সুধী আসে উজ্জয়িনীর হোটেলে। সুধীকে এড়িয়ে উজ্জয়িনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হলে, হয় সকাল আটটার আগে, নয় সন্ধ্যা সাড়ে আটটার পরে, হোটেলে হাজির হতে হয়।

দে সরকার একদিন সন্ধ্যাবেলা উজ্জয়িনীর হোটেলের রাস্তায় গা ঢাকা দিল। যখন দেখল সুধী চলে যাচ্ছে তখন হোটেলে ঢুকে কার্ড পাঠাল উজ্জয়িনীর উদ্দেশে।

"ওহ্! আপনি! মিস্টার দে সরকার! আসুন, আসুন।" উজ্জয়িনী হাসি মুখে অভ্যর্থনা করল। "আপনার কি বিশেষ আপত্তি আছে আমার সঙ্গে সাপার খেতে?"

দে সরকারের বিশেষ আপত্তি কেন, আদৌ আপত্তি ছিল না। তবু লোক-দেখানো "থাক, আমি কেন," "আমার কি এত সৌভাগ্য" ইত্যাদি উক্তি উচ্চারিত হলো তার মুখে।

"সুধীদা এইমাত্র গেলেন। যদি দু'মিনিট আগে আসতেন তা'হলে তাঁর সঙ্গে দেখা হতো। কতো খুশি হতেন!" উজ্জয়িনী বলল।

কে খুশি হতেন—সুধীদা, না দে সরকার? বোধ হয় দুজনেই। দে সরকার মুচকি হাসল।

"হাঁ, খুশি হবার কথাই বটে। কিন্তু আমার দস্তুর জানেন তো? সব সময় লেট! ঐ দু' মিনিটের জন্যে আমি কত বার গাড়ি ফেল করেছি।"

"তারপর? আপনি আটলান্টিকের ওপার থেকে ফিরলেন। কী আনলেন আমাদের জন্যে?" দে সরকার জমিয়ে বসল।

উজ্জয়িনী তাকে ঝাবওয়ালাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। দে

সরকার মিশুক লোক। কাকে কী বলতে হয় জানে। "আপনারা তো মালাবার হিলের ঝাবওয়ালা, সেই প্রসিদ্ধ ক্রোড়পতি—"

তাঁরা অবশ্য প্রতিবাদ করলেন, কিন্তু আপ্যায়িত হলেনও। দে সরকার যখন তার হাতীর দাঁতের সিগারেট কেস খুলে ধরল তখন ঝাবওয়ালার মনে পড়ল, "আপনারা কি সার এন. এন. সরকারের—"

"না, না, তাঁরা হলেন শুধু সরকার। আর আমরা দে সরকার। ফরাসীতে যাকে বলে, দ্য সারকার। চন্দননগরে ফরাসী গবর্নমেণ্ট আছে, নিশ্চয় জানেন। আমরা সেই ফরাসী আমলের জমিদার।"

ঝাবওয়ালা দম্পতি দে সরকারকে ধরে নিয়ে তাঁদের ঘরে বসালেন, উজ্জয়িনীকেও। পার্শীদের পানপ্রিয়তা সুবিদিত। দে সরকার বহু কাল পরে একটু শেরী আস্বাদন করল। উজ্জয়িনী কিন্তু পানীয় স্পর্শ করল না। পাছে সুধী টের পায়। ইতিমধ্যে সে আমিষ বাদ দিতে আরম্ভ করেছিল সুধীর অনুসরণে।

"আমেরিকার ছোঁয়াচ লেগে আপনিও দেখছি বর্জনশীল হলেন।" দে সরকার টিপ্পনী কাটল। "ওখানে কি সত্যি কেউ পান করে না?"

"আমি তো আমেরিকা যাইনি। স্কটলণ্ডে, স্কাই দ্বীপে ও লেক ডিসট্রিক্টে বেড়িয়ে ফিরলুম।"

"আই সী।" দে সরকার মাথা দুলিয়ে বলল, 'এখন বুঝেছি। মিসের গুপ্তর সেই অর্থনাশের পরে আমেরিকা যাওয়া প্রশ্নের বাইরে। আপনি শুনে বিশ্বাস করবেন কি না জানিনে, আমারও ইচ্ছা ছিল আমেরিকা যেতে। কিন্তু শুধু যেতে আসতে যত খরচ লাগে সেই খরচে ইউরোপ ঘুরে আশা যায়। আমি ইউরোপ না দেখে কোথাও নড়ছিনে। চলুন না, নরওয়ে সুইডেন ডেনমার্ক পরিক্রমা করি।"

উজ্জয়িনীর রুচিও ছিল, রসদও ছিল। কিন্তু সুধীদা যদি না যায়

তবে তারও যাওয়া হবে না। বলল, "অনেক ঘুরে শ্রান্ত এখন প্রাণ। কিছুদিন বিশ্রাম করি আগে।"

এর পরে দে সরকার অন্য প্রসঙ্গ তুলল। 'আপনি কি রাত্রে কোথাও বেরোন না? থিয়েটারে? সিনেমায়?"

উজ্জয়িনীর স্পৃহা ছিল, কিন্তু সুধীদার সময় হয় না। অন্যের সঙ্গে সে যাবে না। বলল, "আমি ক্লান্ত, মিস্টার দে সরকার। শান্তির জন্যে কিছুদিন গ্রামে বাস করব ভাবছি। শহর আমার সহ্য হচ্ছে না।"

দে সরকার ঠেকে শিখেছিল যে বেশি বলতে নেই, হাতে রেখে বলতে হয়। তার সম্বর্দ্ধনা পুরাতন হবার পূর্বেই সে বিদায় নিল। বলল, "আর একদিন আসব। আজ উঠি।"

ঝাবওয়ালারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাকে ডিনারের নিমন্ত্রণ করলেন। কিন্তু সে সময় সুধী থাকে। সম্মুখ সমরে দে সরকারের অনভিরুচি। সে বলল, "ডিনারের চেয়ে সাপার ভালো। ওসব ফর্মালিটি আমি ভালোবাসিনে। সেই দুপ্লে'র আমল থেকে আমাদের বাড়ি কেউ ডিনার জ্যাকেট পরে না। দেশেও আমরা রাত দশটায় খাই।"

এই বলে সে ফরাসীতে শুভরাত্রি জানাল।

পরদিন উজ্জয়িনী জিজ্ঞাসা করল সুধীকে, "আচ্ছা, দে সরকার কি ফরাসী আমলের নাম?"

"কিসে ও কথা উঠল?" সুধী বিস্মিত হলো।

উজ্জয়িনী গত রাত্রের ঘটনা বলল। তা শুনে সুধী কোনো উত্তর দিল না। দে সরকারের হাত থেকে উজ্জয়িনীকে রক্ষা করা কর্তব্য, কিন্তু এবার ওটার অপব্যাখ্যা হতে পারে। নিন্দুকরা বলতে পারে যেই রক্ষক সেই ভক্ষক। দে সরকার সন্ধানী লোক, সেই হয়তো অমন অপবাদ রটাবে। সুধী নিঃশব্দে শুনল ও শুনে নিঃশব্দ থাকল।

যেদিন সাপারের নিমন্ত্রণ সেদিন কথায় কথায় উজ্জয়িনী বলল, "তুমি যেয়ো না, একটু সবুর কর। আজ দে সরকার আসবেন।"

"দে সরকার!" সুধী জিজ্ঞাসু ভাবে তাকাল।

"ঝাবওয়ালাদের নিমন্ত্রণ আছে। তাঁরা তোমাকে ডাকেন না, কিন্তু দে সরকারকে ডাকতে ব্যগ্র। তা তোমাকে যখন ডাকেননি তুমি থেকো না, কিন্তু দে সরকারের সঙ্গে দেখা করতে চাও তো পাঁচ মিনিট দাঁড়াও।"

সুধী অপেক্ষা করল। দে সরকারের সঙ্গে তার কথা ছিল।

"হ্যালো, হ্যালো, এ যে সাক্ষাৎ চক্রবর্তী।" দে সরকার সুধীর হাতে ঝাঁকানি দিল।

"কেমন আছ? ভালো তো?" সুধী কুশল প্রশ্ন করল।

এদিক ওদিক দু'চারটে কথার পর সুধী বলল, "আমার দেরী হয়ে গেছে, আমি আসি। তুমিও আমার সঙ্গে খানিক দূর এস, কথা আছে।"

দে সরকার বলির পাঁঠার মতো কাঁপতে কাঁপতে চলল।

সুধী বলল, "ওকে কোথাও নিয়ে যেতে পারবে না, রাত জাগাবে না, পান করতে বলবে না। এই তিন শর্তে তুমি ওর সঙ্গে যত খুশি মিশতে পার, দে সরকার। কিন্তু এর একটি শর্ত লঙ্ঘন করলে ওর কাছে তুমি সম্পূর্ণ অপরিচিতের মতো ব্যবহার পাবে, আমার কাছেও।"

দে সরকার উচ্ছ্বসিত স্বরে বলল, "আমাকে তুমি বাঁচালে, চক্রবর্তী। আমি শুধু চোখের চাতক। দেখব আর চলে যাব। তুমি আমার পুরাকাহিনী শুনেছ, আমাকে বিশ্বাস করবে না, জানি। তবু বলি আমার কোনো হীন অভিসন্ধি নেই।"

সুধী তার হাতে চাপ দিয়ে বলল, "আমি বিশ্বাস করব, যতদিন না তুমি বিশ্বাসভঙ্গ কর।"

"বিশ্বাসভঙ্গ!" দে সরকার উত্তেজিত স্বরে বলল, "অসম্ভব, ভাই চক্রবর্তী। আমি মিথ্যা বলতে পারি, চাল দিতে পারি, কিন্তু জীবনে কারো কোনো অনিষ্ট করিনি। যা করেছি তা অপরের অভীষ্ট ছিল।"

সুধী বলল, "যাও, ওঁরা তোমার জন্যে প্রতীক্ষা করেছেন। তুমি ওকে কী চোখে দেখেছ তা আমি জানি। কিন্তু ভাই, তোমার স্বভাবে যে অসংযম আছে তাও তো আমার অজানা নয়। ভরসা করি তোমার অন্তরের সুরাসুরের দ্বন্দ্বে দেবতারই জয় হবে। আর যদি দানব জয়ী হয় তবে মনে রেখো—আমার হাতেই শেষ তাস।"

দে সরকার বলল, "শেষ পর্য্যন্ত তুমিই জিতবে। আমার আশা নেই।"

৮

এর পরে একদিন দে সরকার উজ্জয়িনীর হাতে একখণ্ড বাঁধানো পত্রিকা দিয়ে বলল, "বাংলা বই পড়তে চেয়েছিলেন, লণ্ডনে কার কাছে হাত পাতি? আমার কাছে ছিল আমারই প্রাচীন কীর্তি, দুষ্কৃতিও বলতে পারি। কনীনিকা এর নাম।"

উজ্জয়িনী নাড়াচাড়া করে বলল, "বাঃ। আপনার লেখা দেখছি যে। আপনি যে বাংলায় লেখেন তা তো জানতুম না।"

"লিখি না। লিখতুম।" দে সরকার খিন্ন স্বরে বলল, "সেই যে আছে, 'Creatures that once were men', আমি তেমনি একদা ছিলুম লেখক, এখন অপদার্থ।"

"না, না, অপদার্থ কেন হবেন ? আপনি যেমন তাস খেলেন ক'জন তেমন পারে ? আপনার মতো নাচতে জানে ক'জন ? আচ্ছা, আমি পড়ে দেখব। ধন্যবাদ।"

দে সরকার জীবনে এতবড় প্রশংসা পায়নি। দু'হাত মাথায় ঠেকিয়ে নমস্কার করল !

সে তার পত্রিকার কথা ভুলেই গেছল, উজ্জয়িনী কয়েক দিন পরে মনে করিয়ে দিল। "আপনার লেখা আর আছে, মিস্টার দে সরকার ? আপনার লেখার প্রত্যেকটি লাইন যেন আমারই মনের কথা। অথচ যখন লিখেছিলেন তখন তো আমাকে চিনতেন না, তখন আমার মনের কথাও অন্য রকম ছিল।"

দে সরকার অভিভূত হয়ে শুনছিল। আরো অভিভূত হলো যখন শুনল, "আশ্চর্য ! আপনি কি যাদুকর !"

দে সরকার কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে তার পর বলল, "আমার লেখনী ধারণ সার্থক। তখন কি জানতুম যে একদিন এই পুরস্কার আমার ভাগ্যে জুটবে। জানলে কি আমি আরো লিখতুম না ! আপনার জন্যে আরো কোথায় পাব—কোথায় পাব !" বলতে বলতে তার নয়নে হতাশার ভাব ফুটে উঠল।

"সত্যি। আপনার এমন ক্ষমতা থাকতে কেন আপনি লেখা বন্ধ করে দিলেন ? কেন তাস খেলে সময় নষ্ট করেন ? আমি হলে দিনরাত লিখতুম, নিজেকে চাবুক মেরে লেখাতুম। কিন্তু আমার তো সে ক্ষমতা নেই। কোন ক্ষমতাই বা আছে ! আমি হলুম সত্যিকার অপদার্থ।"

"ও কী বলছেন !" দে সরকার গদ গদ ভাবে বলল "আপনি অপদার্থ ! আপনি—আপনি—" কী বলতে কী বলে বসল বাচাল,

শুনে উজ্জয়িনীর কর্ণমূল রক্তিম হয়ে উঠল। দে সরকার আবৃত্তি করল—

"ঢাকো ঢাকো মুখ টানিয়া বসন, আমি কবি সুরদাস
দেবী, আসিয়াছি ভিক্ষা মাগিতে, পূরাতে হইবে আশ।
অতি অসহন বহ্নিদহন মর্ম মাঝারে করি যে বহন
কলঙ্ক রাহু প্রতি পলে পলে জীবন করিছে গ্রাস।
পবিত্র তুমি, নির্মল তুমি, তুমি দেবী, তুমি সতী
কুৎসিত দীন অধম পামর পঙ্কিল আমি অতি।
তোমারে কহিব লজ্জাকাহিনী লজ্জা নাহিকো তায়
তোমার আভায় মলিন লজ্জা পলকে মিলায়ে যায়!…"

দে সরকারের আবৃত্তি বনমর্মরের মতো কখনো অস্ফুট কখনো অনুচ্চ হয়ে জুলাই মাসের সেই বিলম্বিত গোধূলি লগ্নে উজ্জয়িনীর কর্ণে সুধাবর্ষণ করতে থাকল।

"আকাশ আমারে আকুলিয়া ধরে ফুল মোরে ঘিরি বসে
কেমনে না জানি জ্যোৎস্নাপ্রবাহ সর্বশরীরে পশে।
ভুবন হইতে বাহিরিয়া আসে ভুবনমোহিনী মায়া
যৌবনভরা বহুপাশে তার বেষ্টন করে কায়া।"

এইখানে দে সরকার একটু বিশ্রাম নিল। উজ্জয়িনীর দিকে এতক্ষণ তাকায়নি, চোখ মেলে দেখল তার চোখ ছল ছল করছে।

উজ্জয়িনী আবেগপূর্ণ স্বরে অতি কষ্টে বলল, "শেষ ?"

দে সরকার ঘাড় নাড়ল। আবৃত্তি করে চলল বিহ্বলভাবে। তারও চেতনা ছিল না যে এটা হোটেল এবং পার্শ্ববর্তী ঝাবওয়ালা দম্পতি বাংলা বোঝেন না।

যখন সমাপ্ত হলো ঝাবওয়ালা প্রথম নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন।

"এখন ইংরাজীতে ওর তাৎপর্য বুঝিয়ে দিন আমাদের। ও কি আপনার লেখা?"

দে সরকার আবেশের ঘোরে বলল, "টেগোরের।" বুঝিয়ে দিতে কিছুমাত্র উদ্যোগ দেখাল না, চোখ বুজে বসে রইল। তার ভয় করছিল, পাছে উজ্জয়িনীর সঙ্গে চোখাচোখি হয়, পাছে উজ্জয়িনীর দৃষ্টি তিরস্কার করে।

সে রাত্রে উজ্জয়িনী কিংবা দে সরকার কারো ঘুম হলো না। পরদিন দে সরকার হাজিরা দিল না।

"সুধীদা," উজ্জয়িনী জেদ ধরল, "চল, গ্রামে যাই। আমার মন লাগছে না এখানে।"

"যাঁরা নিমন্ত্রণ করেছেন তাঁরা প্রস্তুত না হলে যাই কী করে? কনফারেন্সের দেরি আছে।"

"গ্রামে কি হোটেল কিংবা বোর্ডিং হাউস নেই যেখানে গিয়ে উঠতে পারি? পরের অতিথি হবার অপেক্ষায় এই চমৎকার দিনগুলি লণ্ডনের মতো একটা ধোঁয়াটে শহরে অপচয় করতে থাকব আমরা?"

সুধী বিবেচনা করতে সময় নিল।

দে সরকার চিঠি লিখে জানতে চাইল, উজ্জয়িনী রাগ করেছে কিনা। সে কি আসতে পারে দেখা করতে?

উজ্জয়িনী লিখল, রাগ করা দূরে থাক বাংলা কবিতার মনোজ্ঞ আবৃত্তি শুনে সে মুগ্ধ হয়েছে। আরো আবৃত্তির প্রত্যাশা রাখে।

এবার দে সরকার আবৃত্তি করল ইংরেজী থেকে। শেলীর কবিতা।

"O Wild West Wind, thou breath of Autumn's being
Thou from whose unseen presence ......"

পরিচিত কবিতা। ঝাবওয়ালা সমস্তক্ষণ হাত তুলে ও নামিয়ে,

দুলিয়ে ও ছড়িয়ে মূকাভিনয় করলেন। পরিশেষে বলে উঠলেন, "কী সুন্দর আপনার উচ্চারণ ও মাত্রাজ্ঞান!"

মিসেস ঝাবওয়ালার অনুরোধসত্ত্বে দে সরকার সে দিন আর আবৃত্তি করল না। তার বিদায় নেবার পর উজ্জয়িনীর শ্রবণে ধ্বনিত হতে থাকল—

"O ! lift me as a wave, a leaf, a cloud !
I fall upon the thorns of life ! I bleed !
A heavy weight of hours has chain'd and bow'd
One too like thee—tameless, and swift, and proud".

উজ্জয়িনী সুধীকে দিক করল, "চল, গ্রামে যাই। আর পারছিনে।"

সুধী বলল, "আমরা ওখানে কনফারেন্সের দিন কয়েক আগে যাবার অনুমতি পেয়েছি, এই বার ধীরে ধীরে রওনা হওয়া যাবে।"

"তবে আর দেরি কেন? চল—"

"বাদলের সঙ্গে আমার হিসাবনিকাশ চলছে যে। পারি তো তাকেও সঙ্গে নেব।"

"এত লোককে সঙ্গে নিচ্ছ," উজ্জয়িনী ঢোক গিলে বলল, "শেষ কালে স্থানাভাব হবে না তো?"

"এত লোক কোথায়! বাদল যদি রাজি হয় তো বাদল। আর সহায়েরও বিশেষ অভিলাষ—"

"আবার সহায়! আপনি জায়গা পায় না, শঙ্করাকে ডাকে।"

অতঃপর দে সরকার আবৃত্তি করল হুইটম্যান থেকে—

"As I lay with my head in your lap, Camerado,
The confession that I made I resume . . ."

সেদিন ঝাবওয়ালারা ছিলেন না, দে সরকার গলা ছাড়ল—

"I know my words are weapons, full of danger, full of death ; For I confront peace, security, and all the settled laws, to unsettle them ;"

ক্রমে তার স্বর ডানা মেলল, উড়ে চলল—

"And the threat of what is called hell is little or nothing to me ; And the lure of what is called heaven is little or nothing to me ; Dear Camerado ! I confess I have urged you onward with me, and still urge you, without the least idea what is our destination, or whether we shall be victorious, or utterly quelled and defeated."

উজ্জয়িনী তন্ময় হয়ে শুনছিল। বলল, "এইটুকু কবিতা ?"

"কবিতাটি ছোট, কিন্তু ওর অনুরণন দীর্ঘস্থায়ী।" বলল দে সরকার।

দু'জনে নিস্পন্দভাবে বসে রইল। উজ্জয়িনী সুধাল, "Camerado মানে তো কমরেড ?"

"হ্যাঁ, কিন্তু তার ব্যঞ্জনা আরো নিবিড়।"

৯

উজ্জয়িনী বলল, "পরের কবিতা কত আবৃত্তি করবেন! নিজের কবিতা শোনান।"

দে সরকার বলল, "নতুন কবিতা তো আর লিখিনি সেই থেকে।"

"তবে লিখুন।"

"এত কালের অনভ্যাস। লিখতে ভরসা হয় না। যদি একটু নিরালা পাই তো কবিতা, নয়, উপন্যাস লিখব।"

"উপন্যাস?" উজ্জয়িনী উৎসুক হয়ে বলল, "তা হলে তো আরো চমৎকার হয়। নিরালা যদি কোথাও না পান আমাদের সঙ্গে চলুন গ্রামে। সেখানে আপনাকে একটা ঘরে পূরে বাইরে থেকে তালা বন্ধ করব আর নিজের কাছে চাবী রাখব। কেমন, তা হলে লিখবেন?"

"আপনারা যদি দয়া করে সঙ্গে নেন," দে সরকার সহর্ষে বলল, "আমাকে একটা গাছে উঠিয়ে দিয়ে মই কেড়ে নেবেন কিংবা নৌকায় বসিয়ে দিয়ে হাল সরিয়ে দেবেন। তা হলে আমি নিরুপায় হয়ে লিখব। কিন্তু আমার উপন্যাস তো একদিনে বা এক সপ্তাহে সারা হবে না, ও যে বিরাট! তিন চার খণ্ডের কম নয়।"

"ওমা! তাই নাকি!" উজ্জয়িনী তটস্থ হলো। "আমরা যে অক্টোবরে দেশে ফিরছি। তার আগে আপনার বই শেষ না হলে আমরা কি আপনাকে বন্দী করে দেশে নিয়ে যাব? আর সেখানে পৌঁছবামাত্র যদি আমরাও বন্দী হই—"

"আপনারা বন্দী!" দে সরকার বাধা দিল।

"জানেন না?" উজ্জয়িনী খুলে বলল, "আইন অমান্য করে আমরা জেলে যেতে পারি। আমি তো নিশ্চয়ই! সুধীদা এখনো মনঃস্থির করতে পারছে না, জেলে যাবে না গঠনের কাজ করবে।"

দে সরকার এত জানত না। বলল, "আমি ইউরোপ ছাড়তে ইচ্ছুক নই। এখানকার জীবন হচ্ছে বেগবতী বন্যা, আর ওখানকার জীবন প্রবাহহীন পল্বল। দেশে যদি আপনারা একটা আবর্ত আনতে পারেন, প্লাবন আনতে পারেন তবেই আমি আসব!"

চোখ বুজে বলল, "কিন্তু আমি যদি পারি তো আপনাকে দেশে ফিরতেই দেব না।"

উজ্জয়িনী সুধীকে তাগাদা দিল। "কবে যাব, সুধীদা? কোন জন্মে? এমনি করে কি সোনার নিদাঘ ঋতু কাটায়! দেখছ না, তোমার মিউজিয়াম অধেক খালি হয়ে গেছে! কেউ গ্রামে, কেউ সমুদ্র সৈকতে, কেউ পাহাড়ে, কেউ জাহাজে, কেউ কন্টিনেণ্টে বেড়াতে বেরিয়েছে।"

সুধী বলল, "আর দেরি নেই, ভাই। দিন চার পাঁচ কোনো মতে ধৈর্য ধর।"

"আচ্ছা গো আচ্ছা। পড়েছি মোগলের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে। তুমি যদি চার পাঁচ দিন না বলে চার পাঁচ মাস বলতে তা হলেও আমি ধৈর্য ধরতুম! কিন্তু তোমার মতো শান্তিবাদীকে শান্তি দিতুম না। বুঝলে?"

সুধী অন্যমনস্কভাবে হাসল। শান্তিবাদীদের জন্যে সে তার বক্তব্য তৈরি করছিল।

"কিন্তু সুধীদা, শঙ্করাকে ডাকছ যখন তখন আর একজনকেও ডাক।"

"কাকে?"

"মিস্টার দে সরকারকে। উনি উপন্যাস লিখবেন, শহরে নিরিবিলি পাচ্ছেন না, গ্রামে হয়তো পাবেন।"

"কে? দে সরকার?" সুধী হো হো করে হাসল।

"হাসছ কেন? বল না?"

"দে সরকার যদি গ্রামে যায় তবে মরিস নাচ নাচবে। ও কি এক দণ্ড চুপ করে বসে বই লেখবার পাত্র? তুই ওকে চিনিসনি।"

"না, না, ওঁর অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সাহিত্যে ওঁর মতিগতি ফিরেছে। কী মনোরম আবৃত্তি করেন যদি শুনতে?"

"ওকে চিনতে সময় লাগবে। ওর যেমন গুণের সীমা নেই তেমনি দোষেরও স্বল্পতা নেই। যারা চন্দ্রমা দেখে তারা প্রথম কয়েক তিথিতে কলঙ্ক দেখতে পায় না, ক্রমে ক্রমে পায়।"

এ কথা শুনে উজ্জয়িনী রুষ্ট হলো। বলল, "কলঙ্ক কি আমারও নেই? তোমার মতো নিষ্কলঙ্ক ক'জন? আমি তো মনে করি কলঙ্ক একটা qualification."

সুধী টিপে টিপে হাসছিল, তা লক্ষ করে উজ্জয়িনী গায়ে পেতে নিল। তীক্ষ্ণ স্বরে বলল, "কে কাকে ঠিক চিনতে পারে জগতে! আমার তো ধারণা মেয়েরা মেয়েদের, পুরুষরা পুরুষদের চিনতে অপরাগ। প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রচ্ছন্ন সংস্কার তাদের অন্ধ করে দেয়।"

এর ভিতরে সুধীর প্রতি একটু শ্লেষ ছিল। সুধী পুরুষ বলে তারও প্রতিদ্বন্দ্বিতার সংস্কার থাকতে পারে। সুধী আর উচ্চবাচ্য করল না।

দে সরকারকে উজ্জয়িনী দ্বিতীয়বার বলতেই সে উদ্বাহু হয়ে ব্যগ্রতা প্রকাশ করল।

"লোটা কম্বল যা আছে গরিবের তাই নিয়ে বনবাসী হব।" দে সরকার বলল। "আপনার কাছে লুকিয়ে কী হবে, এই যে পোশাকটি দিনের পর দিন দেখছেন এটিই আমার বাঘছাল। টাকা থাকলে কি আমেরিকা যেতুম না? নিদেন পক্ষে স্কটলণ্ড? ধনের ঘরেও শনি। সেদিন যদি নরওয়ে সুইডেনের প্রস্তাবে আপনি সায় দিতেন আমাকে হয়তো চুরি ডাকাতি করতে হতো। যাক, এ তো তবু গ্রাম। কম খরচে চলবে। কিন্তু আপনাকে সাবধান করে দিই, আমার চালচলন দুর

থেকে যেমন, নিকট থেকে তেমন নয়। কাছাকাছি থাকলে ধরা যখন পড়বই তখন আগে থেকে জানিয়ে রাখা নিরাপদ।"

উজ্জয়িনী ফরাসী আমলের জমিদারবংশীয়ের স্বীকারোক্তি শুনে কৌতুক বোধ করল। বলল, "আপনি সেখানে গিয়ে ছুরি কাঁটা চুরি করবেন না, বড় লোকের পকেট মারবেন না, মুচলেকা লিখে দিতে রাজি আছেন? তা হলে আমি আপনার জামিন দাঁড়াতে রাজি আছি।"

দে সরকার কম্পিত কণ্ঠে বলল, "আপনি যদি জামিন দাঁড়ান তবে আমি সারা জীবন নিষ্পাপ থাকব এমন মুচলেকাও লিখে দিতে পারি। তবে আমি যে একজন পুরোনো দাগী এ কথা আপনার জানা দরকার। বলব আপনাকে একে একে সবই। তার পরে একদিন সরে পড়ব, যদি দেখি আমি আপনার বিশ্বাসের অভাজন।"

বলেই সেদিন সরে পড়ল।

গ্রামে যেতে উজ্জয়িনীর যতটা আগ্রহ সুধীর তার চেয়ে বহুগুণ বেশি। কিন্তু সুধী দেরি করছিল প্রকৃতপক্ষে বাদলের জন্যে। বাদলকে একা ফেলে সে কী করে লণ্ডন ছাড়ত? বাদলও যাতে তার সঙ্গী হয় সেজন্যে তার চেষ্টার বিরাম ছিল না। বাদল সঙ্গে থাকলে উজ্জয়িনীর দরুণ সুধীকে কেউ নিন্দা করত না।

কিন্তু এত তদ্বিরেও ভবী ভুলল না। বাদল স্পষ্ট বলে দিল, "তোমাদের বুর্জোয়া শান্তিবাদে আমার আস্থা নেই। আমিও যুদ্ধের বিরোধী, কিন্তু আমার বিরোধিতা তোমাদের মতো সঙ্কীর্ণ নয়, ব্যাপক। আমি চাই শোষণের অবসান, তা যদি হয় তবে শান্তি আপনি আসবে। শোষণের গায়ে আঁচড়টি লাগবে না, আকাশ থেকে টুপ করে শান্তি নামবে, এই 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' যাঁদের নীতি আমি তাঁদের সঙ্গে যোগ দিতে পারিনে। কিন্তু তোমরা নিশ্চিন্ত থেকো, আমি শান্তির

বিরোধিতা করব না, যদি কেউ শান্তির ব্যাঘাত করে তারই বিরোধিতা করব।"

এই উক্তির পিছনে যে মানসিক বিশৃঙ্খলা রয়েছে সুধী ইচ্ছা করলে তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে পারত, কিন্তু তার তো বাদলকে ভজাবার উদ্দেশ্য ছিল না, তার উদ্দেশ্য ছিল বাদলকে সাথী করবার। সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হওয়ায় সুধী আর বিলম্ব করল না, গ্রামে যাবার দিন ফেলল।

এতকাল ঝুলে থাকার পর এই সুখবরটা শুনে উজ্জয়িনী এত খুশি হলো যে সেদিন সুধীকে আটক রাখল। দে সরকার আসতেই দু'জনের দুই হাত ধরে বলল, "তোমাদের দু'জনের মধ্যে কিছু একটা হয়েছে। না ?"

সুধী ও দে সরকার উভয়েই নীরব। উজ্জয়িনী বলল, "আজ থেকে তোমাদের মিতালি। চল তোমরা দু'জনেই আমার সহচর হয়ে— একজন আমার দেবতা, একজন আমার ভক্ত।"

দেবতা ও ভক্ত উভয়েই অস্বস্তি বোধ করছিলেন। উজ্জয়িনীর তাতে ভ্রূক্ষেপ ছিল না। সে তাদের দু'জনকে দুটি পুতুলের মতো পাশাপাশি বসিয়ে স্বয়ং তাদের সম্মুখে বসল শিশু উজ্জয়িনীর মতো। তাদের তর্জনী দিয়ে শাসন করে বলল, "লক্ষ্মী ছেলের মতো খেলা করবে। কেউ কারো দোষ ধরবে না। ঝগড়া বাধলে আমাকে জানাবে। কেমন ? মনে থাকবে ?"

১০

অশোকার বাগ্‌দানের সময় থেকে সুধী কেমন একটা অবসাদ বোধ করছিল। প্রকৃতির কোলে আত্মসমর্পণ ছাড়া অন্য কোনো আরোগ্য

নেই, প্রকৃতি তার রসায়ন দিয়ে দেহমন নবীন করতে জানে। সেইজন্যে সুধী স্থির করেছিল যে গ্রামে গিয়ে পাঁচ ছয় সপ্তাহ থাকবে। তার শান্তিবাদী বন্ধুরাও গ্রামে যাচ্ছেন, তাঁরা হয়তো অতদিন থাকবেন না। শান্তিবাদের যা হবার হোক, শান্তি পেলেই সুধী সন্তুষ্ট।

মাঝখান থেকে উজ্জয়িনীর আকস্মিক আক্রমণ। সেও চায় যেতে। তাকে নিলে সুধীর দুর্নাম তো রটবেই, কিন্তু তার নিজের কলঙ্কের সীমা থাকবে না। একবার সে বাড়ি থেকে পালিয়েছিল, বৃন্দাবনে ধরা পড়ল। আরো এক পোঁচ কালি মেখে দেশে ফিরলে দেশের লোক ছি ছি করবে।

কাজেই সুধী ভারী মুশকিলে পড়েছিল। তার ভরসা ছিল বাদল শেষ পর্যন্ত গ্রামে যেতে রাজি হবে, কিন্তু বাদল তো নারাজ হলোই, কোনখান থেকে দে সরকার এসে জুটল। যদি পেছিয়ে যাবার পথ থাকত সুধী গ্রামে যাওয়া বন্ধ করত। কিন্তু ইতিমধ্যে বিজ্ঞাপিত হয়েছে ভারতের পক্ষে ভাষণের ভার সুধীর উপর।

যেদিন গ্রামে যাবার কথা তার আগের দিন তিনজনেই গেল বাদলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। বাদল বলল, "কাজ কি ভাই আমাকে টেনে? আমি কথা কইতে অপরাগ, কেননা একদিন আমাকে কথা কইতে হবে। আমি কথা শুনতে অনিচ্ছুক, কেননা এতদিন আমি ও ছাড়া আর কী করেছি? কোথাও যেতে আমার রুচি নেই, কেননা যেখানেই যাই সেইখানেই দেখি দুঃখ। আমাকে একা থাকতে দাও তোমরা।"

বাদল তাদের ঠিকানা লিখে নিল। দরকার হলে খবর দেবে। তার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হবার পক্ষে তাই যথেষ্ট নয়, কিন্তু উপায় নেই।

তারা তিনজনে নদীর বাঁধ থেকে ফিরে হোটেলে পা দিচ্ছে এমন সময় পোর্টার বলল, "টেলিগ্রাম, ম্যাডাম।" তারখানা তাড়াতাড়ি

খুলে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে উজ্জয়িনী ওখানা সুধীর হাতে দিল। সুধী পড়ল—

"Come with Sudhi or Kumar.

Mother."

উজ্জয়িনী উতলা হয়ে জিজ্ঞাসা করল, "মানে কী, সুধীদা? তুমি কি মনে কর মা'র কোনো অসুখ—"

সুধী নীরব থাকল। অসুখ করলে সে কথা উল্লেখ করতে আর যেই হোক মিসেস গুপ্ত ইতস্তত: করতেন না। অসুখ নয় অন্য কোনো ব্যাপার।

দে সরকার তারখানা চেয়ে নিয়ে পড়তে না পড়তেই চমকে উঠল। পাংশু মুখে বলল, "হোয়াট! এ যে বিনা মেঘে বজ্রপাত। চক্রবর্তী, তুমি কী বল?"

তা শুনে উজ্জয়িনী ভয় পেয়ে গেল। বলল, "ও সুধীদা!"

সুধী তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, "না, অসুখ নয় তবে তোমরা তো পোঁটলা বেঁধে প্রস্তুত হয়ে রয়েছ। কেবল গন্তব্যের পরিবর্তন হলো।"

উজ্জয়িনী শক্ পেয়ে সুধাল, "সে কী! তুমি যাবে না, সুধীদা?"

"আমি গেলে দিন দু'তিনের বেশি থাকতে পারব না, আমার যে ভারতের পক্ষে ভাষণের নিমন্ত্রণ।"

"আমিও কি দিন দু'চারের বেশি থাকব ভাবছ? যেখানে তুমি সেখানে আমি।"

সুধী স্নিগ্ধস্বরে বলল, "না, লক্ষ্মী। তোর মা কিংবা শ্বশুর কিংবা স্বামী যেখানে তুই সেখানে।"

উজ্জয়িনী তর্ক করতে যাচ্ছিল, "কিন্তু বিয়ের পরে মায়ের সঙ্গে মেয়ের এমন কী—"

সুধী বাধা দিয়ে বলল, "তোর মা তোকে ডেকেছেন, হয়তো বিশেষ বিপন্ন হয়েই ডেকেছেন, তুই যা। তোর সঙ্গে যাক দে সরকার।"

উজ্জয়িনীর চোখ দিয়ে জল উথলে পড়ল। সে দুই হাতে মুখ ঢেকে উঠে গেল, কিন্তু সুধীকে ও দে সরকারকে ইশারা করে গেল বসে থাকতে। কিছুক্ষণ পরে চোখ মুখ ধুয়ে যখন নামল তখন তাকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন একটি ভৈরবী।

ইতিমধ্যে দে সরকার বলছিল সুধীকে, "এ কী মহাসঙ্কট!"

"কেন হে! তুমি তো কার্লসবাডের রাস্তা চেন, তোমার পাসপোর্টও রয়েছে। তোমার পক্ষে তো মহা সহজ।"

"না, না, তা নয়।" দে সরকার হিমসিম খেয়ে বলল, "তুমি থাকতে আমি কোন স্বত্বে—কোন অধিকারে—ওঁকে নিয়ে যাব?"

"আমার যে উপায় নেই। তুমি আছ কী করতে যদি তোমার বন্ধুপত্নীকে তার জননীর অনুরোধে এক স্থান থেকে আর এক স্থানে নিয়ে যেতে না পারলে?"

"আমাকে," দে সরকার সুধীর কাছে সরে এসে বলল, "ভুল বুঝো না, ভাই চক্রবর্তী।"

"না, তোমাকে ভুল বুঝব না, ভাই দে সরকার। তুমি তো নিজের ইচ্ছায় যাচ্ছ না। যাচ্ছ টেলিগ্রামের নির্দেশে।"

"সুধীদা!" দে সরকার সেন্টিমেন্টাল সুরে ডাকল।

"কুমার!"

"তুমিই তো সেদিন বলেছিলে ওঁকে কোথাও না নিয়ে যেতে!"

"কিন্তু এক্ষেত্রে যে উপরওয়ালার আদেশ।"

"তবু সন্দেহ তো তুমি করবে।"

"হাঁ, সন্দেহ আমি করব। এবং বিশ্বাসও করব যে তুমি এই অপূর্ব

প্রলোভন জয় করবে। এই তোমার জীবনে উজ্জয়িনী সম্পর্কে প্রথম দায়িত্ব। তোমার নিজের হাত থেকে এবার তুমি তাকে রক্ষা করতে সম্মানবদ্ধ।"

দে সরকার ক্ষিপ্রভাবে বলল, "তবে তুমি আমার হাতে ওঁকে দিলে ?"

সুধী উদাসকণ্ঠে বলল, "আমি দেবার কে! বিধাতা দিলেন। আমি যেভাবে জড়িয়ে পড়েছিলুম তাতে আমার কাজের ক্ষতি হচ্ছিল। তিনি আমার বাঁধন খুলে দিচ্ছেন। অশোকা গেছে, উজ্জয়িনী যাচ্ছে, এর পরে মার্সেল।"

এমন সময় উজ্জয়িনী এসে সুধীর পাশে বসল। বলল, "আমি জানি তুমি তোমার কর্তব্য ফেলে আমার সঙ্গে যাবে না। তবু আমি ভাবতে পারছিনে যে যার জন্যে আমার আমেরিকা যাওয়া হলো না তাকে রেখে আমার কার্লসবাড যাওয়া হবে। মিস্টার দে সরকার, আপনি আমার নাম করে একখানা তার করে দিন মা'কে। জিজ্ঞাসা করুন কী হয়েছে। অসুখ না অন্য কিছু।"

দে সরকার বলল, "আ-আ-আমিও তাই ভাবছিলুম।" তার মুখখানা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল।

তা লক্ষ করে সুধী বলল, "তার করে সময় নষ্ট করা উচিত নয়। মা যখন যেতে বলেছেন তখন নিশ্চয়ই কিছু ঘটেছে।"

"আ-আ-আমিও তাই ভাবছিলুম।" বলল দে সরকার।

উজ্জয়িনী বিরক্ত হয়ে নিজেই একখানা টেলিগ্রামের ফর্ম জোগাড় করে লিখতে বসল। কাটাকুটির পর এই রকম দাঁড়াল—

"Sudhi attending Peace Conference. I attending. Kumar attending. How are you ?"

সুধী হেসে বলল, "পীস কনফারেন্স নয়, প্যাসিফিস্ট কনফারেন্স। কিন্তু লক্ষ্মী, তোকে যেতেই হবে কার্লসবাড। আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে লণ্ডন থেকে কেউ বা কারা তোর মায়ের কাছে কিছু লিখেছেন।"

"অসহ্য!" "অসহ্য!" উজ্জয়িনী খসড়াখানা কুটি কুটি করে ছিঁড়ল। "আমি কার কী করেছি যে কেউ অমন যা তা লিখে জ্বালাবে! রিভলবার দিয়ে শূট করতুম যদি জানতুম কে বা কারা—"এই পর্যন্ত বলে কেঁদে ফেলল।

ওদিকে দে সরকার একটু একটু কাঁপছিল। তার কাঁপুনির বিশেষ কোনো কারণ না থাকায় সুধীর মনে সন্দেহ হলো, হয়তো সেই কিছু লিখেছে। কিন্তু সুধী অপরাধ নিল না। ঠিকই হয়েছে যে উজ্জয়িনী তার মায়ের কাছে যাচ্ছে। সেইখানেই তার যথার্থ স্থান। সুধীর সঙ্গে গ্রামে নয়।

"সমাজে বাস করতে হলে," সুধী সান্ত্বনাচ্ছলে বলল, "সমালোচনার অধিকার মানতে হয়। কতলোক কতো দুর্নাম রটায়, তাদের সবাইকে গুলি করতে গেলে গুলির দর বেড়ে যায়। আমরা যদি নিষ্পাপ হই তবে সেই হবে আমাদের মোক্ষম গুলি। সীতা সেকালের অযোধ্যার লোককে চিরকালের মতো গাধার টুপি পরিয়ে দিয়ে গেছেন। যদি তাদের গুলি করতেন তা হলে কিন্তু তারাই জিতে যেত।"

উজ্জয়িনী অশ্রুভারাক্রান্ত কণ্ঠে দে সরকারের সাক্ষাতেই সুধীকে বলল, "তোমার অনুমান যদি সত্য হয় মা আমাকে তোমার কাছে ফিরতে দেবেন না, তুমি যখন দেশে ফিরবে তখন আমাকে আটকে রাখবেন। তবে কি আমি কোনো দিন তোমার সঙ্গে থাকতে পাব না—এই শেষ?"

সুধী কোমল স্বরে বলল, "আপাতত এই শেষ। এই ভালো,

উজ্জয়িনী, লক্ষ্মী। আমাকে এক মনে আমার কাজ করে যেতে দে। আমার কাজ যতদিন না তোরও কাজ হয় তত দিন আমাদের বিচ্ছেদ শ্রেয়। কর্তব্য পথে যেদিন আমরা একত্র হব সেদিন দেখবি শেষ নেই, সে মিলন অশেষ।"

১১

পরদিন সুধীর যাওয়া হলো না। উজ্জয়িনীর পাসপোর্ট ও Visa, দে সরকারের Visa সংগ্রহ করতে দিনান্ত হল। প্রাণান্ত হতে পারত, কিন্তু সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র। উজ্জয়িনী যে অফিসারের সম্মুখে উদয় হয় তিনিই শশব্যস্ত হয়ে বলেন, "খুব বেশি দেরি হবে না। আমরা আমাদের উপরকার আদেশ প্রতি মুহূর্তে প্রত্যাশা করছি।"

দিনান্তে দে সরকারকে বাজার সরকার নিযুক্ত করে উজ্জয়িনী বলল, "সুধীদা, চল শেষবার লণ্ডন দেখি।"

দু'জনে একখানা বাস-এর ছাতে উঠে বসল। নিরুদ্দেশ যাত্রা। দু'জনেই অনেকক্ষণ অসাড় ভাবে বসে রইল, কথা কইল না।

স্তব্ধতা ভঙ্গ করল উজ্জয়িনী। "সুধীদা, আমার তো মনে হয় না যে মা অচিরে ফিরবেন। তাঁর কিছু টাকা গেছে, কিন্তু কিছু আছেও। সেটুকু খরচ হতে এখনো পাঁচ বছর লাগবে, তার আগে তিনি ইউরোপ থেকে নড়বেন বলে মনে হয় না।"

সুধী বলল, "দেখা যাবে।"

"আমি যদি তাঁর সঙ্গে থাকি তবে আমারও," উজ্জয়িনী বিশদ করল, "দেশে ফিরতে আরো পাঁচ বছর।"

"দেশ," সুধী সস্নেহে বলল, "তোর অভাব নিত্য বোধ করবে।

কিন্তু অপেক্ষা করবেও। তুই যদি ক্লিনিকের বিদ্যা আরম্ভ করিস তবে পাঁচ বছরও দীর্ঘকাল নয়।"

"কিন্তু ওতে আমার মন লাগে না যে!"

"কারণ জগতের ব্যথা তোর বুকে বাজেনি। নিজের বেদনা তোকে বিহ্বল করেছে।"

কিছুক্ষণ পরে উজ্জয়িনী বলল, "জগতের সেবা যে করবে তারও সুখ শান্তি চাই। তার ক্ষুধা যদি না মেটে তবে কেমন করে সে অন্নপূর্ণা হবে!"

"যথার্থ। কিন্তু ক্ষুধা মেটে অন্নে নয়, অমৃতে। অন্নের জন্যে অন্যের মুখাপেক্ষী হতে হয়, অমৃতের জন্যে আপনার অন্তর মন্থন করতে হয়। তোর কি অমৃত নেই যে তুই অন্নের জন্যে হাবাতের মতো বেড়াবি?"

উজ্জয়িনী ফিসফিস করে সুধীর কানে কানে বলল, "এই! এ বাস-এ আর একজন ভারতীয় আছেন। বোধ হয় বাঙালী।"

সুধী পিছন ফিরে তাকাল, আরে এ যে নীলমাধব চন্দ। সুধী বলল, "নীলমাধবের সঙ্গে তোর পরিচয় নেই? দুঃখের জীবন!"

"সঙ্গে তো একটি দুঃখিনী দেখছি।" উজ্জয়িনী নিচু স্বরে বলল। "তোমরা ভারতীয় ছাত্রেরা এ দেশে এসে এদের কন্যাদায়ের দুঃখ সইতে পার না।"

সুধী শুনেছিল নীলমাধব বাগ্‌দত্ত হয়েছে একটি জার্মান ইহুদী মেয়ের সঙ্গে। মেয়েটি উচ্চাঙ্গের বেহালা বাজায়। নীলমাধব তাকে দেশে নিয়ে যেতে পারে না, সেখানে বিদেশিনীর বেহালা বুঝবে কে? আর মেয়েটিও আর্ট সম্বন্ধে সীরিয়াস। নীলমাধব ইতিমধ্যে কয়েক বছর বিদেশে কাটিয়েছে, বোধ হয় সারা জীবন বিদেশেই কাটাবে।

কষ্টে চালায়। চির প্রবাসীর যে নিরুপায় দুঃখ সেই দুঃখ তার। অথচ সে তার দেশকেও কম ভালোবাসে না। বহুকাল অন্তরীন ছিল, এখনো তেমনি স্বদেশী।

এসব শুনে উজ্জয়িনী চাপা গলায় বলল, "ইণ্টারন্যাশনাল ট্র্যাজেডী! কী বল, শান্তিবাদী? তোমার শান্তিবাদ এর কী মীমাংসা করবে?"

"মীমাংসা সম্ভব নয় বলেই তো আমি বলি, বিদেশে এসে কেউ যেন প্রেমে পড়ে না, বিয়ে করে না।"

"আর তুমি নিজেই সুজেতের—"

"ছি! যা তা বলিস নে।"

"কিন্তু আমি শপথ করে বলতে পারি ও তোমাকে প্রাণের চেয়ে ভালোবাসে। তেমন ভালোবাসা যদি আমি বাসতে পারতুম তবে আজ এইখানেই প্রাণ দিতুম, কখনো কার্লসবাড যেতুম না।"

কোন কথা থেকে কোন কথা এসে পড়ল। সুধী নীলমাধবকে সঙ্কেতে অভিবাদন জানাল। নীলমাধব প্রত্যভিবাদন করল।

উজ্জয়িনী চুপি চুপি বলল, "আমাকে তুমি নির্বাসন দিচ্ছ, জানি। বনে নয়, তা হলে তো বাঁচতুম। ইউরোপের ভোগবিলাসের কেন্দ্রস্থলে, যেখানে পদে পদে প্রলোভন, একটু অসতর্ক হলেই পদস্খলন। যদি কোনো দিন আমাকে দেখতে পাও তবে সেদিন কোন পাপীয়সীকে দেখবে! কোন পতিতাকে!"

সুধী ক্ষণকাল হতবাক্ হলো। তারপরে ভাষা ফিরে পেলো।

"ইউরোপের মেয়েরা তো ভোগবিলাসের বাইরে নয়। তবে তারাও কি তোর ধারণায় তাই?"

"না, না। আমি কি তাই মনে করে বলেছি?" অপ্রতিভ হলো উজ্জয়িনী। "রোগের আবহাওয়ায় বহুকাল বাস করলে যেমন এক

প্রকার প্রতিরোধশক্তি জন্মায় ভোগের আবহাওয়ায়ও তেমনি। বুঝলে সুধীদা, ইউরোপের মেয়েরা immune."

সুধী বলল, "কতকটা সত্যি। কিন্তু আমার বিশ্বাস ওদের রক্ষা করে ওদের ধর্ম, ওদের নারীত্বের আদর্শ। ওদের ঐতিহ্য ওদের বাঁচায়।"

"হতে পারে। কিন্তু আমি যা বোঝাতে চেয়েছিলুম তা কি তুমি বুঝলে!" সে অভিমানে মুখ ফেরাল।

সুধীও চেয়ে দেখল নীলমাধব যেখানে বসেছে সেখানে কোনো আসন খালি কি না। নীলমাধবের সঙ্গে তার কথা ছিল। আসন খালি দেখে সুধী বলল, "আমাকে এক মিনিট ছুটি দিতে পারিস?" উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করল না।

নীলমাধব তার ফিয়াঁসীর সঙ্গে সুধীর আলাপ করিয়ে দিল। দু'চার কথার পর সুধী বলল, "আপনি কি লণ্ডনে আপাতত কিছুদিন থাকবেন? না অন্য কোথাও যাবার কল্পনা আছে?"

"লণ্ডনেই থাকব। এঁর কয়েকটা রিসাইটাল আছে।"

"ওহ্! তা হলে তো বঞ্চিত হব। কিন্তু শুনুন, নীলমাধবদা, আপনি আমার বন্ধু বাদলকে একটু দেখবেন? বেশি দিন না, পাঁচ ছয় সপ্তাহ। হপ্তায় একবার দেখলেই চলবে।"

"বেশ। তার ঠিকানাটা—"

"তার ঠিকানা যদি শোনেন নিজের শ্রবণকে অবিশ্বাস করবেন। টেমস নদীর বাঁধ।"

"তার মানে লণ্ডন থেকে অকস্ফোর্ড? না টিলবেরী?"

"অত দূর নয়। লণ্ডনের সীমানাই ওর ঠিকানা। তবে ওকে পাবেন সচরাচর চেয়ারিং ক্রসের নিকটে।"

সুধী ফিরলে উজ্জয়িনী বলল, "সুধীদা, আর ভালো লাগছে না। চল নেমে যাই।"

এবার ট্যাক্সি। উজ্জয়িনীর ভ্রূক্ষেপ নেই, মিটারে কতো উঠছে উঠুক। সে সুধীর গা ঘেঁসে বসল ও বলল, "তোমার কাছে যতদিন থাকি আমার শারীরিক চেতনা থাকে না। আমি যেন অশরীরী আত্মা। দূরে গেলেই টের পাই আমার শরীর আছে, শরীরের ওজন আছে, আর আছে অতি সূক্ষ্ম ক্ষুধা। সুধীদা, তুমি যে অমৃতের কথা বলছিলে তা মিথ্যে নয়, আমিও মানি যে অমৃত যদি মেলে তবে অন্নের জন্যে ঘুরতে হয় না। কিন্তু সে অমৃত আমার অন্তরে নেই। আছে আর একজনের স্পর্শে।"

সুধী তাকে বাধা দিল না, সেও সুধীর একটি হাত তুলে নিয়ে একটি বার মুখে ছোঁয়াল।

তারপরে কেউ কথা কইল না, সুধীও না, উজ্জয়িনীও না। সুধী অন্যমনস্ক ছিল, যখন তাকাল তখন লক্ষ করল উজ্জয়িনীর চোখে মুখে অশ্রুর জোয়ার। সে যেন চেষ্টা করছে কিছু বলতে; কিন্তু বলতে বাধছে। তাই অসহায় ভাবে কাঁদছে।

সুধীর সহসা মনে হলো, কে কার স্বামী, কে কার স্ত্রী, কে কার বন্ধু, কে কার ভাই! সামাজিক সম্পর্কই কি সব! সেই সম্পর্কই কি রিয়াল! আমরা যে চির পুরাতন চির নবীন আত্মা। আমাদের সকলের সঙ্গেই সকলের আত্মীয়তা, সকলের সখ্য, সকলের প্রেম। আমরা নক্ষত্র নীহারিকার মতো নিজ নিজ কক্ষায় চলেছি, চলতে চলতে পরস্পরের পাশ দিয়ে যাচ্ছি, যেতে যেতে স্নেহ ভালোবাসা পাচ্ছি সমাজ আছে, সমাজের কানুন আছে, কিন্তু সেই একমাত্র রিয়ালিটি নয়, চরম রিয়ালিটি নয়। সবার উপরে মানুষ সত্য। তা যদি না

হতো তবে রাধাকৃষ্ণের অসামাজিক প্রেম যুগ যুগ ধরে ভারতের হৃদয় অধিকার করত না।

সুধী বলল, "আমি কিছু মনে করিনি, কোনো অপরাধ নিইনি। তোর শুভ্র অন্তঃকরণের নির্মল উপহার গ্রহণ করেছি, ধন্য হয়েছি। এমনি শুভ্র যেন চিরকাল থাকিস, এমনি নির্মাল্য যেন সঞ্চয় করে রাখিস। ধর্ম যদি তোকে রক্ষা না করে তবে প্রেম যেন তা করে। কিন্তু ভুলিসনে যে আমি বৈরাগী—প্রতিদানে অক্ষম।"

১২

সুধী সেদিন রাত জেগে মিসেস গুপ্তকে চিঠি লিখল। চিঠির সারবস্তু এই—

যে সব ছেলে ভারতবর্ষ থেকে ইউরোপে আসে তাদের অধিকাংশই ডিগ্রী নিয়ে স্বদেশে ফেরে, সম্ভব হলে চাকরি নিয়ে। কিন্তু মাঝে মাঝে এমন দু'চারজনও দেখা যায় যারা ইউরোপের কাছে অসম্ভবের মন্ত্র নেয়, তাদের পণ মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন। হরদয়াল, কৃষ্ণবর্মা, সাবরকার, বীরেন চট্টোপাধ্যায়—এঁদের গুরুজন নিশ্চয়ই আশা করেছিলেন যে এঁরাও হবেন সিভিলিয়ান, ব্যারিস্টার, প্রোফেসার। কিন্তু এঁদের কেউবা হলেন বন্দী, কেউ বা নির্বাসিত। এঁদের কারো কারো স্ত্রী রয়েছেন স্বদেশে, হরদয়ালের তো একটি মেয়ে আছে শুনতে পাই, বেচারি নাকি শৈশব অবধি বাপকে দেখেনি।

বাদলের লক্ষ্য যদিও ভিন্ন তবু সেও এঁদেরই মতো মন্ত্রচালিত। সেও বোধ হয় দেশে ফিরবে না, এ দেশেও অর্থ উপার্জন করবে না। এর দরুণ আফসোস করতে পারি, কিন্তু দোষ ধরতে পারি নে। তার জীবনের দায়িত্ব মুখ্যতঃ তারই। কাজেই জীবনযাপনের স্বাধীনতাও

ন্যায়তঃ তার। আমরা বড় জোর অনুযোগ করতে পারি, আবেদন করতে পারি, পরামর্শ দিতে পারি, কিন্তু চাপ দিতে পারিনে।

এমন মানুষের সঙ্গে উজ্জয়িনীর বিয়ে দেওয়া ঠিক হয়েছে কি না বিতর্ক করা বৃথা। আমার এক এক সময় মনে হয়, ঠিকই হয়েছে, বিয়ে দিতে হলে বাদলের যোগ্য উজ্জয়িনীই আর উজ্জয়িনীর যোগ্য বাদলই। ভুল যদি হয়ে থাকে তবে মনোনয়নে নয়, পরিণয়ে। অর্থাৎ অসময়ে বিয়ে দিয়ে এই বিপত্তি। সবুর করলে হয়তো বিয়েই হতো না, কিন্তু বিভ্রাট বাধত না।

যা হোক এখন এ বন্ধন অচ্ছেদ্য। উজ্জয়িনী ছেদনের কথা ভাবছে, কিন্তু ওতে সুখ নেই। আমি যতদূর বুঝি উজ্জয়িনীর কর্তব্য তার বাল্যের আদর্শে প্রত্যাবর্তন। সিস্টার নিবেদিতা, ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল, ইডিথ ক্যাভেল, এই সকল প্রাতঃস্মরণীয়া নারীর আত্মনিবেদনই তার বাল্যের আদর্শ। তার পিতা সেই উদ্দেশ্য সামনে রেখে উইল করে গেছেন। পিতার আশীর্বাদ তাকে সার্থক করবে যদি সে উপযুক্ত শিক্ষার পরে সেবাকার্যে ব্রতী হয়।

সেই যে ক্লিনিকের কথা ছিল, যা নিয়ে আপনিও উৎসাহ প্রকাশ করেছিলেন, তার ভিত্তি স্থাপনের সময় এসেছে। ভিত্তি হচ্ছে উজ্জয়িনীর শিক্ষানবীশী। কোথাও যদি তাকে শিক্ষার্থীরূপে নেয় তবে সেইখানেই সে থাকবে, যতদিন না তার শিক্ষা সমাপ্ত হয়। আর আপনি থাকবেন তার অদূরে, যদি সঙ্গে না থাকতে পারেন। এ ছাড়া তো আমি কোনো সমাধান দেখিনে। আমার অনধিকারচর্চা ক্ষমা করবেন, মা। আমি কোথাকার কে! তবু আপনাদের সঙ্গে ভাগ্যসূত্রে গাঁথা। আপনাদের মঙ্গল আমার দিবারাত্রের প্রর্থনা।

আমি যেতে পারছিনে, দে সরকার যাচ্ছে। । দেশে ফেরবার সময়

দেখা করে যাব, যদি ততদিন ওখানে থাকেন। আশা করি আপনার স্বাস্থ্য ভালো আছে। আমার প্রণাম।—

পরদিন স্টেশনে যাবার আগে চিঠিখানা সুধী উজ্জয়িনীর জিম্মা দিল। উজ্জয়িনী বলল, "পড়তে পারি?"

সুধী বলল, "স্বচ্ছন্দে।"

চিঠিখানার উপর একবার চোখ বুলিয়ে উজ্জয়িনী ঠোঁট উল্টিয়ে বলল, "এই কথা! আমি ভাবছিলুম কী জানি কোন রহস্য ফাঁস করে দিয়েছ। কিন্তু সুধীদা, আমি কি শূদ্রাণী যে সেবা করেই আমার সদ্‌গতি? অশোকা হলে তার বেলায় কি তুমি ওই ব্যবস্থা দিতে?"

সুধী স্তম্ভিত হলো এ অভিযোগ শুনে।

"রাগ করলে?" উজ্জয়িনী সুধীর আঙুল নিয়ে খেলা করতে করতে বলল, "না, আমি সেবিকা হব না। আমার বাল্যের আদর্শ আমার নিজের ভিতর থেকে পাওয়া নয়, বাবার কাছে পাওয়া। তিনি যাঁদের ভক্তি করতেন আমিও তাঁদের ভক্তি করতে শিখেছিলুম। এতদিনে আমি তাঁর প্রভাব কাটাতে পেরেছি, এখন আমি তাঁর আদর্শকে নিজের আদর্শ বলে ভ্রম করব না। পৈত্রিক ধনের জন্যেও না। আত্ম আবিষ্কার অতি কঠিন কাজ। আমি আপাতত তাই করব। স্বতঃস্ফূর্তিই আমার জীবনের আলো। সেই আলোয় যখন যা দেখতে পাই তাই আমার কর্তব্য। তুমি আমাকে কর্তব্য বাতলাবার দাবী কোরো না। কী হবে শুনি? ব্যর্থ হবে আমার জীবন? তার বেশি তো নয়? হোক না ব্যর্থ? ব্যর্থতারও কুহক নেই কি?"

যে মানুষ যাবার মুখে তার সঙ্গে ঝগড়া করতে সুধীর মতি হলো না। সে জানতে চাইল, "দে সরকার কোথায়?"

"তিনি মানের সঙ্গে রওনা হয়ে গেছেন।" উজ্জয়িনী হেসে বলল, "শুনবে, সুধীদা ? আমার ধারণা ছিল তিনি বোহেমিয়ান। কিন্তু ঘরকন্না করাই তাঁর স্বভাব। রাঁধতে বাড়তে বাজার করতে জিনিসপত্র বাঁধতে তাঁর মতো ক'জন আছে ? যে মেয়ে তাঁকে বিয়ে করবে সে মেয়ের ভারী মজা—কর্তাই হবেন গিন্নী।"

সুধী বলল, "তোরা যে দেশে যাচ্ছিস তাকেও বলে বোহেমিয়া। কিন্তু সেখানকার লোক বোহেমিয়ান নয়।"

উজ্জয়িনীর সঙ্গে সুধী লিভারপুল স্ট্রীট স্টেশনে গেল। হল্যাণ্ড ও জার্মানী দিয়ে কার্লসবাড যাবার প্রোগ্রাম হয়েছে।

"লিভারপুল থেকে আমেরিকা নয়, লিভারপুল স্ট্রীট থেকে চেকোস্লোভাকিয়া!" উজ্জয়িনী পরিহাস করল। "যেমন আমের বদলে আমড়া!"

দে সরকার বার বার ঘড়ি দেখছিল। যদিও সময় ছিল দেদার তবু তার ভাবখানা যেন—যাঃ গাড়ী তো ছেড়ে দিল, সহযাত্রিণী কোথায়!

এমন সময় উজ্জয়িনীকে দেখতে পেয়ে সে লুফে নিতে লাফ দিল। সুধী বলল, "সম্বর' ! সম্বর' ! তোমার লঙ্কা ডিঙানোর এখনো অনেক দেরি। কিন্তু তোমার হাতে ঐ গন্ধমাদনটি কিসের ?"

বোকা মেয়ে কোটটাকে বন্ধ করে গাড়িতে চাপিয়ে দিয়েছিল। বুদ্ধিমান দে সরকার সেটিকে উদ্ধার করে কাগজে মুড়ে বগলে ধরেছে। একটু পরে ট্রেন থেকে নেমে জাহাজে চড়তে হবে তখন এই দারুণ গরমের দিনেও দিব্যি শীত করবে। কোটের খোঁজ পড়বেই।

সুধী বলল, "হাঁ, গিন্নীপনাই এর স্বভাব।"

উজ্জয়িনী ফিক করে হাসল। দে সরকার বুঝতে পারল না কেন

ও মন্তব্য। অপ্রস্তুত হলো। তা দেখে উজ্জয়িনীর দয়া হলো। সে কোটটি গায়ে দিয়ে বেচারাকে অব্যাহতি দিল।

সুধী কিছু ফুল কিনে এনে উজ্জয়িনীকে দিল। বলল, "এবার তোকে বিদায় দিতে লণ্ডনের লোক ভিড় করেনি। আমিই তোকে সর্বসাধারণের পক্ষে বিদায় উপহার দিচ্ছি।"

উজ্জয়িনী বলল, "সর্বসাধারণকে আমার অসংখ্য ধন্যবাদ।"

সুধী বলল, "চিঠিখানা মা'কে দিতে ভুলিসনে। আর তাঁকে বুঝিয়ে বলিস কেন আমার যাওয়া হলো না।"

"তিনি," উজ্জয়িনী তামাশা করল, "তোমাকে না দেখে হাহাকার করবেন। আমি বুঝিয়ে বলব, পথে হারিয়ে যায়নি, আছে যেখানে ছিল সেখানে।"

দে সরকার কী সব খাবার কিনে আনল। কৈফিয়ৎ দিল, "পুলম্যান আছে বটে, কিন্তু আমরা পুলম্যানে বসে খাব না।"

"কেন পুলম্যানে বসে খাব না?" উজ্জয়িনী তার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিল। "পুলম্যানের সৃষ্টি হয়েছে কী জন্যে যদি আমরা সেখানে বসে না খাই? আপনি কি মনে করেছেন পুলম্যান থাকতে আমি নিজের কামরায় বসে লুকিয়ে লুকিয়ে খাব? এসব বিষয়ে আমি আমেরিকান।"

সুধী উজ্জয়িনীর মেজাজ জানত। সে কখনো টাকা বাঁচাবে না, যত পারে ওড়াবে। কিন্তু দে সরকার হলো অন্য দশজন মধ্যবিত্ত যাত্রীর মতো হিসাবী, অকারণে পুলম্যানে বসে পকেট খালি করতে তার স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা। তাই সে নিজের খরচে দু'জনের উপযোগী পুষ্টিকর ও রুচিকর আহার্য কিনেছিল।

"না, আপনি সত্যিকার বোহেমিয়ান নন।" উজ্জয়িনী মাথা নাড়ল। "আপনি বেশ গোছালো গিন্নী। চলুন, পুলম্যানেই ওঠা যাক।"

সুধী দে সরকারকে একান্তে ডেকে নিয়ে উপদেশ দিল, "ওহে, ললিতা রায় ওকে সামলাতে পারলেন না, ও মেয়ে উড়নচণ্ডী। পুলম্যান আছে, একথা উল্লেখ করতে গেলে কেন? ওকে বড় হোটেল, বড় দোকান ইত্যাদির ধার দিয়ে যেতে দিয়ো না। ও সব যাতে ও ভুলে থাকে তাই হবে তোমার কর্মকৌশল। কিন্তু একবার যদি ওর মনে পড়ে যায় তবে বাধা দিয়ো না। বরং উড়তে দিয়ো। তাতে ঝুঁকি কম।"

মৌনব্রত

১

বাদল মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল যতদিন না নিজের বাণী আবিষ্কার করেছে, নিজের কণ্ঠস্বর অর্জন করেছে, ততদিন নীরব থাকবে। প্রাণধারণের পক্ষে যে কয়টি প্রশ্ন একান্ত আবশ্যক, ভদ্রতার খাতিরে যে কয়টি উত্তর একান্ত প্রয়োজন, সেই কয়টি শব্দ কোনো মতে উচ্চারণ করবে। যেমন, "দেশলাই, সার?...ধন্যবাদ, সার।" কিম্বা "রুটিমাখন, প্লীজ।....ধন্যবাদ, মিস।" কিংবা "হাঁ, দিনটি চমৎকার।"

যার কণ্ঠস্বর নেই তার তূণে তর্কশর থেকে কী লাভ? তর্ক করতে করতে বাদলের তর্কে অরুচি ধরেছিল। তার নিজের বিচারে তার তর্ক স্বতঃসিদ্ধ, কিন্তু কেউ কি ও কথা মেনে নেয়? মানুষের সঙ্গে তর্ক করে কিছু শেখাও যায় না, কিছু শেখানোও যায় না, কেবল কষ্ট হয় মনের ভিতরটায়। দুনিয়াতে কষ্টের কমতি কোথায় যে ইচ্ছা করে কষ্ট বাড়াতে হবে? যে পরের দুঃখমোচন করবে তার নিজের দুঃখ বাড়ানো উচিত নয়। বাদল তর্কের বিরুদ্ধে সতর্ক হলো।

তর্ক নয়, তর্ক মাঝারিদের জন্যে। বাদল মাঝারি নয়, অদ্বিতীয়। সে যে কথা বলবে সে কথা হবে লাখ কথার এক কথা। লক্ষ লোকের কথা ফেলে তারই কথা শুনবে বিশ্বজন। সে যখন সেনাপতির মতো আদেশ করবে, "চল," তখন যে যেখানে আছে সৈনিকের মতো চলবে। যখন নির্দেশ দেবে, "থাম," তখন যে যেখানে এগিয়েছে সেইখানে থামবে। বেশি নয়, দুটি একটি কথা! সেই কথা এমন কথা যে তার জন্যে সমগ্র জগৎ উৎকর্ণ হয়ে প্রতীক্ষা করছে।

কোথায় পাবে সেই কথা, বাদল ভাবে। বিদ্যা নয় যে পুঁথি ঘাঁটলেই পাওয়া যাবে। বুদ্ধি নয় যে বুদ্ধিমানের সঙ্গে মিশলেই মিলবে। বল নয় যে ব্যায়াম করলেই লভ্য হবে। কায়িক কণ্ঠস্বর নয় যে অনুশীলন করলেই আয়ত্ত হবে। বাদল যে কণ্ঠস্বর চায়, যে বাণী চায়, তা বোবা মানুষেরও থাকতে পারে। অর্কেস্ট্রার পরিচালক কথা কন না, ইশারা করেন। অমনি বহু বিচিত্র বাদ্যযন্ত্র একসঙ্গে গর্জে ওঠে, তরঙ্গের পর তরঙ্গ ছুটে আকাশের তটে আছাড় খায়, কাঁদতে কাঁদতে পিছু হটে, সাগরের বুকে ঘুমিয়ে পড়ে।

বাদলকেও কথা কইতে হবে না, যদি ইশারায় কাজ চলে। কিন্তু সেই ইশারা হবে এমন ইশারা যে জনপারাবার উদ্বেল হবে, অথচ রক্তের ফেনায় ফেনিল হবে না। বিনাযুদ্ধে যুদ্ধের ফল, বিনা বিপ্লবে বিপ্লবের ফল, এই হচ্ছে বাদলের ধ্যান।

বাদল যে কণ্ঠস্বর চায় তা বিত্তের সঙ্গে বেখাপ। বিত্তবানের উক্তি যুক্তিপূর্ণ হলেও বিত্তহীনদের চিত্ত স্পর্শ করে না, তার পিছনে তেমন জোর নেই যেমন জোর বিত্তহীনের উক্তির পিছনে। মানুষ প্রথমেই সন্ধান করে যে কথা বলছে সে কেমন লোক, স্বার্থপর কি নিঃস্বার্থ, নিঃস্বার্থ হলে প্রমাণ কী, জীবনে প্রমাণ আছে না শুধু বক্তৃতায়, জীবনের প্রতিকর্মে প্রমাণ আছে, না দুটি একটি কর্মে। বিত্তহীনদের ভোলানো কিংবা মাতানো কঠিন নয়, কিন্তু তাদের প্রেরণা দিয়ে অনুপ্রাণিত করা, অর্কেস্ট্রার মতো পরিচালিত করা বিষম কঠিন। তাদের incite করা এক কথা, inspire করা আরেক কথা।

তা ছাড়া বিত্তবানের উক্তি কি বিত্তবানদেরই চিত্ত জয় করবে? তারা বলবে, তুমি নিজেও তো গোদোহন করছ, অন্তত দুগ্ধ পান করছ। তোমার জিহ্বাগ্রে শোষণের বিরুদ্ধে নালিশ, কিন্তু ঠোঁটের কোণে

শোষণলব্ধ ক্ষীর। ক্যাপিট্যালিস্টদের মুচকি হাসি কল্পনা করলেই বাদল লজ্জায় সঙ্কোচে ম্রিয়মাণ হয়। সে নিজে তাদের চেয়ে কোন অংশে ভালো যে তার কণ্ঠে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ বজ্রের মতো ধ্বনিত হবে? তার কণ্ঠস্বর বজ্রের মতো শোনাবে তখনি, যখন সে দুধের পাত্র ঘৃণার সঙ্গে ঠেলে তাদের শ্রেণী থেকে ছিটকে বেরিয়ে যাবে। যদি ক্ষীরের লালসায় গোদোহনে লিপ্ত থাকে তবে তার দশা হবে তার কমিউনিস্ট কমরেডদের মতো। ওদের কণ্ঠস্বর যেমন কর্কশ তেমনি ক্লীব। কেউ কানে তোলে না ওদের উক্তি, বিশ্বাস করে না ওদের যুক্তি, একটা ভিখারীও ওদের পক্ষে ভোট দেয় না, একটা ধর্মঘটও সফল হয় না ওদের দ্বারা। এর কারণ কমরেডরাও দুগ্ধপায়ী।

কমিউনিস্টদের সঙ্গে বাস করে বাদল যেমন তাদের দুর্বলতা হৃদয়ঙ্গম করেছিল তেমনি নিজের দুর্বলতাও। সেইজন্যে ওদের বিরুদ্ধে কিছু বলবার অধিকারও তার ছিল না। যেমন ওরা তেমনি সে নিজে অস্থিমজ্জায় স্বাচ্ছন্দ্যবাদী। স্বাচ্ছন্দ্য বা আরাম ছেড়ে ওরা বেশিদিন বাঁচে না, সে নিজেও বাঁচবে কিনা সন্দেহ। যুদ্ধের মাদকতায়, বিপ্লবের উন্মাদনায় সাময়িকভাবে স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দেওয়া দুঃসাধ্য নয়, কিন্তু কোনো রকম নেশা না করে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর আরামহীন জীবনযাপন মধ্যবিত্তদের সাধ্যাতীত। সত্বর একটা যুদ্ধ কিংবা বিপ্লব না বাধলে ওরা মিইয়ে যাবে, ওদের কথার সঙ্গে কাজের অসঙ্গতি ধরা পড়লে শ্রমিকরা শুধু যে ওদের অবিশ্বাস করবে তাই নয়, উপহাস করবে। বাদল ওদের সঙ্গে থেকে হাস্যাস্পদ হতে চায় না, হাসিকে তার যত ভয় ফাঁসিকে তত নয়।

তার কথা শুনে কেউ হাসছে কল্পনা করলে তার ইচ্ছা করে মাটিতে মিশিয়ে যেতে।

সে স্থির করেছিল ক্যাপিটালিজমের কোনো ধার ধারবে না, স্বাচ্ছন্দ্য যদিও তার অতীব প্রয়োজন তবু স্বাচ্ছন্দ্য পরিহার করবে। যতদিন শরীরে সইবে ততদিন অধমেরও অধম হবে, শরীর বিমুখ হলে সেও শরীরের প্রতি বিমুখ হবে। মরতে হয় মরবে, কিন্তু এমন করে বেঁচে থাকা যে মরে থাকা। অসহ্য এই অক্ষমতা, এই ক্লৈব্য। অন্যায় যে করে সে তো অপরাধী, অন্যায় যে দেখে সেও অপরাধীর সহকারী। শোষণ যারা করে তারা তো দোষীই, শোষণের প্রতিকারে যারা অক্ষম তারাও দোষের ভাগী।

একথা মনে হলেই বাদলের মাথা বন বন করে, স্নায়ু টন টন করে। কেমন একটা অহেতুক উদ্‌বেগ তাকে ভারাক্রান্ত করে। যেন এই মুহূর্তে হস্তক্ষেপ না করলে পর মুহূর্তে সৃষ্টি রসাতলে যাবে, মানবজাতি নির্বাপিত হবে। বুঝতে পারে না সে, এটা কি তার নিজের মনের বিকার, না সমাজের বিকারের প্রতিফল? Tension কি তার অন্তরে, না বাইরে? তার একার জীবনে, না ইউরোপের জীবনে? বন বন করে তার মাথা ঘুরছে, না পৃথিবী ঘুরছে?

এসব উপসর্গ নতুন নয়। অনিদ্রা তার পুরাতন রোগ। অনিদ্রার সঙ্গে মানবনিয়তির জিজ্ঞাসা যোগ দিলে প্রাণ অতিষ্ঠ হয়। এমনি অতিষ্ঠ হয়ে একদা সে গোয়েনের আশ্রমে গেল, সেখানে দেখল দুঃখমোচনের আন্তরিক প্রয়াস। বেশ তৃপ্তি পাচ্ছিল সে সেখানে, কিন্তু জানতে পেলো দুঃখমোচনের খরচ জোগায় গোলাবারুদের টাকা। দুঃখমোচন করে হবে কী, যদি যুদ্ধবিগ্রহের জালে জড়িয়ে পড়া হয়, যদি আরো দুঃখের ফাঁদে পা দেওয়া হয়? ইংলণ্ডের বা ইউরোপের

বর্তমান দুঃখ কি গত মহাযুদ্ধের প্রতিফল নয়? হতে পারে মহাযুদ্ধ নিজেই পুঁজিবাদের প্রতিফল। কিন্তু দুঃখমোচনের কোনো অর্থ হয় না যদি দুঃখের দিকেই জগতের গতি হয়।

ভস্মে ঘি ঢালবে না বলে বাদল গোয়েনের আশ্রম ত্যাগ করল। ক্রমে উপলব্ধি করল যে ব্যবস্থার পরিবর্তন চাই, ক্যাপিটালিজম সব অনর্থের মূল। বাস করতে গেল কমিউনিস্টদের সঙ্গে। তার প্রত্যয় হলো ব্যবস্থার পরিবর্তন অসম্ভব নয়, কিন্তু পরিবর্তিত ব্যবস্থায় দুঃখের নিবৃত্তি নেই, দুঃখেরও পরিবর্তন। ভাত কাপড় পেলেই যাদের দুঃখ যায় তাদের হয়তো যথালাভ, কিন্তু যেখানে কর্তার ইচ্ছায় কর্ম সেখানে কর্তার পতনে ব্যবস্থারও পতন। সোভিয়েট ব্যবস্থা ডিক্‌টেটরসাপেক্ষ হয়ে নিজের কবর নিজের হাতে খুঁড়েছে। তাছাড়া যেখানে মত-ভেদের যথোচিত পরিসর নেই, অপোজিশন নেই, সেখানে কর্তার ভুল ঘটলে শোধরানোর কী উপায়? যে ভুলের সংশোধন নেই তার শাস্তি নেই কি? ইতিহাস কি সহ্য করবে চিরকাল?

কিন্তু এ সব কারণেও বাদল কমিউনিস্টদের নাম ধরত না, যা হোক একটা কিছু পরীক্ষা তো চলছে। কিন্তু ঐ যে ওদের আশা যুদ্ধ বাধবে যুদ্ধের আনুষঙ্গিক বিপ্লব বাধবে, ওটাকে বাদল "আশা" বলে না, "আশঙ্কা" বলে। ঐখানেই ওদের সঙ্গে বাদলের ভাষার বিরোধ। ওরা যাকে ভালো বলে বাদল তাকে মন্দ বলে। উটের পিঠে শেষ কুটো কমিউনিস্টদের দুঃখমোচনের পদ্ধতি। ও পদ্ধতি বাদলের নয়। মাথা কেটে মাথাব্যথা সারানো তার মতে কুচিকিৎসা। ওটা কি একটা উপাদেয় পরিবর্তন? ক্যাপিটালিজমে যুদ্ধ নিহিত বলে সে ক্যাপিটালিজমের বিপক্ষে, কমিউনিজমেও যদি যুদ্ধ নিহিত তবে কেন কমিউনিজমের পক্ষ নেব?

২

অথচ বাদল শান্তিবাদীও নয়। শান্তিবাদীরা নির্বিবাদী। তারা যে প্রচলিত ব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্যে মনের শান্তি বিপন্ন করবে এতটুকু প্রত্যাশাও তাদের কাছে নেই। প্রচলিত ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের প্রস্তাব তাদের কারো মুখে শোনা যায় না, যা শোনা যায় তা লীগ অব নেশনস, নিরস্ত্রীকরণ, আন্তর্জাতিক পুলিশ। তাদের ধারণা সব দেশের সৈন্যদল যদি ভেঙে দেওয়া যায় তা হলে যুদ্ধের সম্ভাবনা থাকবে না, শান্তিপূর্ণভাবে লীগ অফ নেশনসের দ্বারা পারস্পরিক বিরোধ ভঞ্জন হবে। যদি কোন রাষ্ট্র লীগের সিদ্ধান্ত না মেনে নেয় তবে আন্তর্জাতিক পুলিশ গিয়ে গোলমাল থামাবে।

বাদলও এর সমর্থক, কিন্তু আগে তার যেমন উৎসাহযুক্ত সমর্থন ছিল এখন তেমন নেই। কারণ ইতিমধ্যে সে হৃদয়ঙ্গম করেছে যে যতদিন সুদ ও মুনাফা মূলধনীদের ভোজ্য হবে ততদিন ধনিক শ্রমিকের সম্বন্ধ যেন খাদ্য খাদকের সম্বন্ধ। অবশ্য ইংলণ্ডের মতো কোনো কোনো দেশে শ্রমিকদেরও হাতে দু'পয়সা জমে, তারাও তাদের সঞ্চয় ব্যাঙ্কে রাখে ও বাণিজ্যে খাটায়, কিন্তু তা সত্ত্বে মোটের উপর বলা যেতে পারে যে মালিক ও মজুর যেন খাদ্য খাদক। এই দুর্নীতিকর সম্বন্ধ যতদিন না পরিবর্তিত হচ্ছে ততদিন জগতে সত্যিকার শান্তি সম্ভব নয়। পুলিশকে দিয়ে ভয় দেখিয়ে শান্তিস্থাপন হয়তো শান্তিবাদীদের মতে মানবকল্যাণ, কিন্তু বাদলের মতে মানবের অপমান। যাদের ন্যায়সঙ্গত প্রাপ্য অপরে ফাঁকি দিয়ে ভোগ করছে তাদের প্রতি সুবিচার কিসে হয় সেই সর্বপ্রথম প্রশ্ন। আগে সে প্রশ্নের উত্তর দাও, তারপরে লীগ অফ নেশনস্ কর, আন্তর্জাতিক বিবাদ মেটাও।

আগে ঘোড়া, তারপরে গাড়ী, এই তো নিয়ম। কিন্তু শান্তিবাদীরা

ঘোড়ার সামনে গাড়ী রাখবে, গাড়ী যদি না চলে তবে গাড়ীর গলদের কথা ভেবে মাথা খারাপ করবে। যেন আরো গোটা কয়েক চাকা জুড়ে দিলে গাড়ীটা গড় গড় করে গড়িয়ে চলবে। ওদিকে ঘোড়া-দুটোর একটা আরেকটাকে কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করছে, তার বেলায় শান্তিবাদীদের বিধান—চাবুক। চাবুকটা অবশ্য শ্রমিক বেচারারই ঘাড়ে পড়বে, কেননা সে কেন চুপ করে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে না, কেন লাথি মারছে। লাথি মারা যে হাঙ্গামা। কিন্তু কামড় দেওয়া? সে কাজ অলক্ষ্যে চলে, তাই হাঙ্গামা বলে গণ্য নয়। যার যা পাওনা সে তার চেয়ে কম পাচ্ছে, তার পেট ভরছে না, এই প্রবঞ্চনা যে হাঙ্গামার চেয়েও ক্ষতিকারক, হাঙ্গামার চেয়েও দুর্নীতিকর, এ জ্ঞান যাদের আছে তারা শান্তিবাদে সান্ত্বনা পায় না। যাদের নেই তারা আগ্নেয়গিরির শিখরে বসে শান্তির বেহালা বাজায়। ভাবে লীগ অফ নেশনস্ যখন হয়েছে তখন যুদ্ধবিগ্রহের অর্ধেক আশঙ্কা গেছে, এখন কেবল নিরস্ত্রীকরণটা হয়ে গেলেই চিরস্থায়ী শান্তি। শ্রেণী সংগ্রাম? বাধলেও জমবে না। নিরস্ত্রদের সায়েস্তা করতে পুলিশ থাকবে যে!

যাহোক শান্তিবাদীদের বিরুদ্ধে কিছু বলবার অধিকারও বাদলের ছিল না। তাদের অনেকে গত যুদ্ধে জেল খেটেছে, অনেকে যুদ্ধ করে ঠেকে শিখেছে। বাদল কী করেছে যে তার কণ্ঠস্বরে নৈতিক অধিকার ধ্বনিত হবে? যার নৈতিক অধিকার নেই সে কোন অধিকারে শান্তি-বাদীদের দোষ ধরবে?

সে যুদ্ধবাদী নয়, কেননা যুদ্ধের দ্বারা দুঃখমোচন হতে পারে না। অথচ সে শান্তিবাদীও নয়, কেননা বিশ্বশান্তির দ্বারা শ্রেণীসংগ্রাম নিবারণ করা যায় না। তাহলে সে কোন মতবাদী?

বাদল ভাবে। সমর ও শান্তি ছাড়া তৃতীয় কোনো বিকল্প আছে

কি? এমন কোনো বিকল্প যার অনুসরণে পাবে যুদ্ধ না করে যুদ্ধের ফল, বিপ্লব না করে বিপ্লবের ফল? এমন কোনো বিকল্প যার সাফল্য নির্ভর করে না দলগঠনের উপর, সঙ্ঘবদ্ধতার উপর? এমন কোনো বিকল্প যা বাদলের একার সাধ্যাতীত নয়, যা বাদলের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে গ্রথিত, বাদলের বাণীর প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠ? বাদল ভাবে। ভাবতে ভাবতে তার মাথা ভোঁ ভোঁ করে, চোখে আঁধার নামে।

তর্ক করবে না বলে প্রতিজ্ঞা করলে কী হবে, আত্মসম্বরণ করতে পারে না যখন মার্গারেট বলে, "তোমার মতো যুবকরাই অবশেষে ফাসিস্ট হয়।"

"ফাসিস্ট!" বাদল অভিমানভরে অভিযোগ করে, "মার্গারেট, তুমিও! তুমিও আমায় ভুল বুঝলে! ফাসিস্ট! আমি কোনোদিন ফাসিস্ট হতে পারি! আমি! I should be the last—"

"আমি জানি," মার্গারেট বলে, "তুমি ফাসিস্টদের ঘৃণা কর। কিন্তু তার কারণ ওরা ডিক্টেটর মানে। কাল যদি ওরা ভোল বদলায়, যদি নির্বাচনে অধিকসংখ্যক আসন পায়, যদি ডেমক্রেসীর দোহাই দেয়, তুমি কি ওদের তারিফ করবে না?"

"শুধু ওদের কেন, কমিউনিস্টদেরও তারিফ করব, মার্গারেট, তোমরা যদি ডিক্টেটরশিপ ছেড়ে ডেমক্রেসীর পরীক্ষা দাও।"

মার্গারেট তার ছোট করে ছাঁটা চুল কপাল থেকে সরিয়ে বাদলের দিকে ভালো করে তাকায়। বলে, "পরীক্ষা দেবার প্রয়োজন নেই, উদ্দেশ্যসিদ্ধিরই প্রয়োজন। সেই প্রয়োজন সাধনের জন্যে যদি ডেমক্রেসীর সুযোগ নিতে হয় তবে অসঙ্কোচে নেব। মনে কোরো না ডেমক্রেসীর সঙ্গে আমাদের কোনো শত্রুতা আছে। আমাদের শত্রুরা ওর সুযোগ নিচ্ছে বলেই আমাদের ক্ষোভ।"

"কিন্তু তোমার ঐ উদ্দেশ্যসাধনের জন্যে যুদ্ধবিগ্রহের সুযোগ নেওয়া", বাদল অলক্ষিতে তর্কের সূত্রপাত করে, "আমি সইতে পারিনে, মার্গারেট। কোনো এক জায়গায় দাঁড়ি টানা উচিত। আমার মতে যুদ্ধবিগ্রহ হচ্ছে সেই নিষিদ্ধ যায়গা।"

"কেন বল তো? তোমার ভয় করে বলে?"

"না, আমি ভীত নই। গত যুদ্ধে আমি মনে মনে যোগ দিয়েছিলুম। নাবালক না হলে সশরীরে যোগ দিতুম। কিন্তু আমি অপরিমিত রক্তক্ষয়ের অপক্ষপাতী। তাতে মানবজাতির বিলোপ ঘটবে!"

মার্গারেট নির্মমভাবে বলে, "কাকে তুমি অপরিমিত বলবে? আমি বলি, যে-পরিমাণ রক্তক্ষয় না করলে উদ্দেশ্যসিদ্ধি হবে না সেই পরিমাণ রক্তক্ষয় সুপরিমিত। তার বেশি হলে অপরিমিত। কম হলেও অপরিমিত।"

বাদল চেপে ধরে। "কম হলে অপরিমিত কেন?"

"কারণ উদ্দেশ্যসিদ্ধির পূর্বে যদি তোমার নির্বেদ উপস্থিত হয়, যদি ভাব বিশ লাখ মানুষকে মরতে পাঠিয়েছি, আর পাঠাব না, তা হলে তোমার উদ্দেশ্যসিদ্ধি হলো না, অথচ তুমি বিশ লাখ মানুষের প্রাণব্যয় করলে। সেই ব্যয় একেবারেই অনর্থক, সুতরাং অপরিমিত।"

"না, বুঝলুম না।" বাদল মাথা নাড়ে।

"বুঝলে না? এত সোজা!" মার্গারেট আশ্চর্য হয়। "পরিমেয়তার বিচার উদ্দেশ্যসিদ্ধির দিক থেকে। যদি সিদ্ধিলাভ হয় তবে সব খরচটা দরকারী খরচ, মিতব্যয়। যদি না হয় তবে সব খরচটাই বাজে খরচ, অমিতব্যয়।"

"কিন্তু আর একটা দিক তো আছে। মানবজাতির বংশনাশের দিক। বিশ লাখের পর ত্রিশ লাখ, ত্রিশের পর চল্লিশ—কোথাও এক জায়গায়

থামতে হবে। নইলে উদ্দেশ্যসিদ্ধির পর কেউ ভোগ করতে বেঁচে থাকবে না।"

"থামতে যদি ইচ্ছা থাকে তবে গোড়াতেই থামতে হয়। তা হলে শান্তিবাদই শ্রেয়। কিন্তু একবার আরম্ভ করলে শেষ করতেই হবে। মাঝপথে থামলে তুমি মৃতদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবে। অথচ জীবিতরাও পরাজিত হলে পরে তোমায় ধন্যবাদ দেবে না। বাদল, মধ্যপন্থা নেই। ওটা তোমার ভ্রম।"

এই কথোপকথনের পর বাদল আরো চিন্তিত হলো। পরিমিত রক্তক্ষয় সে এতদিন সমর্থন করে এসেছে। সব যুদ্ধ যে খারাপ এমন কথা সে বলে না আধুনিক যুদ্ধ একটা সংক্রামক মহামারী বলেই তার যুদ্ধে আপত্তি। কিন্তু মার্গারেটের যুক্তি যদি অর্থবান হয় তবে পরিমিত রক্তক্ষয়ের কোনো অর্থ নেই। হয় অকাতরে রক্তক্ষয় করে পৃথিবীকে নির্মনুষ্য করতে প্রস্তুত হতে হবে, নয় উদ্দেশ্য ত্যাগ করে গোড়াতেই থামতে হবে।

৩

উদ্দেশ্যসিদ্ধির দিক থেকে দেখলে যে উপায়ে সিদ্ধিলাভ সেই উপায়ই সদুপায়, যদিও তার পরিণাম অর্ধেক মানবের বিনষ্টি। রক্তক্ষয়ের দরুণ যদি রক্তাল্পতা হয়, যদি ভাবী বংশীয়দের রক্তে ঘুণ ধরে, যদি তখন তাদের সমাজ আপনি ভেঙে পড়ে সে ভাবনা আজকের নয়। আজ শুধু লক্ষ্য রাখতে হবে উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপর।

কমিউনিস্টদের এই হ্রস্বদৃষ্টি বাদলকে ক্লিষ্ট করে, কিন্তু তাদের লজিক সে যুক্তি দিয়ে কাটতে পারে না। বিনষ্টির আশঙ্কায় যদি পেছিয়ে যেতে

হয় তবে উদ্দেশ্যসিদ্ধির কোনো সম্ভাবনা নেই, মানুষকে চিরকাল বড় লোকের দাসত্ব করতে হবে। দাসত্ব ভালো, না বিনষ্টি ভালো?

বাদলও বোঝে, দাসত্ব ও বিনষ্টি এর দুটির একটিকে বেছে নিতে বললে যার মনুষ্যত্ব আছে সে বরণ করবে বিনষ্টি। কিন্তু সত্যি কি কোনো মধ্যপন্থা নেই?

বাদল সুধীকে দেশলাই বেচতে গিয়ে সুধায়, "সুধীদা, উদ্দেশ্যসিদ্ধির যদি অন্য উপায় না থাকে তবে কি অপরিমিত রক্তক্ষয় অকাতরে করতে হবে? কাতর হলে যদি উদ্দেশ্যসিদ্ধির ব্যাঘাত হয় তবে কি কাতর হওয়াটা কাপুরুষতা? যদি লক্ষ লক্ষ লোককে মৃত্যুমুখে ঠেলে দিয়েও উদ্দেশ্যসিদ্ধি না হয় তবে উদ্দেশ্য ত্যাগ করাটা কি মৃতের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা?"

সুধী হেসে বলল, "ভগবদ্গীতা পড়ছিস বুঝি?"

"কে? আমি? আমি পড়ব তোমাদের গীতা?" বাদল উত্তেজিত হয়, "আফিং খেলে কি এতটা পথ হাঁটতে পারতুম!"

"কিন্তু গীতার মূল সমস্যা তো ও ছাড়া আর কিছু নয়। উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে অর্জুন রাজি ছিলেন সবাইকে বধ করতে, কিন্তু আত্মীয়স্বজনকে বাঁচিয়ে। আচার্য, পিতা, পুত্র, পিতামহ, মাতুল, শ্বশুর, পৌত্র, শ্যালক এবং সম্বন্ধী—এঁরা যদি অর্জুনকে বিনাশ করতেনও তথাপি তিনি এঁদের আঘাত করতেন না। শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে অশেষ বোঝালেন, শেষে বিশ্বরূপ দেখালেন, তখন তিনি নিমিত্তমাত্র হলেন। এই তো গীতা।"

বাদল বহুকাল খবরের কাগজ পড়েনি, খপ করে টেবিলের উপর থেকে থেকে "টাইমস" খানা টেনে নিয়ে অন্যমনস্ক হয়। এক সময় জিজ্ঞাসা করে, "হাঁ, কী বলছিলে? অর্জুন প্রথমটা মরতে রাজি হননি, তারপরে বীরের মতো মরলেন।"

"দূর!" সুধী তাকে আরেক দফা শোনায়। বলে, "অর্জুন উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্যে কতক দূর যেতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু চরম সীমায় যেতে পরাঙ্মুখ। তোরও সেই মনোভাব। তুই পরিমিত রক্তক্ষয়ে অগ্রসর কিন্তু অপরিমিত রক্তক্ষয়ে পশ্চাৎপদ। আমি যদি এযুগের শ্রীকৃষ্ণ হতুম তোকে সম্পূর্ণ বেহিসাবী হতে শিক্ষা দিতুম, কিন্তু আমি তোকে হিসাবী হতেও বলব না।"

"তবে তুমি কী বলবে, সুধীদা?"

"বলব উদ্দেশ্য ত্যাগ করে উপায়কে পরিশুদ্ধ করতে। উপায় বিশুদ্ধ হলে উদ্দেশ্য আপনি সিদ্ধ হবে।"

"হেঁয়ালি।" বাদল মন্তব্য করে। কিন্তু তর্ক করে না।

"তুই কাগজ পড়।" সুধী চুপ করে।

"না, সুধীদা," বাদল হাত তুলে শূন্যে বোতাম টেপে, আমি এ ব্যবস্থা সহ্য করব না। আমি একে ধ্বংস করব।"

"সে ভার," সুধী প্রত্যয়ের সহিত বলে, "ক্যাপিটালিস্টরা নিজেরাই নিয়েছে। ওরাই পরস্পরকে ধ্বংস করবে।"

"তার মানে যুদ্ধ?" বাদল জেরা করে।

"যুদ্ধ ওরা করবেই, না করে ওদের পথ নেই।"

"কিন্তু যুদ্ধ আমি হতে দেব না, হলে মানবজাতি বাঁচবে না, বাঁচলেও আধমরার মতো বাঁচবে।"

"না, বাদল," সুধী স্নিগ্ধ হাসে, "সে ক্ষমতা তোর কিংবা কারো নাই। যুদ্ধ বাধবেই, ক্যাপিটালিস্ট নেশনগুলো পরস্পরকে ফতুর করবেই, তেমনি করে এ ব্যবস্থা ধ্বসে পড়বেই। মানুষ কতো মরবে জানিনে, তবে বেঁচে থাকবে অনেক, সামলে নেবে কালক্রমে। কিন্তু ভাববার কথা হচ্ছে এ ব্যবস্থার পরিবর্তে কোন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হবে? তোর যদি

ইচ্ছা থাকে তবে তুই এ ব্যবস্থাকে ভাঙতে দিয়ে সেই ব্যবস্থাকে গড়ে তোলবার স্বপ্ন দেখ। ভাঙার কাজ সোজা, গড়ার কাজ কঠিন। তোর সমস্ত শক্তি নিযুক্ত হোক সৃজনে।"

বাদল ভেবে বলে, "কথাটা তুমি নেহাৎ মন্দ বলনি। কিন্তু ভাঙন সমাপ্ত না হলে গড়নের সম্ভাবনা সুদূর। আমার নজর immediateএর উপর।"

"আর আমার দৃষ্টি ultimateএর উপর।"

বাদল তর্ক করতে অনিচ্ছুক। সুধী তাকে খেতে ডাকে। তার পেটে ক্ষুধা, মুখে লাজ।

"যাক।" বাদল হাত ধুয়ে বলে, "তুমি আমার সেই প্রশ্নের উত্তর দাও। উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে যদি দরকার হয় তবে কি সাত কোটি খুন যাক? যদি সাত কোটি খুন মাত্রাতীত মনে হয় তা হলে কি ছয় কোটি খুনের পর উদ্দেশ্য ত্যাগ শ্রেয়?"

সুধী বিস্মিত হয়। "খুনজখমের কথা এত ভাবিস কেন, পাগল! খুন একটিও যা ছয় কোটিও তাই। একজনের দুঃখ আর একশো ষাট কোটি লোকের দুঃখ পরিমাণে একই। দুঃখের যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ নেই, তেমনি সুখেরও।"

বাদল আবার বলে, "হেঁয়ালি।"

সুধী অন্য কথা পাড়ে। তার সঙ্গে গ্রামে যেতে সাধে। বাদল ঘাড় নাড়ে।

"দর্শনশাস্ত্র পড়ে," বাদল ধোঁয়াতে ধোঁয়াতে জ্বলে ওঠে, "তোমার দর্শনশক্তি রহিত হয়েছে। খুন একটাও যা সাত কোটিও তাই! একটা মানুষ মরলে সমাজের কী ক্ষতি হয়? সাত কোটি মানুষ মরলে যে ফসল ফলানো, কলকারখানা চালানো বন্ধ হবার জোগাড়।"

সুধী বুঝিয়ে বলে, "বাদল, moral issueর বিচার ওভাবে হয় না। একজন মানুষেরও যদি বিনা দোষে প্রাণদণ্ড হয় তবে সমাজের ভিত্তি টলে। ন্যায় অন্যায় সুখ দুঃখ এ সবের বেলায় সংখ্যার গণনা অবান্তর।"

বাদলের খোরাক যদিও একটা পাখীর চাইতেও কম তবু দিনমান দেশলাই ফেরি করে দারুণ ক্ষুধা পায়। অথচ ফেরি করে যা পায় তা ক্ষুধার অনুপাতে যথেষ্ট নয়। অগত্যা তাকে বন্ধুবান্ধবের সন্ধানে বেরোতে হয়। ঠিক এমন সময় উপস্থিত হয় যখন তাদের খাওয়াদাওয়া চলেছে। ডাকলে "না" বলে, কিন্তু পীড়াপীড়ি করলে হাত ধুতে যায়।

"সুধীদা," বাদল অনুযোগ করে, "তোমার কাছে যা চাই তা মনের খোরাক, যা পাই তা দেহের। তুমি আমাকে বঞ্চিত করছ।"

"আমার সঞ্চিত যতটুকু সব তুই নে না।" সুধী বলে, "আমি যা উপলব্ধি করেছি তোর হাতে তুলে দিচ্ছি।"

"কিন্তু তুমি যে আমাকে উদ্দেশ্যত্যাগের উপদেশ দিলে, তুমি কি জান আমার উদ্দেশ্য কী?"

সুধী সবিনয়ে জানায়, "আমি যত দূর বুঝি তোদের সকলেরই উদ্দেশ্য Capitalism without capitalists. যেমন আমাদের সকলেরই লক্ষ্য English rule without Englishmen."

বাদল সবেগে মাথা নাড়ে। সুধী বলে, "তুই ওটুকু খেয়ে শেষ কর।"

"তোমাদের লক্ষ্য," বাদল বলে, "তোমরাই বোঝ, কিন্তু আমাদের লক্ষ্য তোমরা বুঝবে না। ক্যাপিটালিজম আমরা প্রথম সুযোগেই খারিজ করব। কিন্তু তার জন্যে আমি সাত কোটি প্রাণ বলি দিতে প্রস্তুত নই, আমি চাই বিনা যুদ্ধে যুদ্ধের ফল, বিনা বিপ্লবে বিপ্লবের ফল। এর জন্যে আমি অর্জন করছি আমার কণ্ঠস্বর, আমার বাণী।"

"আমি তোর সাফল্য কামনা করি, বাদল। তোর বোধিলাভ হোক, তুই সিদ্ধার্থ হ।" সুধী আশীর্বাদ করে।

"কিন্তু ক্যাপিটালিজম নয়। বুঝলে?"

সুধী হেসে বলে, "সেই কলকারখানা, সেইসব মজুর, উপরন্তু চাষাকে পিটিয়ে মজুর বানানো। ওটা ক্যাপিটালিজমের গুরুমারা চেলা।"

৪

বাদল আত্মসংবরণ করতে পারে না। "সুধীদা, তুমি কি কলকারখানার আগের যুগে ফিরে যেতে চাও?"

"না, আমি কলকারখানার পরের যুগে এগিয়ে যেতে চাই। কিন্তু সাম্যবাদের নামে কলকারখানা আমি কবুল করব না।"

"কেন, বল তো? তুমি কি রোজ দু'বেলা টিউবে বাসে চড়ে যাওয়া আসা করছ না? তোমার ঐ লোহার খাটখানায় শুয়ে কি সুনিদ্রা হচ্ছে না?"

"তা যদি জানতে চাস," সুধী সস্নেহে বলে, "তুই যেদিন থেকে নদীর বাঁধে রাত কাটাচ্ছিস সেদিন থেকে আমারও রাত কাটছে না। কিন্তু থাক ও কথা। আমি যে এ দেশের কলকারখানার উপর নির্ভর আমি তা মানছি, আমার এই নির্ভরতা কী করে নিঃশেষ হয় তাই দিন রাত ভাবছি।"

বাদল তর্ক করবে না বলে সপ্রতিজ্ঞ, কিন্তু হিসাবনিকাশও করতে হবে একদিন। এখন তার কিছুটা হয়ে থাক।

'তুমি যে কলকারখানার শত্রু তা তুমি কোনোদিন গোপন করনি। তোমার ঐ খাদির পোশাক তার জলজ্যান্ত বিজ্ঞাপন। কিন্তু সুধীদা, তোমার নিজের একটা খেয়াল তুমি তোমার দেশের উপর চাপিয়ে দিতে

পার না। চাপাতে গেলে দেশ বিদ্রোহ করবে। তুমি তো অস্ত্র দিয়ে সে বিদ্রোহ দমন করবে না, কাজেই তোমার খেয়াল তোমার সঙ্গেই লোপ পাবে। তুমি কি তা বোঝ না ?"

"বাদল, যে চোরাগলিতে তোরা ঢুকেছিস তার থেকে তোদের উদ্ধার নেই।" সুধী গম্ভীর ভাবে বলে। "তোদেরও নেই, তোদের সভ্যতারও নেই। কিন্তু আমরা ভারতের অশিক্ষিত অসভ্য গ্রাম্য নরনারী, আমরা তো তোদের মতো কলকারখানার জঙ্গলে হারিয়ে যাইনি, আমরা সংকল্প করব নিজের জমিতে নিজের ফসল ফলিয়ে নিজের হাতে কেটে নিজে রেঁধে খেতে। নিজের জমির তুলো নিজের চরকায় কেটে নেজের তাঁতে বুনে নিজে পরতে। এ যদি একা আমার খেয়াল হয় তবে এর ভবিষ্যৎ নেই। কিন্তু এটা একটা বিরাট দেশের বিশাল সমাজের নীতি।"

সুধীর স্বরে এমন একটা দৃঢ়তা মিশিয়ে থাকে যে বাদল তার উক্তি উড়িয়ে দিতে পারে না। বিচলিত হয়ে বলে, "তুমি কি বিশ্বাস কর, সুধীদা, ভারতের জনসাধারণ আধুনিক সভ্যতাকে অগ্রাহ্য করবে ?"

"বিশ্বাস করি, বাদল।"

"তাহলে বল, তোমরা দেড়শো বছর পিছিয়ে যাবে।"

"না, আমরা দেড়শো বছর এগিয়ে যাব।"

"ওটা ভাষার ঘোরপ্যাঁচ।"

"না, বাদল, আমরা সত্যিই এগিয়ে যাব, কারণ আমরা তোদের আধুনিক সভ্যতার থেকে কয়েকটি তত্ত্ব শিখেছি, সেগুলি আমাদের দেড়শো বছর আগে জানা ছিল না। এই জ্ঞান আমাদের কাজে লাগবে। তখন কেউ আমাদের যুদ্ধে হারাতে পারবে না, আমাদের বাজার কেড়ে নিতে পারবে না, আমাদের কাঁচ দিয়ে ভুলিয়ে কাঞ্চন

হরণ করতে পারবে না। আধুনিক সভ্যতার কাছে সেই কয়েকটি তত্ত্ব ছাড়া আর কিছু শেখবার নেই। আর সব আমাদের আছে।”

সুধীর প্রতীতি তার কণ্ঠস্বর ব্যক্ত হয়।

“সুধীদা, সুধীদা,” বাদল হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়, “তুমি যত কথা বললে আমি তার সমস্ত শুনিনি, কিন্তু তোমার মতো কণ্ঠস্বর কবে আমার হবে? কোথায় পাব আমার কণ্ঠস্বর?”

সুধী উত্তর দেয় না, বাদলের হাতে চাপ দেয়।

“আমি জানি,” বাদল বলে, “তোমার ও সব কথা আমার নয়। কিন্তু তোমার ঐ কণ্ঠস্বর আমারও হতে পারত। আমার বলবার আছে অনেক, কিন্তু গলা নেই।”

সুধী বাদলকে বসায়, কিন্তু সে বিদায় নেয়।

থেকে থেকে বাদলের মনে পড়ে, “বাদল, যে চোরা গলিতে তোরা ঢুকেছিস তার থেকে তোদের উদ্ধার নেই।” কোন চোরাগলি? আধুনিক সভ্যতা কি একটা চোরাগলি? বাজে কথা। কিন্তু বাজে কথাও সুধীদার কণ্ঠে কেমন জোরালো শোনায়। সুধীদার কণ্ঠে স্বর আছে, স্বরে জোর আছে।

আধুনিক সভ্যতায় বাদল মোটের উপর সশ্রদ্ধ ছিল, তার ক্ষোভ কেবল এই যে এর দ্বারা মানুষের দুঃখমোচন হচ্ছে না, মানুষের শক্তির অপচয় হচ্ছে। সুস্থ, সবল, কর্মক্ষম মানুষ বেকার হয়ে ধীরে ধীরে কর্মিষ্ঠতা হারায়, তখন সেই নিষ্কর্মাকে আহার জোগানোর ভার সমাজের। এই সব কুপোষ্যের সংখ্যা বাড়ালে সমাজের ভারসাম্য থাকে না, সমাজ উল্টে পড়ে। সেই ওলটপালটের নাম বিপ্লব। বিপ্লব এড়ানোর জন্যে প্রাতিবেশী সমাজের সঙ্গে যুদ্ধ বাধানো যে ক্যাপিটালিস্ট-দের হাতের পাঁচ এ বিষয়ে বাদলের সন্দেহ নেই, কিন্তু সে চায় তাদের

সেই চাল সময় থাকতে নিবারণ করতে। তার কমিউনিস্ট কমরেডরা তা চায় না, সুধীদার মতো শান্তিবাদী বন্ধুরাও যে চায় তাও মনে হয় না। ক্যাপিটালিস্ট, কমিউনিস্ট, প্যাসিফিস্ট, কেউ উঠে পড়ে লাগছে না, কেউ তৎপর নয়—বাদল একা যতদূর পারে করবে। যুদ্ধ বাধানোর আগেই যেন পুঁজিবাদ বরবাদ হয়, বরবাদ হবার সময় যেন রক্তারক্তির মাত্রা ছাড়ায় না। ডেমক্রেসীর খাপটা যেন আস্ত থাকে, তলোয়ার যেন সে খাপ কেটে ডিকটেটরশিপের বেখাপে সেঁধোয় না।

আধুনিক সভ্যতার বাহন যে কলকারখানা বাদলের তৎপ্রতি অনুরাগ ছিল। কয়লা, পেট্রোল, ইলেকট্রিসিটি এই তিন ভূতকে বেগার খাটিয়ে মানুষ অক্লেশে নিজের খাটুনি কমাতে পারে। এই রকম আরো গোটা কতক ভূত আবিষ্কৃত হলে মানুষ তাদের খাটিয়ে নিজে সুখে স্বচ্ছন্দে বিহার করতে পারে। আধুনিক সভ্যতার ভিত্তি যদি হয় কয়লা, পেট্রোল, ইলেকট্রিসিটি তবে কেন যে সুধীদা ওর বিরোধী তা বাদল কোনো দিন অনুধাবন করতে সমর্থ হয়নি। ভাবে, সুধীদার ওটা খেয়াল। শুনে আশ্চর্য হচ্ছে যে ভারতেরও ওটা সংকল্প। ভারত যদি সৃষ্টিছাড়া হতে চায় তো হবে। ঐ আজব দেশের নেতা যখন গান্ধী তখন ওর দুঃখমোচনের আশা অল্প। বাদল ওদেশে ফিরবে না। তবু তার আফসোস হয় যে ওদেশ কয়লা, পেট্রোল, ইলেকট্রিসিটির বনিয়াদের উপর আধুনিক সভ্যতার আকাশচুম্বী সৌধ নির্মাণ করবে না।

সুধীদা হয়তো বলবে, ভৌতিক ভিত্তির চেয়ে নৈতিক ভিত্তি বরণীয়। কিন্তু আধুনিক সভ্যতার নৈতিক ভিত্তির ত্রুটী কোথায়? সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা যদিও কার্যত বিড়ম্বিত তবু কত শত ভাবুককে, কর্মীকে, বিজ্ঞানতপস্বীকে প্রেরণা প্রদান করেছে। কার্যও

কি হয়নি? ইটালী এখন স্বাধীন দেশ, জার্মানী এখন রিপাবলিক, রাশিয়া এখন সোশ্যালিস্ট সোভিয়েট রিপাবলিকের সমবায়। লীগ অফ নেশনস হয়েছে, ইণ্টারন্যাশনাল কোর্ট হয়েছে। এসব কি তুচ্ছ করবার মতো?

বাদল স্বীকার করে না যে আধুনিক সভ্যতা একটা চোরাগলি। শোষণ আছে, শ্রেণীদাসত্ব আছে, অফুরন্ত অবিচার আছে। তা সত্ত্বেও বনিয়াদ ঠিকই আছে।

কথাটা কিন্তু বাদলকে খোঁচা দিতে থাকে। তাতে কোনো সার আছে বলে নয়, তার সঙ্গে কণ্ঠস্বর আছে বলে। সুধীদা ব্যতীত অন্য কেউ বললে বাদল কর্ণপাত করত না।

"সুধীদা," এর পরে যখন দেখা হয় বাদল সুধায়, "সেদিন যে চোরা-গলির উল্লেখ করেছিলে ওটা তেমন পরিষ্কার হয়নি। আধুনিক সভ্যতার ভৌতিক ভিত্তি যদি হয় কয়লা, পেট্রোল, ইলেকট্রিসিটি আর নৈতিক ভিত্তি যদি হয় সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা তা হলেও তুমি ওকে চোরাগলি বলবে?"

"শুনে সুখী হলুম, বাদল," সুধী জবাব দেয়, "তুই নীতির দাবী মানিস। কিন্তু সেদিন আমার বক্তব্য ছিল এই যে আধুনিক সভ্যতার গতি materialismএর অভিমুখে। আধুনিকদের মধ্যে যারা ধনিক তাদের দেবতা যে Mammon একথা কে না জানে! যারা শ্রমিক বা শ্রমিকপ্রেমিক তাদেরও দেখছি সেই দেবতা। কমিউনিজমের সঙ্গে materialism এমনভাবে জড়িয়ে গেছে যে ওর ভিতরে যেটুকু নৈতিক ছিল সেটুকুও গৌণ হয়ে গেছে। সাম্যবাদ বলতে যা বোঝানো উচিত ও কি তাই? ও তো dialectical materialism!"

বাদল ভাবে, তা হলে materialism কি চোরাগলি?

৫

"সুধীদা", বাদল ক্ষুণ্ণ স্বরে বলে, "তুমি তো ইতিহাস পড়নি, পড়লে দেখতে মেটিরিয়ালিজম পূর্ব যুগেও ছিল, এ যুগেও আছে। সেটা আধুনিকতার সমার্থক নয়। তবে গোরুর গাড়ির যুগের মেটিরিয়ালিজম ও মোটর গাড়ির যুগের মেটিরিয়ালিজম বিভিন্ন হতে বাধ্য। কিন্তু সেই বিভিন্নতার দরুণ আধুনিকতার উপর মেটিরিয়ালিজমের সমস্ত দায় আরোপ করা যায় না, সুধীদা।"

সুধী হেসে বলে, "আমার মনে থাকে না যে তুই Croceর শিষ্য। আমি কেবল অবাক হয়ে ভাবি তুই তা হলে কী করতে কমিউনিস্টদের সঙ্গে থাকিস, কেনই বা অমন করে ঘুরিস।"

"সে অনেক কথা।" ক্রোচের উল্লেখে বাদলের পূর্ব স্মৃতি উজ্জীবিত হয়। "কবে তোমার সময় হবে, তোমাকে বলব আমার মানসিক বিকাশের ধারাবাহিক বৃত্তান্ত। আজ তো সময় নেই। এক কথায় বলি, আমি আমার হিউমানিজমের দিক থেকে এখনো সব জিনিস দেখি, সব দুঃখের প্রতিকার খুঁজি—ওদের ওই মেটিরিয়ালিজমের দিক থেকে নয়। আমি যে ক্রমে ক্রমে মেটিরিয়ালিস্ট হয়ে পড়ছি তেমন আশঙ্কা নেই, কেননা ডিটারমিনিজম আমি প্রাণ গেলেও মানব না, আর ডিকটেটরশিপ আমি কিছুতেই সইব না। রক্তপাতের বিরুদ্ধে আমার মজ্জাগত প্রেজুডিস নেই, কিন্তু অপরিমিত রক্তক্ষয় আমি কোনো মতেই সমর্থন করব না। কাজেই আমি শেষ পর্যন্ত হিউমানিস্টই থাকব, বেঁচে থাকতে মেটিরিয়ালিস্ট হব না। আমার ভয় কেবল এই যে আমি যদি না দুঃখমোচনের দুঃখহীন উপায় আবিষ্কার করি তবে আমার পরেই

প্রলয়!" বাদল বলতে বলতে শিউরে ওঠে। বলে, "তখন দুনিয়ার একটিও হিউমানিস্ট অবশিষ্ট থাকবে না, সব মেটিরিয়ালিস্ট। তখন তোমার মতো শান্তিবাদীদেরও শান্তি বাদ পড়বে।"

সুধী তার সুমুখে রুটি দুধ ফল ও বাদাম রেখে তার পিঠে হাত রাখে। বাদল বিনা বাক্যে হাত ধুতে চলে।

সুধী বলে, "আমি ইতিহাস না পড়লেও মনস্তত্ত্ব পড়েছি, তোদের আধুনিকদের মন তো বুঝি। তোরা পৃথিবীর ঐশ্বর্য সম্ভার ভোগ করতে করতে সহসা বিমর্ষ বোধ করিস। ভাবিস, হায়! আমরা যা ভোগ করি সকলে কেন তা করতে পায় না! কোটি কোটি লোক কেন দিনে বারো ঘণ্টা খাটে, লক্ষ লক্ষ লোক কেন বেকার হয়, চারিদিকে এত দৈন্য কেন, কেন এত অস্বাস্থ্য! তখন তোরা নিজ নিজ রুচি অনুসারে এই ব্যবস্থার পরিবর্তন খুঁজিস, কারো সঙ্গে কারো পদ্ধতি মেলে না, কিন্তু সকলেরই মুখে একই কথা—ধনসম্পদের অভাবই মানুষের প্রাথমিক অভাব, অভাবমোচনই পুরুষার্থ। ক্যাপিটালিস্ট ও কমিউনিস্ট, এখন দেখছি হিউমানিস্ট, সকলেরই দৃষ্টি অভাবের উপর, পার্থিব অভাবের উপর। মানুষের যে আত্মা আছে, আত্মার ঐশ্বর্যে যে প্রত্যেকে ঐশ্বর্য্যবান, আত্মিক ঐশ্বর্যই যে সাড়ে পনেরো আনা, এ যদি তোরা বুঝতিস তবে বাকি আধ আনার জন্যে কেউ শ্রমিকতোষণের কথা, কেউ শ্রেণীসংগ্রামের কথা, কেউ শ্রেণীসংগ্রামের পরিবর্তে আন্তর্জাতিক সংগ্রামের কথা, কেউ বিনা যুদ্ধে ও বিনা বিপ্লবে ফললাভের কথা এমন তন্ময় হয়ে ভাবতিস নে।"

বাদল চুপ করে শোনে, প্রতিবাদ করে না। তর্ক করতে ইচ্ছা নেই, কিন্তু হিসাবনিকাশও যে দরকার।

"কিন্তু সুধীদা, ওটা যে একটা দুঃস্বপ্নের মতো বুকে চেপে বসেছে।

বাকি আধ আনাই বল, আর আঠারো আনাই বল, ওটা যে দুর্বহ সত্য।"

"পাগল", সুধী সস্নেহে বলে, "এই বললি দুঃস্বপ্ন, এই বলছিস দুর্বহ সত্য! স্বপ্ন কি সত্য?"

"যতক্ষণ স্থায়ী হয় ততক্ষণ সত্য। তুমি যদি পারো তো এই দুঃস্বপ্ন ভেঙে দাও। তা হলে আমিও মুক্তি পেয়ে আত্মার সন্ধান নিই।" এই বলে বাদল সুধীর দিকে মুমুক্ষুভাবে তাকায়।

"আত্মার সন্ধান নিলে তবেই তুই মুক্ত হবি, তার আগে নয়। যারা আত্মার সন্ধান পায় তাদের কোনো কামনা থাকে না, তাই তারা এই সংসারজ্বালা থেকে মুক্ত।"

এবার বাদল তর্ক না করে পারে না। "কিন্তু তাদের মুক্তির পরেও যদি সংসারজ্বালার অস্তিত্ব থাকে তবে তাদের মুক্তি কি স্বার্থপরতা নয়? তেমন মুক্তি কে চায়?"

সুধী ক্ষণকাল আত্মস্থ হয়। তার পরে বলে, "জ্বালা চিরকাল থাকবে। যে কারণে নক্ষত্র নীহারিকা জ্বলছে সেই একই কারণে মানুষের সংসার জ্বলছে ও জ্বলবে।"

বাদল হঠাৎ উঠে বলে, "আমি তোমার সঙ্গে দর্শনচর্চা করতে আসিনি। আমি চাই একটা হাতে কলমে সমাধান। আমার এই দুঃস্বপ্ন আমার কাছে অবাস্তব নয়, দুঃখীদের কাছে তো নয়ই। কেন তা হলে আমরা বাস্তবকে এড়াব?"

"আমি কি এড়াতে বলেছি?" সুধী স্নিগ্ধ স্বরে বোঝায়। "আমি যা বলেছি তার তাৎপর্য এই যে তুই যদি বৃহত্তর বাস্তবের সন্ধান পাস তবে তোর কাছে ক্ষুদ্রতর বাস্তব দুর্বহ বোধ হবে না।"

বাদল হাল ছেড়ে দেয়। হতাশা ভরে বলে, "দুর্বহ বোধ না হতে

পারে, কিন্তু তার অস্তিত্ব থাকবে তো ? ক্লোরোফর্ম করলে যাতনাবোধ সাময়িকভাবে লোপ পায়, কিন্তু যাতনা কি যায় ?”

“না, যাতনা যায় না। কেন যাবে ? জগতে কি আগুন থাকবে না, তাপ থাকবে না ? আমরা যে তড়িৎ দিয়ে গড়া, দহন দিয়ে ভরা।”

“গাঁজা ! গাঁজা !” বাদল পা বাড়ায়। “আফিং ! আমি ওসব শুনতে চাইনে, আমি চাই অভাবের নির্বাণ। অভাববোধের নয়, অভাবের। যা আমি statistics দিয়ে মেপে দেখতে পারব, যা দস্তুরমতো objective.”

সুধী নীরবে তার সঙ্গ নেয়। সে সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে বিড়বিড় করে, “ছোট ছেলেমেয়েদের যেমন বৃদ্ধির ওজন নেওয়া হয় তেমনি ওজন নেব প্রত্যেকের ঋদ্ধির। সুখস্বাচ্ছন্দ্য যদি বাড়ে তবেই বুঝব পৃথিবীটা বাসযোগ্য হচ্ছে। অল্পসংখ্যক ভাগ্যবানের নয়, অধিকাংশ পুণ্যবানের নয়, প্রত্যেক অধিকারবানের।”

সুধী শুধু বলে, “মেটিরিয়ালিস্ট !”

বাদল সে অপবাদ মাথা পেতে নেয়। বলে, “মেটিরিয়ালিস্ট ? বেশ, তাই !”

সুধী এক সময় তার হাতে চাপ দিয়ে বিদায় নেয়। বাদল একা চলতে চলতে ভাবে, মেটিরিয়ালিস্ট ? বেশ, তাই ! নামে কী আসে যায় ! এতদিন নিজের ও পরের নামকরণের প্রতি যতটা মনোযোগ দিয়েছি ততটা যদি বস্তুর উপরে দিতুম তা হলে হয়তো এতদিনে বস্তুর নিয়ম কানুন জেনে রাখতে পারতুম। মার্কসের মস্ত গুণ তাঁর দৃষ্টি সমস্তক্ষণ বস্তুর উপরে। অপরে কেবল শব্দের পিছনে ছুটে বৃথা শব্দ করেন। আমি মৌন হয়ে বস্তুর স্থিতি গতি ও প্রকৃতি অনুধ্যান করব। সেদিক থেকে আমি মেটিরিয়ালিস্ট, কিন্তু তা বলে মার্কস্‌পন্থী নয়।

আমাদের পন্থা স্বতন্ত্র, লক্ষ্য এক। সুধীদার মতো আধ্যাত্মবাদীরা চায় অভাববোধের অবসান, আমরা বস্তুবাদীরা চাই অভাবের অবসান। আমরা চাই অতি প্রচুর পণ্য এবং সেই পণ্যের শ্রমানুপাতে বণ্টন। প্রাচুর্যের জন্যে যন্ত্রের সহায়তা নিতেই হবে, কিন্তু যন্ত্রের উপর মালিকী করবে না ধনিক অথবা ধনিকের প্রতিনিধি রাষ্ট্র। মার্কসের সঙ্গে আমার যে পার্থক্য তা পদ্ধতিগত, আর সুধীদাদের সঙ্গে আমাদের যে পার্থক্য তা ভিত্তিগত। কেন তা হলে আমি সুধীদার কাছে এত বার যাই?

এর পরে বাদল সুধীকে পরিহার করে। সুধীর বাসায় যদি বা যায় তবে তা ক্ষুধার তাড়নায়। কিন্তু সামাজিক শিষ্টাচারের সীমা লঙ্ঘন করে না, সীমার ভিতরেও যথাসম্ভব নীরব থাকে। সুধী যদি সুধায়, "বাদল, তুই কী আজকাল ভাবিস," বাদল ধরাছোঁয়া দেয় না। সে যে মেটিরিয়ালিজমের চোরাগলিতে ঢুকেছে এ কথা বার বার শুনতে তার ইচ্ছা নেই। চোরাগলিই হোক, খোলা শড়কই হোক অভাবমোচনের ও ছাড়া অন্য পথ, নেই, তবে কিনা সে মার্কসবাদীদের সঙ্গে এক ফুটপাথে হাঁটবে না, তার ফুটপাথ স্বকীয়।

অগত্যা সুধীই মাঝে মাঝে নদীর বাঁধে গিয়ে বাদলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, কিন্তু বাদল মন খুলে কথা কয় না।

৬

মার্গারেট যখনি আসে বাদলের জন্যে কেক বিস্কুট বান্ ইত্যাদি আনে। বাদল তো রাতদিন ক্ষুধিত হয়েই রয়েছে, তাকে সাধতে না সাধতে সে আস্বাদন করে।

"ধন্যবাদ, মার্গারেট।" বাদল বলে অন্তর থেকে। তার মানে উদর থেকে।

মার্গারেট তার খাওয়া দেখে খুশি হয়, নিজেও এক টুকরা ভেঙে মুখে দেয়।

"আমি এখন বুঝতে পারি," বাদল খেতে খেতে বলে, "কেউ কেন মেটিরিয়ালিস্ট হয়। আগে আধিভৌতিক ভিত্তি, তার পরে নৈতিক বা আধ্যাত্মিক চূড়া, যদিও আধ্যাত্মিকতায় আমি চিরদিন সন্দিহান।"

"কেন, বাদল?" মার্গারেট প্রতিবাদ করে। "সন্দিহান হতে যাও কেন? আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে আমাদের কিসের বিবাদ? যার খুশি সে গির্জায় যাক, প্রাণভরে প্রার্থনা করুক, চোখের জলে ধৌত হয়ে নির্মল হোক; আমাদের কেবল দেখতে হবে আমাদের সংগ্রামের সময় ধর্মের নাম করে কেউ আমাদের বিভ্রান্ত করছে কিনা। যদি করে তবে তার রক্ষা নেই, সে বিশপ কিংবা আর্চবিশপ যেই হোক। কিন্তু গায়ে পড়ে আমরা ধার্মিকদের সঙ্গে কলহ করব না, বরং আমরা মানব যে যীশুর ধর্মে কমিউনিজমের সার তত্ত্ব রয়েছে। তিনিই তো প্রথম কমিউনিস্ট।"

"ও কথা," বাদল একটু শ্লেষ মিশিয়ে বলে, "তোমার ডায়ালেকটিকাল মেটরিয়ালিস্টদের বোঝাও গিয়ে। ওদের কমিনিউজম কেবল ক্যাপিটালিজমকে ধ্বংস করে ক্ষান্ত হবে না, সেই সঙ্গে ধর্মকেও।"

"ওদের সঙ্গে," মার্গারেট বলে, "আমার ষোলো আনা মিল নেই, তোমারও না। কিন্তু পার্টি বলে একটা জিনিস আছে ও থাকবে। আমি ওদের পার্টিতে আছি, থাকবও। কাজের দিক থেকে ও ছাড়া উপায় নেই। তুমিও ক্রমে উপলব্ধি করবে যে একলা কিছু করতে পারা অসম্ভব। কিন্তু বাদল, তোমাকে আমি পার্টিতে যোগ দিতে বলব না। আমি জানি ওর ভিতরে কত আবিলতা। আমি যদিও

পার্টির সদস্য তবু একটু দূরে দূরেই থাকি, আমার রাজনীতি বিশুদ্ধ রাজনীতি নয়।"

বাদল অনেকক্ষণ ভাবে।

"পার্টি," বাদল দৃঢ়তার সহিত বলে, "আমার জন্যে নয়। ব্যর্থ যদি হই তবে নিজের দোষে হব, কিন্তু পার্টির দোষে ব্যর্থ হতে প্রস্তুত নই। মার্গারেট, তোমার কাছে গর্ব করতে চাইনে, কিন্তু আমার সময় সময় মনে হয় যে একজন মানুষ একটা পার্টির চেয়েও বলবান হতে পারে। সেই একজন মানুষই হচ্ছে এক, অন্যান্যেরা তার পিঠের শূন্য।"

"তোমার এই ব্যক্তিত্বের গর্বেই তুমি গেলে!" মার্গারেট তার সঙ্গে একখানা বিস্কুট নিয়ে লোফালুফি খেলে। "বাদল, তুমি তলে তলে ফাসিস্ট।"

"মার্গারেট, আমি তলে তলে হিউমানিস্ট।" বাদল গম্ভীর ভাবে বিস্কুটখানা বদনসাৎ করে।

"তুমি যাই হও না কেন, তুমি যে বাদল তা আমি ভুলব না।" মার্গারেট হাসে। "কিন্তু তোমাকে ব্যর্থ হতে দেখতে ইচ্ছা করে না, সেইজন্যে বলি যে তুমি যদি এত কষ্ট সয়ে নদীর বাঁধে থাকলে তবে আর একটু কষ্ট সয়ে ডকে কাজ কর। কিংবা কারখানায়। যদি তাতেও তোমার আপত্তি থাকে তবে মুচির সাগরেদ হও, কিংবা মুদির সহকারী। এমন করে দেশলাই ফেরি করাটা যে ভিক্ষাবৃত্তি।"

বাদল রাজি হয় না।

"আমি স্বাধীন থাকতেই ভালোবাসি, মার্গারেট। মুচির সাগরেদ কি স্বাধীন? মুদির সহকারী কি মুদির অধীন নয়? তা ছাড়া নীতি দুর্নীতির প্রশ্ন আছে। কারখানায় কিংবা ডকে কাজ করলে শোষণের সঙ্গে সহযোগিতা করা হয়। আমি যদি সহযোগিতা করি তবে সেই

নিঃশ্বাসে ধ্বংসের কথা বলতে পারব না। আমার কণ্ঠস্বর জোরালো হবে কী করে, যদি আমি সহযোগিতার নিষ্ক্রয় নিই? না, মার্গারেট, শোষণের সঙ্গে আমি প্রত্যক্ষ সংস্রব রাখব না।"

মার্গারেট তাকে বোঝায় যে নীতি দুর্নীতির প্রশ্ন যদিও তুচ্ছ নয় তবু উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রশ্নই সকলের ঊর্ধ্বে।

"বুঝলে, বাদল? তুমি যে শ্রেণীচ্যুত হয়েছ ক'জন এটা পারে! তুমি পার বলেই তোমাকে বলেছি, অন্য কাউকে বলিনে। তুমি যখন শ্রেণীচ্যুত হতে পেরেছ তখন নিশ্চয় তার পরবর্তী ধাপটাও তোমার পক্ষে দুরূহ হবে না। পার্টিভুক্ত নাই বা হলে, শ্রেণীভুক্ত হও। শ্রমিক শ্রেণীতে মিশে যাও। অমন করে জলের উপর তেলের মতো ভেসে থাকাটা তোমার নিজের পক্ষে হয়তো অস্বস্তিকর নয়, কিন্তু তুমি যদি কায়মনোবাক্যে শ্রমিক না হতে পার তবে তোমাকে আমি শ্রমিকের পোশাক পরিয়ে ঠিক করিনি, তুমি ছদ্মবেশী বুর্জোয়া। তোমাকে যারা অনুসরণ করবে তারা হয়তো একদিন তোমারই মতো ফাসিস্ট হবে। ছদ্মবেশী ফাসিস্ট। রাগ কোরো না, বাদল। তোমাকে আমি পুরোদস্তুর শ্রমিক হতে দেখলেই নিশ্চিন্ত হব, নইলে আমার মনে সন্দেহ থেকে যাবে যে তুমি তোমার ওই পোশাকের দ্বারা শ্রমিকদের ভুলিয়ে ফাসিস্ট করবে। চারিদিকে শত্রুপক্ষের চর ঘুরছে, তাদেরও তোমারই মতো পোশাক। সংগ্রামের দিন তারা যদি শ্রমিকের আস্থা পেয়ে তাকে হাত করে তা হলে কি শ্রমিক কোনো দিন জিতবে? জয়ের দিক থেকে বিবেচনা করলে তোমার এই পোশাক হয়তো বিশ্বাসঘাতকের ভেক। সেইজন্যে তোমাকে মিনতি করি তুমি শ্রমের দ্বারা শ্রমিক হও।"

মার্গারেট বিমূঢ় বাদলকে মুখ খুলতে না দিয়ে আবার বলে,

"তোমার রুচি না হয় পার্টিতে যোগ দিয়ো না, কিন্তু শ্রমে যোগ দিয়ে শ্রমিক শ্রেণীভুক্ত হতেই হবে তোমাকে, যদি তুমি পোশাকের মর্যাদা রক্ষা করতে চাও। আর এ যদি হয় তোমার অভিনয়ের সাজ তবে তুমি আমার পোশাক আমাকে ফেরৎ দাও। আমি আমার শ্রেণীর সর্বনাশ ডেকে আনব না।"

মধুর ভাবে যার আরম্ভ তিক্ত ভাবে তার ইতি। বাদলকে যে কেউ বিশ্বাসঘাতক ঠাওরাতে পারে বাদল তা ভুলেও ভাবেনি।

এর পরে মার্গারেটকেও বাদল পরিহার করে, তার সঙ্গে মন খুলে কথা কয় না। তার কেক বিস্কুট তেমন ভালো লাগে না। পেটের ক্ষুধাই সব নয়, মন বিমুখ হলে মুখও বিমুখ।

এর পরে একদিন সুধীর সঙ্গে উজ্জয়িনী দেখা করতে আসে। গ্রামে যাবার প্রস্তাব শুনে বাদল বলে, "কাজ কি ভাই আমাকে টেনে? আমি কথা কইতে অপারগ, কেননা একদিন আমাকে কথা কইতে হবে। আমি কথা শুনতে অনিচ্ছুক, কেননা এতদিন আমি ও ছাড়া আর কী করেছি! কোথাও যেতে আমার রুচি নেই, কেননা যেখানেই যাই সেখানেই দেখি দুঃখ। আমাকে একা থাকতে দাও তোমরা।"

বাদল তাদের ঠিকানা লিখে নেয়।

আরো একবার সাক্ষাৎ হয় সুধীর সঙ্গে বাদলের। সুধী জানায় নীলমাধব মাঝে মাঝে বাদলের সংবাদ নেবে, বাদল যেন চেয়ারিং ক্রস অঞ্চল ছেড়ে অন্যত্র না চলে যায়। গেলে যেন সুধীকে কিম্বা নীলমাধবকে চিঠি লেখে।

"অত কথা," বাদল মাথা নাড়ে, "আমার স্মরণ থাকবে না, সুধীদা। আমি একমনে ভাবছি কেবল একটি কথা—হয় আমিই ওকে খতম করব, নয় ওই আমাকে খতম করবে। ওর সঙ্গে মানিয়ে চলা

আমার দ্বারা হবে না। আমার সঙ্গে বনিয়ে চলাও ওর দ্বারা হবার নয়।”

সুধী শঙ্কিত হয়ে সুধায়, “কাকে লক্ষ্য করে বলছিস, পাগল! উজ্জয়িনীকে?”

“না, উজ্জয়িনী নন।” বাদল সুধীকে আশ্বস্ত করে।

“তবে কে?” অন্য কোনো মেয়ে নয় তো। “মার্গারেট?” হঠাৎ প্রশ্ন করেই সুধী অনুতপ্ত হয়। কী লজ্জা! এসব বিষয়ে কৌতূহল কি সুধীর শোভা পায়!

“না, সুধীদা।” বাদল অকপটে বলে “Exploitation.”

সুধী হো হো করে হাসে। তারপর বিমর্ষ হয়। সে যে আজ বাদলের কাছ থেকে বিদায় নিতে এসেছে। আবার কবে দেখা হবে কে জানে!

৭

বাদলকে সুধী রেস্টোরাণ্টে নিয়ে গিয়ে খাওয়ায়।

“তোকে এখানে এই অবস্থায় ফেলে কোথাও যেতে আমার স্পৃহা নেই, বাদল। তবু যাচ্ছি, তার কারণ আমারও কিছু দুঃখ আছে। তাকে প্রকৃতির স্নেহধারায় গাহন করাতে চাই, স্নান করে স্নিগ্ধ হোক সে।”

“শুনেছিলুম,” বাদল অন্যমনস্কভাবে বলে, “শান্তিবাদীদের আসরে তুমি বেহালা না বাঁশরী কী যেন একটা বাজাবে।”

“হাঁ, তেমন অভিপ্রায়ও আছে।” সুধী মুচকি হাসে।

বাদলের সহসা মনে পড়ে যায়। “তোমারও দুঃখ? আমি কি সে দুঃখ দূর করতে পারিনে, সুধীদা?”

"না, পাগল। দুঃখ দেখলেই তোরা দূর দূর করিস, যেন দূর সম্পর্কের দীন কুটুম্ব। আমি কিন্তু ওকে নিকট সম্পর্কের ধনী আত্মীয় বলেই জানি। ধনী আত্মীয়েরই মতো দুঃসহ, কিন্তু ওর যা কিছু ধন তা একদিন আমারই হবে। এমন দিন আসবে যে দিন আমার এই দুর্ভোগ থেকে দুর্ চলে যাবে, তখন থাকবে কেবল ভোগ। হুল চলে যাবে, থাকবে কেবল মধু।"

"ধন্য তোমরা, দার্শনিক।" বাদল বক্রোক্তি করে। বলে, "ভলতেয়ার তোমাদেরই একজনকে অমর করে দিয়ে গেছেন, সেই চরিত্রটির নাম Pangloss."

সুধী হাসে। সেও ভলতেয়ারের "Candide" পড়েছে।

"তামাশা নয়, সুধীদা।" বাদল খেয়েদেয়ে চাঙ্গা হয়ে ওঠে। "তোমরা আছ বলেই দুঃখ আছে। তাকে তোমরা আস্কারা দিয়ে এমন বেয়াড়া করে তুলেছ যে আমরা তাকে নিয়ে জ্বলেপুড়ে মরছি। প্লেটো তাঁর কল্পিত রাষ্ট্রে কবিদের স্থান দিতে চাননি, আমি হলে দার্শনিকদেরও নির্ব্বাসনে পাঠাতুম।"

বাদল শূন্যে বোতাম টেপে। ওটা ওর মুদ্রাদোষ।

"দুঃখকে তাড়িয়ে যদি তোরা সুখী হস্ তবে দুঃখের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও আপনি সরে পড়ব, বাদল। কিন্তু যদি লেশমাত্র দুঃখ থেকে যায় তবে তোরাই আমাদের ফিরিয়ে আনবি। তোদের শোকে সান্ত্বনা দিতে, ব্যর্থতায় সার্থকতার রং ফলাতে, সংঘাতে শান্তিজল ছিটাতে আমরাই আবার আসব। আমরা যে তোদের চিরদিনের সাথী।"

বাদল ততক্ষণে অন্যমনস্ক হয়েছে। অন্য মনে বলে, "দুঃখ তোমার থাকবে না, সুধীদা, যদি সফল হই আমি। সব দুঃখেরই প্রতিকার

এই ব্যবস্থার পতন। ব্যবস্থা তো নয়, অব্যবস্থা।” এই বলে সে তার সমস্ত শক্তির সহিত শূন্যে আঙুল হানে।

“তোর জয় হোক।” বলে সুধী বিদায় নেয়।

সুধী যতদিন লণ্ডনে ছিল বাদলের অবচেতন মন জানত যে সে একা নয়, তার সুধীদা আছে, তার চির দিনের সুধীদা। সুধীর লণ্ডনত্যাগের পর বাদল মর্মে মর্মে অনুভব করতে লাগল যে সে নিরাশ্রয়।

তবে তার আর একটা অনুভূতি ক্রমে প্রখর হচ্ছিল। সারাদিন ঘোরাফেরা করে শ্রান্ত হয়ে সে যখন তারই মতো ভবঘুরেদের পাশাপাশি শয্যা পাতে তখন তার খেয়াল থাকে না যে সে বিংশ শতাব্দীর বাদল, ইতিহাসের চালক, ইনটেলেকটের প্রতিরূপ, ন্যায়পরতার কণ্ঠস্বর। নামহীন গোত্রহীন বিত্তহীন উদ্দেশ্যহীন শৈবালদের সঙ্গে সেও যেন একই স্রোতে ভাসছে। যেন শয্যাতলের মৃত্তিকাটা কঠিন নয়, সমীপবর্তী নদীজলের মতোই তরল। তখন সেই অজানা অচেনা ভবঘুরেদের মেলায় বাদল অনুভব করে অপূর্ব এক Communion—যেন সকলে মিলে এক, যেন একাধিক নয়। তার স্বাতন্ত্র্য যে কোথায় বিলীন হয়েছে বাদল সহসা সন্ধান পায় না। সে কি সংজ্ঞাবদ্ধ ব্যক্তি? না সে সংজ্ঞাতীত গণ? বাদলের কেমন যেন মালুম হয় সে যেন নুনের পুতুলের মতো মিলিয়ে গেছে সাগরে। সে আর ব্যক্তিবিশেষ নয়, সে নির্বিশেষ নৈর্ব্যক্তিক, নিবিচ্ছিন্ন এক। তার সে নিরাশ্রয়ভাব নেই, সে আর নোঙরছেঁড়া নৌকা নয়, সে পোতাশ্রয় পেয়েছে। এটা একটা প্রাপ্তি।

এই যে কমিউনিয়ন এ যদি হত কমিউনিজমের চরম লক্ষ্য তা হলে শ্রেণীসংঘর্ষের ধূমে আকাশ আচ্ছন্ন হত না। থীসিসের সঙ্গে য়্যান্টিথীসিসের

মানসিক বিরোধ মানবিক ব্যাপারে আরোপ করে কী এক কাণ্ড করে গেছেন কার্ল মার্কস! তাঁর সেই ডায়ালেকটিক মেটিরিয়ালিজম হয়েছে ইতিহাসের আধুনিকতম ভাষ্য এবং কমিউনিজমের অবলম্বন। কোথায় তলিয়ে গেছে কমিউনিয়নের ভাব, যা ছিল কমিউনিজমের আদি উপজীব্য! প্রাচীন কমিউনিজম তো মেটিরিয়ালিজমের সঙ্গে এমন ভাবে ওতপ্রোত ছিল না। তার ভিতর বিরোধের ভাব তো ছিল না। অথচ বিরোধের ভাব মার্কসীয় কমিউনিজমের গোড়ার কথা। বিরোধবিহীন জগৎ মার্কস কল্পনা করতে পারতেন না, বিরোধ আবহমানকাল চলে এসেছে ও যতদিন না শ্রেণীশূন্য সমাজ সংস্থাপিত হয়েছে ততদিন চলতে থাকবে। তা যদি হয় তবে থীসিস ও য়্যান্টি-থীসিসের লীলা কি হঠাৎ একদিন থামবে? প্রগতির শর্ত যদি হয় ডায়ালেকটিক টানাপোড়েন তবে শ্রেণীশূন্য সমাজ সংস্থাপিত হওয়ামাত্র কি প্রগতিরও বিরাম ঘটবে? শ্রেণীশূন্য সমাজের পরবর্তী ইতিহাস কীদৃশ? যে ইতিহাস যুগযুগান্ত ধরে বিরোধের ইতিহাস হয়ে এসেছে সে কি তখন থেকে হবে মিলনের ইতিহাস? না শ্রেণীশূন্য সমাজের অভ্যন্তর হতেই অভিনব বিরোধের সূত্রপাত হবে? ট্রটস্কি বনাম স্টালিন? থীসিস বনাম য়্যান্টিথীসিস?

ও লাইনে চিন্তা না করে বাদল চিন্তার স্টীয়ারিং ঘোরায়। ক্রমে ক্রমে তার জিজ্ঞাসা জাগে, ব্যক্তি তো এক একটি ঢেউ, ঢেউয়ের নিচে অনন্ত অতল জলনিধি, তবে কেন আমরা এত বেশি ব্যক্তিসচেতন? এও কি এক হিসাবে মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়া নয়? ব্যক্তিসচেতনতার মাত্রা ঠিক রেখে সমষ্টিসচেতন হলে ক্ষতি কী? অবশ্য সমষ্টিসচেতন হতে গিয়ে ব্যক্তির সত্তা অস্বীকার করা বা ব্যক্তির ইচ্ছা অগ্রাহ্য করা আর এক চরমপন্থা, সেও মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়া। দুই চরমপন্থার

মাঝামাঝি যে পন্থা সেই পন্থা বাদলের। ধরতে গেলে ইতিহাসেরও সেই পন্থা। ইতিহাসও মধ্যপন্থী, যদিও এক এক যুগে এক এক দিকে তার ঝোঁক। আধুনিক ক্যাপিটালিজম, আধুনিক কমিউনিজম কোনোটাকেই ইতিহাস সহ্য করবে না, কেননা দুটোই দু'রকম চরম পন্থা। ইতিহাস দক্ষিণপন্থী বামপন্থী নয়। ইতিহাস মধ্যপন্থী। ব্যষ্টিকে ডাইনে রেখে সমষ্টিকে বামে রেখে সে এই নদীর মতো এঁকে বেঁকে চলেছে। তার সেই আঁকাবাঁকা গতিকে যদি বলা হয় থীসিস ও য়্যান্টিথীসিস তবে বাদলের মতে ব্যষ্টি হচ্ছে থীসিস, সমষ্টি হচ্ছে য়্যান্টিথীসিস। কিন্তু তা বলে তাদের মধ্যে সত্যি কোনো বিরোধ নেই। যা আছে তা মাত্রাতিক্রম। নদী যেমন এ কূল ভাঙে, ও কূল গড়ে, তারপর ও কূল ভাঙে, এ কূল গড়ে ইতিহাসও তেমনি কখনো ব্যষ্টিকে প্রাধান্য দেয়, কখনো সমষ্টিকে। দিনের বাদল ব্যক্তিসচেতন, রাতের বাদল গণসচেতন। ইতিহাসও তেমনি।

এই তত্ত্ব আবিষ্কার করবার পর বাদল কতকটা শান্তি পায়। সে যদি মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছেড়ে শ্রমিক শ্রেণীতে না মিশে যায় তা হলেও সে ইতিহাসের সঙ্গেই চলবে, ইতিহাস যে অভিমুখে চলেছে সেই অভিমুখেই চলবে। ইতিহাসের বাইরে পড়বে না, ইতিহাসের বিরুদ্ধতা করবে না। ধনিকদের শোষণ বন্ধ করবে, কিন্তু তাদের ধনেপ্রাণে মারবে না। শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা পাওয়াবে, কিন্তু অন্য সকলের মাথার উপর দিয়ে রাজ্য চালাতে যাওয়াবে না। তার নেতৃত্ব পদে পদে মাত্রা মানবে, তবেই এ সংসারে ন্যায়ের জয় আনবে। তার লক্ষ্য সোশ্যাল জাসটিস—ধনিকরাজের পরিবর্তে শ্রমিকরাজ নয়।

মার্গারেটকে যেই এ কথা বলা অমনি সে টিটকারি দিয়ে বলে, "তোমাকে এক জোড়া গোঁফ কিনে দেব, আব একটা বোলার টুপি।

তা হলে তুমি হবে দোসরা নম্বর চার্লি চ্যাপলিন। তোমার এই হাস্যকর ফাসিজম সার্কাসেই সাজে, কাজেই তোমাকে পরতে হবে সার্কাসের সাজ। চার্লির সার্কাস ছবিখানা তুমি দেখনি ?"

বাদলের দু'চোখ জলে ভাসে। হায় রে! এরা কী মূঢ়! ইতিহাসের বাদল-নেতৃত্ব হেসে উড়িয়ে দেয়! সে যদি যীশু হত তা হলে বলত, পিতা, পিতা, এদের ক্ষমা কর, এরা জানে না এরা কী করছে! কিন্তু সে দোসরা নম্বর যীশুও নয়, চার্লিও নয়। সে পয়লা নম্বর বাদল। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলে, "মার্গারেট, আমি হয়তো বাঁচব না। কিন্তু তোমরা দেখবে আমার কথাই ফলবে। জয় হবে অন্য কোনো বাদলের।"

৮

মার্গারেট করুণায় আর্দ্র হয়।

"আমি জানি তুমি কষ্ট পাচ্ছ। কিন্তু তুমি কষ্ট পাচ্ছ বলে কি দিনের সূর্য রাত্রে উদয় হবে ? যেমন প্রকৃতির নিয়ম তেমনি ইতিহাসের বিধান। ব্যক্তির দুঃখকষ্টের প্রতি ভ্রূক্ষেপ নেই ওর।"

মার্গারেট একটু থেমে একটু দ্বিধার স্বরে বলে, "বাদল, তুমি ফিরে যাও।"

"ফিরে যাব!" বাদল বিস্মিত হয়। "কোন চুলায় ?"

"যেখানে খুশি। দেশে। কিংবা বাসায়।"

বাদল দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। অকারণে কাঁপতে কাঁপতে বলে, "মানবতনয়ের দেশ কোথায়! যেখানে তার কাজ সেইখানে তার দেশ। আর বাসা! পাখীর আছে নীড়, শেয়ালের আছে বিবর, কিন্তু মানব-তনয়ের নেই মাথা রাখবার ঠাঁই।"

"আমি জানি। জানি বলেই তোমায় নিবৃত্ত হতে বলি।" মার্গারেট প্রত্যয়ের সহিত বলে, "হবার যা তা ব্যক্তির দ্বারা হবার নয়। হবে সমষ্টির দ্বারা। তুমি যদি সমষ্টির অঙ্গীভূত হতে তবে তোমার দুঃখকষ্টের সার্থকতা থাকত, ভাই। কিন্তু তুমি শ্রমিকের সাজ পরলেও কারখানায় কাজ করবে না, শ্রমিকদের থেকে অভিন্ন হবে না। তোমার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য তোমার কাছে এত মূল্যবান যে তুমি কোনো সমষ্টিগত প্রয়াসে চোখ বুজে গা ভাসিয়ে দেবে না, সমস্তক্ষণ সমালোচনা করবে। এমন মানুষকে দিয়ে ইতিহাসের উদ্দেশ্যসিদ্ধি নৈব নৈব চ।"

বাদল আজকাল থেকে থেকে কাঁপে। সে যে কাঁপে তাই সে জানে না। কেন কাঁপে তা কী করে জানবে। শীতকাল নয়, সুতরাং এ কাঁপুনি সম্পূর্ণ অসাময়িক।

"তার চেয়ে তুমি যাও, আইন পড়, ব্যারিস্টার হও। কিংবা বই লেখ, অধ্যাপক হও। ব্যারিস্টার অথবা অধ্যাপক হয়েও তুমি আমাদের সাহায্য করতে পার। ক্রিপস, ল্যাস্কি, কোল—এঁরা কি কম সাহায্য করছেন?"

"কাকে বোঝাব! কে বুঝবে!" বাদল হতাশভাবে বলে। "আমি যে বাদল। আমি যে দায়ী। যদি একমুহূর্তের জন্যেও মনে করতে পারতুম যে আমার কোনো দায়িত্ব নেই, কিংবা আমার দায়িত্ব আর দশজনের চেয়ে বেশি নয়, তা হলে কী সুখীই যে হতুম! ক্রিপ্‌সের পিতা লর্ড, লাস্কির পিতা বণিক। আমার পিতা তত বড় না হলেও আমি তাঁর একমাত্র উত্তরাধিকারী। ইচ্ছা করলে আমি ব্যারিস্টার, প্রোফেসর, ম্যাজিস্ট্রেট, এডিটর হতে পারি। কিন্তু আমার ইচ্ছা পূর্ণ হলে আমি সেই সিস্‌টেমেরই একটি চাকা হব যে সিস্‌টেম জগন্নাথের রথের মতো শোষিতদের বুকের উপর দিয়ে চলেছে।" বাদল যেন একটু

তিক্ত স্বরে বলে, "পুঁজিবাদের ভূরিভোজনে উদরপূর্তি করে তার নিন্দাবাদ উদ্গার করা আমার দ্বারা হবে না, মার্গারেট।"

দুজনেই নিস্তব্ধ থাকে।

বাদল নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে। "অথচ এমন নয় যে আমি পুঁজিবাদের কাছে প্রার্থী হয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়েছি। যারা একটা সামান্য অনুগ্রহ পেলে স্বেচ্ছায় ক্যাপিটালিজমের চাকা হয়, পায়নি বলে চোখ রাঙায়, আমি তাদের একজন নই। তা হলে আমি কী? আমি বাদল। আমি বিংশ শতাব্দীর মুক্ত মানুষ। আমি দেখছি আমার ভাইরা মুক্ত নয়। তারা একটা অপচয়শীল সমাজব্যবস্থার দাসত্ব করছে—মজুরিদাসত্ব, ওয়েজ স্লেভারি। এই দাসত্ব আমি সইতে পারিনে বলে পিতার উত্তরাধিকার পরিত্যাগ করেছি। আমি এব্রাহাম লিংকনের উত্তরাধিকারী। উনবিংশ শতাব্দীতে তিনি যা করেছিলেন, বিংশ শতাব্দীতে আমি তাই করব। তিনি তাঁর কৃষ্ণাঙ্গ ভাইদের মুক্তি দিয়েছিলেন, আমি আমার মজুর ভাইদের মুক্তি দেব। আমার কাছে ইতিহাসের তাৎপর্য এই।"

বাদলের হাত, কাঁধ, ঘাড় কাঁপতে থাকে।

"আমি মুক্তিদাতা বাদল। আমার যেদিন শক্তি হবে, সেদিন আমি মুক্তি দেব। কী করে আমার শক্তি হবে, কবে আমার শক্তি হবে, সেই আমার একমাত্র ভাবনা। আমার এই একাগ্রতা নষ্ট হবে যদি আমি কারখানার শ্রমিক হই। মনে কোরো না, মার্গারেট, যে আমি শ্রমের ভয়ে কাতর।"

এই বলে বাদল অতি দুঃখে হাসে।

"শ্রমের ভয়ে কাতর, তেমন ইঙ্গিত করিনি বাদল।" মার্গারেট শশব্যস্তে বলে। "বলেছি, সমষ্টির মধ্যে স্বাতন্ত্র্য বিলোপের শঙ্কায় ঘাটে

বসে তুমি সমালোচনা করবে, ঘটনার স্রোতে গা ভাসানো তোমাকে দিয়ে হবে না। অন্যায় বলেছি, ভাই?" সে স্নিগ্ধ নয়নে তাকায়।

"না, যথার্থ বলেছ। ঘটনার স্রোতে গা ভাসানো বাদলদের দিয়ে হবার নয়।" বাদল সাহঙ্কারে বলে, "কারণ ঘটনার স্রোত যে বাদলদের আয়ত্তে। ইতিহাস হচ্ছে অশ্ব, বাদলরা অশ্বারোহী। ঘোড়া তার সওয়ারকে ফেলে কত দূর যাবে? ঘোড়া বোঝে তাকে অগ্রগতির স্বাদ দিতে পারে তার নিজের খেয়াল নয়, তার সওয়ারের মর্জি। ঘটনার স্রোত উজান বয়ে আমাদের ঘাটে ফিরবেই। কারণ আমরাই জানি আমাদের শতাব্দীর প্রয়োজন কী, আর কিসে প্রয়োজন মিটবে।"

বাদলের কণ্ঠ কাঁপে। সে ক্লান্ত হয়ে মাথা নোয়ায়।

"তোমার কি কোনো অসুখ করেছে, বাদল?"

"কই, না।"

"তবে তুমি অমন করে কাঁপছ কেন?"

"কই, কাঁপছিনে তো।"

"বোধহয় উত্তেজনায় কাঁপছ। তা হলেও তোমার কিছু দিনের জন্যে বাসায় ফেরা উচিত। তোমাদের সেই আস্তানা আছে না গেছে?"

"কে জানে! থাকলেও সেখানে ফেরার কথা ওঠে না। সেখানে," বাদল ইতস্তত করে, "আমার একাগ্রতা রক্ষা করা কঠিন। একটি মেয়ে—"

মার্গারেট মুচকি হাসে।

বাদল অপ্রতিভ হয়ে আমতা আমতা করে। জেসী কি একাগ্রতার ক্ষতিই করত? একাগ্র হতে সহায়তা করত না? গৌতমের যেমন সুজাতা বাদলেরও তেমনি জেসী নয় কি? যশোধরা ও সুজাতা ইহু

এসেছে তার জীবনে। তা সত্ত্বেও যদি সে সিদ্ধার্থ না হয়ে থাকে তবে তাদের কী দোষ!

জেসীর জন্যে তার মন কেমন করে। তপস্বীকে ক্ষুধার মুখে পথ্য দিয়ে, পায়স দিয়ে, যে সুজাতা তন্ময় রাখত তাকে সে ঠিকানা পর্যন্ত জানায়নি। জানালে যদি সে রাত্রে হাজির হয়!

"একটি মেয়ে," বাদল গুছিয়ে বলে, "আমার সেবা করত। কিন্তু কারো সেবার ঋণ আমি গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত। ঋণশোধের কথা ভাবতে গেলে আমার ভাবনা মাটি-হয়।"

"ঋণশোধের কথা ভাবতে চাও কেন?" মার্গারেট আশ্বাসনা দেয়। "তুমি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী বলেই তোমার মনে ও প্রশ্ন। আমিও অসংখ্য ঋণে ঋণী। কিন্তু সে ঋণ আমি সমষ্টির কাছ থেকে নিয়েছি, সমষ্টিকে শোধ দেব। বাতাস কি আকাশের কাছে ঋণী হয়, না ঋণী থাকে?"

বাদল অন্যমনস্ক। জেসীমনস্ক।

"বাদল, তুমি নিজেকে ব্যক্তিবিশেষ মনে করে নিজের ও পরের হৃদয় ভাঙছ। অমন করে তুমি শক্তিও পাবে না। শক্তি আসে নানা সূত্র থেকে। ঋণ গ্রহণ করব না বলে পণ করলে শক্তিকেই বর্জন করা হয়। তুমি যদি মনে করতে যে তুমি ঝড় কি বিদ্যুৎ কি অন্য কোনো নৈসর্গিক আধার তা হলে শক্তি তোমার ভিতরে আপনি সঞ্চারিত হত, সঞ্চার করত স্বয়ং প্রকৃতি, স্বয়ং ইতিহাস। সে শক্তি তুমি বিচ্ছুরিত করে নিঃশেষিত হতে গ্রহতারার মতো। বর্ষণ করে ফুরিয়ে যেতে বাদলের মতো। তোমার নাম তো বাদল, ব্যবহার কেন অন্যরূপ?" মার্গারেট রহস্য করে।

এ তর্ক আরো কয়েক বার হয়েছে। বাদল ও মার্গারেট পরস্পরকে ভজাতে চেষ্টা করেছে, সফল হয়নি।

"থাক, মার্গারেট,তুমি আমাকে ঠিক বুঝবে না।" বাদল হাল ছেড়ে দেয়। "তোমার মতে ব্যক্তির নিজের কোনো মূল্য নেই, সে সমষ্টির মূল্যে মূল্যবান, যেমন সূর্যের মূল্যে তার কিরণ। পক্ষান্তরে ব্যক্তিই আমার মতে মূল্যের পরিমাপক। সমষ্টির কল্যাণ, সমাজের সুখ, সবই শেষ বিশ্লেষণে ব্যক্তির কল্যাণ, ব্যক্তির সুখ। তবে কিনা তোমরা বিশ্লেষণবিমুখ। পাছে তোমাদের সংহতিবোধ দুর্বল হয়! পাছে ব্যক্তিকে একবার আমল দিলে প্রাইভেট প্রপার্টি মেনে নেওয়া হয়!"

বাদলের শ্লেষ যথাস্থানে পৌঁছায়। মার্গারেট আরক্ত হয়ে বলে, "আগে প্রাইভেট প্রপার্টি নির্বংশ হোক, উত্তরাধিকার উঠে যাক। সব সম্পত্তি সমাজের হোক, উপস্বত্বের অধিকার যাক ঘুচে। তার পরে ব্যক্তির মূল্য সম্বন্ধে দার্শনিক বিচার চলুক, আম র আপত্তি নেই।"

৯

দার্শনিক বিচারে সমষ্টিরও মূল্য আছে, সে মূল্য ব্যক্তির মূল্যেরই মতো আন্তরিক। কিন্তু ব্যবহারিক জগতে সমষ্টি একটা খণ্ডের অতিরঞ্জন। কমিউনিস্টদের মুখে সমষ্টি মানে তো শ্রমিকশ্রেণী। শ্রমিক শ্রেণী মানে তো কমিণ্টার্ন। কমিণ্টার্ন মানে তো স্টালিন। অতএব সমষ্টি মানে একজন একচ্ছত্র পুরুষ, একজন ডিক্টেটর। রোমান ক্যাথলিকরাও সমষ্টির মহিমা কীর্তন করে। তাদের মুখে সমষ্টি মানে খ্রীস্টরাজ্য। খ্রীস্টরাজ্য মানে রোমক সম্প্রদায়। রোমক সম্প্রদায় মানে রোমান চার্চ। রোমান চার্চ মানে পোপ বা পিতা। অতএব সমষ্টি মানে একজন হর্তা কর্তা বিধাতা, একজন ডিক্টেটর। বিশ্লেষণ করলে সমষ্টি দাঁড়ায় ডিক্টেটরে।

বাদল কিনা মৌনব্রতী। তাই তর্ক করে না। বলে, "আচ্ছা, সে সব পরে হবে। আপাতত দাসমুক্তি আমাদের উভয়েরই লক্ষ্য। কেবল পদ্ধতি ভিন্ন।"

মার্গারেট হেসে বলে, "কেবল পদ্ধতি ভিন্ন নয়, লক্ষ্যও ভিন্ন। গত শতকে যারা দাসদের মুক্ত করেছে তারা এখনো তাদের উপর প্রভুত্ব করছে। এ কালে যাদের তুমি দাস বলে অভিহিত করলে—আমি মনে করি, অপমান করলে—তোমরা যে তাদের মুক্তির পরেও তাদের উপর প্রভুত্ব করবে না তার গ্যারাণ্টি কে দেবে?"

বাদল ভেবে বলে, "গ্যারাণ্টি কি কেউ দিতে পারে? মুক্তিই সাম্যের গ্যারাণ্টি।"

"উঁহু!" মার্গারেট ঘাড় নাড়ে। "শ্রমিককে সাম্যের গ্যারাণ্টি দিতে পারে শ্রমিকশ্রেণীর একাধিপত্য। কোনো মিশ্র শাসন নয়, অবিমিশ্র শ্রমিক শাসন। প্রোলিটারিয়ান ডিকটেটরশিপ। আমি জানি তুমি ডিকটেটরশিপ পছন্দ কর না। আমিও করিনে। কিন্তু শ্রমিকরা যতদিন শিক্ষিত না হয়েছে ততদিন তাদের স্বার্থরক্ষার জন্যে ডেমক্রেসী স্থগিত রাখতে হবে। চিরকালের জন্যে নয়, শ্রমিকরা যতদিন না মেজরিটি পাবার কলকৌশল অবগত হয়েছে তত দিন। তারপরে যখন ডেমক্রেসী হবে তখন দেখবে প্রতি নির্বাচনে শ্রমিকদেরই মেজরিটি, তাদেরই অপ্রতিহত প্রভুত্ব।"

বাদল মর্মাহত হয়। সমাজে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা হোক এই সে চায়। ন্যায়ের রাজত্ব বলতে যদি শ্রমিক রাজত্ব বোঝায় তবে সোশ্যাল জাসটিসের ধুয়া ধরে সত্যকে ঢাকা দেওয়া কেন? খোলাখুলি বলে ফেলা ভালো, আমরা ন্যায় বুঝিনে, মুক্তি বুঝিনে, আমরা বুঝি আমাদেরই চিরস্থায়ী একাধিপত্য। পার্লামেণ্টে প্রবেশ পাচ্ছিনে বলে ডিকটেটরশিপের রব

তুলেছি, ডিকটেটরশিপ নিষ্কণ্টক হলে ডেমক্রেসীতে রূপান্তরিত হবে। যখন সব লাল হয়ে যাবে তখন কেই বা শ্রমিক, কেই বা ধনিক! তখন শ্রেণীশূন্য সমাজ। তেমন সমাজে ব্যক্তিকেও উত্তরাধিকার ব্যতীত অন্যবিধ অধিকার ছেড়ে দিতে বাধবে না।

বাদলের স্বগতোক্তি শুনে মার্গারেট বলে, "কতকটা বুঝেছ। কিন্তু যা নিয়ে তোমার এত মাথাব্যথা তা নিয়ে আমরা সত্যি এত ভাবিনে। ডিকটেটরশিপ হবে কি ডেমক্রেসী থাকবে, ব্যক্তির কোন কোন অধিকার কেড়ে নেওয়া হবে ও কোন কোন অধিকার ছেড়ে দেওয়া যাবে, এসব প্রশ্ন পরের কথা। আমাদের প্রথম চিন্তা বলপরীক্ষা। আপাতত একমাত্র চিন্তা, সর্বগ্রাসী চিন্তা। ইতিহাস যদি হঠাৎ আমাদের বলপরীক্ষার সুযোগ দেয় আমরা কি জিতব? না ইলেকশনের মতো তাতেও হারব? ইতিহাসের উপর বরাত দিয়ে বসে আছি যে, ইতিহাস কি আমাদের সাহায্য করবে, যদি আমরা নিজেদের সাহায্য না করি? পার্টি লাইনের সঙ্গে আমার লাইন মিলছে না, বাদল। এ কথা তোমাকে কানে কানে বলছি। তর্কের সময় কিন্তু কান ধরে বলব যে ইতিহাস আমাদের জিতিয়ে দেবেই, জয়ের প্রথম কিস্তি রাশিয়ায় দিয়েছে।"

দুজনেই হাসে।

বাদল বলে, "তা হলে শক্তির চিন্তাই আমাদের দুজনেরই প্রথম চিন্তা, একমাত্র চিন্তা, সর্বগ্রাসী চিন্তা।"

মার্গারেট উদাসকণ্ঠে বলে, "তা ছাড়া আর কী!"

"কিন্তু এক্ষেত্রেও তোমার সঙ্গে আমার পথভেদ। আমি চাই বিনা বিপ্লবে বিপ্লবের ফল, বিনা যুদ্ধে যুদ্ধের ফল।"

"খবরের কাগজে যেমন থাকে বিনামূল্যে ওষুধ বা সাবান।"

"যাও! কিসের সঙ্গে কিসের তুলনা!"

"তুলনা ঠিকই হয়েছে, বাদল। বিনা বিপ্লবে বিপ্লবের ফল, বিনা যুদ্ধে যুদ্ধের ফল হচ্ছে ম্যাজিক। ও দিয়ে ছেলে ভোলানো চলে, কিন্তু এ যুগের মানুষ তো শিশু নয়। ও ফল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলবে, দূর ছাই।"

"কিন্তু," বাদল কাতরভাবে বলে, "আমি যে ফলের কথা বলেছি তা সত্যিকার ফল।"

"সত্যিকার ফল," মার্গারেট নির্দয় স্বরে বলে, "মিথ্যাকার গাছে ফলে না। বিনা বিপ্লবে রাজ্যলাভ যেন বিনামূল্যে সোনার ঘড়ি ও চেন। ঘড়িটা অচল, সোনাটা গিলটি।"

বাদল বিমর্ষ হয়। মার্গারেট ওঠে।

"রাজ্যলাভ বললে যে," বাদল জিজ্ঞাসা করে, "রাষ্ট্র করায়ত্ত না করে কি বর্তমান ব্যবস্থার পতন ঘটানো যায় না?"

"পতন ঘটানো কি একদিনের কাজ!" মার্গারেট যাবার সময় বলে যায়। "কিসের পতন সেটা বিবেচনা কর। রাজার কিংবা রাজমন্ত্রীদের পতন হয়তো একরাত্রের মামলা। তেমন বিপ্লব শত শত হয়েছে। কিন্তু আমাদের বিপ্লব তেমন নয়। আমরা চাই যেখানে যত কোম্পানী আছে ব্যাঙ্ক আছে দোকান আছে জমিদারি আছে তেলের খনি ও রবারের বাগান আছে রেললাইন ও জাহাজের কারবার আছে সমুদয় প্রতিষ্ঠানের পতন—এই অর্থে যে সমুদয় পাতত হবে ধনীর হস্ত হতে শ্রমীর হস্তে, ধনীদের রাষ্ট্রের হস্ত হতে শ্রমীদের রাষ্ট্রের হস্তে।" মার্গারেট করুণ হেসে বলে, "এক রাত্রির নয়, এক শতাব্দীর কাজ। চিরস্থায়ী একাধিপত্যের কথা যখন বলি তখন সব দিকে ভেবেই বলি। এক শতাব্দী ধরে ভাঙাগড়া চললে পরে নতুন ব্যবস্থায় নতুন মানুষ তৈরি হবে। আমার সেইসব মানস সন্তানের জন্যে প্রাণপাত করে যাব আমি। গুড বাই"

মার্গারেটকে দেখলে মনে হয় মূর্তিমতী ট্র্যাজেডী। কার সঙ্গে উপমা দেবে চিন্তা করলে মনে পড়ে গ্রেটখেনকে। ও নামে সে ওকে কতবার ডেকেছে। কিন্তু গ্যয়টের গ্রেটখেন তো শেষপর্যন্ত স্বর্গে উপনীত হয়, মর্ত্যের ট্র্যাজেডী হয় স্বর্গের কমেডী। না, গ্রেটখেন নয়, য়্যান্টিগোনি। সোফোক্লিসের য়্যান্টিগোনি।

বাদল ওর হাতে হাত রেখে বলে, "Good-bye, Antigone."

সেকালে লড়াই হত সিংহাসনের জন্যে। যে জয়ী হত সে সিংহাসনে বসত। একালে যুদ্ধ বাধবে রাষ্ট্রের জন্যে। যোদ্ধারা এক একজন ব্যক্তি নয়, এক একটা শ্রেণী। যারা জিতবে তারা রাষ্ট্র হাতে পাবে এবং রাষ্ট্রের সামর্থ্য দিয়ে পরাজিতকে পদানত করবে। বাদল শিউরে ওঠে।

যারা পদানত হবে তারা কি পড়ে পড়ে সহ্য করবে? চক্রান্ত করবে না, বিদ্রোহ করবে না? তবে এর বিরতি কোথায় ও কবে? শতবর্ষ ধরে যদি হানাহানি চলতে থাকে পুনর্গঠনের কতটুকু আশা? যারা ডান হাত দিয়ে লড়বে তারা বাম হাত দিয়ে গড়তে গেলে শিব গড়বে না বাঁদর গড়বে? যদি ডান হাত দিয়ে গড়তে বসে বাম হাত দিয়ে লড়তে পারবে কি?

বাদল বিশ্বাস করে না যে শ্রমিকরাজকে কেউ দশটি বছরও নির্বিবাদে গঠনের কাজ করতে দেবে। রাশিয়ায় দেয়নি, সেখানে বিসম্বাদ লেগেই রয়েছে। বলপ্রয়োগের দ্বারা কাজ করিয়ে নেওয়ার নীতি হচ্ছে বাঁদর গড়ার নীতি। বাঁদর গড়ে হবে কী?

অন্ধকার। চারিদিকে অন্ধকার। বাদলের মনে হয় পায়ের তলায় মাটি কাঁপছে। সে হাঁটতে হাঁটতে থমকে দাঁড়ায়। টাল সামলে নেয়। তবু তার ভয় থাকে হয়তো পড়ে যাবে।

মানবের ভাগ্যে কী আছে কে জানে! যাই থাক বাদলকে দিয়ে

যেতে হবে মধ্যপন্থী সমাধান। যাতে শোষণের প্রতিকার হয় অথচ অপচয় বাঁচে। যাতে দুই হাতই গঠনের কাজে লাগে। ইতিহাসের ডায়ালেকটিকাল প্রোসেস একটা দুঃস্বপ্ন, একটা অসত্য। অনবরত সংঘর্ষের ঘর্ষণে ইতিহাসের রথ চলে এ কথা হয়তো যথার্থ হত, যদি বাদলরা না থাকত। মার্ক্‌স্‌ ভুলে গেছেন যে বাদলরা আছে। তারাই ইতিহাসের সারথি। তারা থাকতে সংঘর্ষের প্রয়োজন হয় না। নিতান্তই যদি প্রয়োজন হয় তবে বাদলরা তার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে।

মানুষের হিতাহিত বুদ্ধি তাকে সমস্তক্ষণ মধ্যপন্থার প্রবর্তনা দিচ্ছে, তাই এত যুদ্ধবিগ্রহ সত্ত্বেও মানুষ লয় পায়নি। বাদলরাই বিষটুকু কণ্ঠে ধারণ করে মানুষকে বিসর্প থেকে রক্ষা করে এসেছে। লিংকন যদি প্রাণের বিনিময়ে নিগ্রোদাসপ্রথা রহিত না করতেন তবে আমেরিকার গৃহবিবাদ কোথায় গিয়ে ঠেকত কে জানে! বাদলও প্রাণ দিতে পেছপাও হবে না। প্রাণের বিনিময়ে মজুরিদাসপ্রথা উচ্ছেদ করবে। সব মানুষকে সমান করে দেবে, সমান অর্থে স্বেচ্ছাধীন কর্মী। বাদলের কল্পিত সমাজে সকলের পারিশ্রমিক হয়তো সমান হবে না, কারণ সবরকম কাজের একই রকম পারিশ্রমিক সমাজ সম্ভবত স্বীকার করবে না। কিন্তু কাজ বেছে নেবার ও পেট ভরে খাবার সুযোগ পাবে সকলে।

১০

সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার সেই যে ফরাসী আদর্শ তাই বাদলের অন্তরে মুদ্রিত রয়েছে। সে যদি অষ্টাদশ শতাব্দীশেষে প্যারিসে উপস্থিত থাকত তবে সুপ্রসিদ্ধ বৈপ্লবিক সংস্থা Cordeliers ক্লাবের

সদস্য হত। যতদিন বাদলরা ওর চালক ছিল ততদিন ওর দ্বারা ইষ্টই হয়েছে, অনিষ্ট হয়নি। খোলা চোখ ছিল ওর প্রতীক। চক্ষুমানরা রক্ষীর মতো সজাগ থাকত কখন মানবের মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ হয়। যদিও তারা মধ্যবিত্ত তথাপি তারা জনসাধারণের সঙ্গে একাত্ম হতে পেরেছিল। তাই জনতাও তাদের আপন বলে জেনেছিল। নিতান্ত প্রয়োজন না দেখলে তারা বিদ্রোহের প্ররোচনা দিত না, যখন দিত তখন সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো প্যারিসের জনতা গর্জে উঠত। ইতিহাসে সে ছিল একদিন।

বাদলের সেই ক্লাব পরে উগ্রপন্থীদের হস্তগত হয়। তাদের সুর বেসুরা। উপজীব্য সুরা। জনপারাবার মন্থন করে তারা গরল তুলে আনে। সে গরল ক্রমে ক্রমে তাদের প্রত্যেকের বিনাশ ঘটায়। গরলে জর্জরিত হয়ে জনতাও ধীরে ধীরে নির্বীর্য হয়, অবশেষে নেপোলিয়নের পদলেহন করে। উগ্রতার সমাপ্তি দাসত্বে। ফরাসী বিপ্লব যদি মাত্রা মানত তবে সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার এই পরিণাম হত না, মানুষ মানুষের চাকর বনত না, যার যা খুশি সে তাই করে সমাজকে সমৃদ্ধ করত, মানুষে মানুষে সর্বনেশে বিবাদ ধরণীর ধূলি রঞ্জিত করত না।

ফরাসী বিপ্লব ব্যর্থ হয়েছে মাত্রা না মেনে। অন্য কোনো কারণ নেই ব্যর্থতার। আদর্শেরও ত্রুটী নেই। ওকে যারা মধ্যবিত্তদের বিপ্লব বলে লঘু করতে চায় তারা বোঝে না তারা কী বকছে। আখেরে রুশবিপ্লবও যে ব্যর্থ হবে না তার নিশ্চয়তা কোথায়? স্টালিন কি নেপোলিয়নের প্রতিরূপ নন? নেপোলিয়ন শাসিত ফ্রান্স কি সেকালের পক্ষে প্রভূত উন্নতি করেনি? সাংসারিক উন্নতি যদি কাম্য হয় তবে নেপোলিয়ন ফ্রান্সকে তা দিয়েছিলেন, তাই দিয়ে ভুলিয়েছিলেন। কিন্তু মনুষ্যের ঐশ্বর্য যে সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা সে ধন থেকে বঞ্চিত

করেছিলেন। মানুষ অতি সহজেই তার আদর্শ হারায়, চুষিকাঠি পেলেই খুশি হয়। সেসব চুষিকাঠির রকমারি নাম। একটা তো গ্লোরি বা গৌরব। আর একটা Collectivization. মানুষকে সমষ্টিতে পরিণত করণ।

পুরাতন অভ্যাসবশে কখন এক সময় বাদল তার ব্যাঙ্কের দ্বারদেশে হাজির হয়। টাকার দরকার নেই, থাকলেও সে কেন পিতার দান নেবে! কিন্তু চিঠি—যদি চিঠি থাকে তার নামে। বাদল চিঠির খোঁজ নেয়।

আশ্চর্য! চিঠি লিখেছেন তার বাবা। কতকাল পরে বাবার চিঠি। এতদিন তিনি সুধীর চিঠিতেই বাদলকে উপদেশ ও আশীর্বাদ জানিয়ে ইতি করতেন। কাজের লোক, তাঁর কাছে এক একটা মিনিট যেন এক একখানা ইট, যা দিয়ে সরকারী পদমর্যাদার দেউল অভ্রভেদী হয়।

লিখেছেন—তিনি কোন এক সূত্রে সংবাদ পেয়েছেন যে বাদল তার পড়াশুনায় জলাঞ্জলি দিয়ে কমিউনিস্টদের দলে ভর্তি হয়েছে। অন্য কেউ সংবাদ দিলে তিনি বিশ্বাস করতেন না, কারণ বাদল যে তাঁর মতো লোকের ছেলে, সে কি কখনো তার কর্তব্য অবহেলা করে বুনো হাঁস তাড়াতে যাবে! কিন্তু যিনি দিয়েছেন তিনি ইংরেজ। ইংরেজ কদাচ মিথ্যা বলতে পারে না। তাই তিনি এয়ার মেলে এই চিঠি লিখে বাদলকে সনির্বন্ধ উপদেশ দিচ্ছেন যে তাঁর ছেলে যেন বাপের নাম রাখে। এবারেও যদি সে আই. সি. এস. পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয় তবে জীবনের পরীক্ষাতেও অকৃতকার্য হলো বলে ধরে নিতে হবে। তা হলে তার পিতার জীবনের যাবতীয় আশাভরসাও অন্তর্হিত হবে, তিনি কাউকে মুখ দেখাতে পারবেন না, অকালে অবসর নিয়ে কাশীবাসী

হবেন। জগৎ তাঁর সঙ্গে যে নিষ্ঠুর ব্যবহার করছে তার তুলনা নেই। এখনো তিনি ও. বি. ই. খেতাব পেলেন না, অথচ গবর্নমেণ্ট ও খেতাব যাকে তাকে দিচ্ছেন। পদবীর এই দুর্বোধ্য অপচয় দেখে তাঁরও মাঝে মাঝে ইচ্ছা যায় কমিউনিস্ট হতে। তা ছাড়া তাঁকে এখনো প্রথম শ্রেণীর জেলার ভার দেওয়া হয়নি, পড়ে আছেন তিনি মুঙ্গেরে। কাশীবাসের কথা তিনি সত্যি সত্যি ভাবছেন! বাদল যদি অকৃতকার্য হয় তবে সেটা হবে উটের পিঠে শেষ কুটা।

বলা বাহুল্য চিঠিখানা ইংরেজীতে লেখা ও স্টেনোগ্রাফারকে দিয়ে টাইপ করা। সই অবশ্য তাঁর নিজের হাতের। সই মানে অবশ্য নামটা নয়, ইংরেজীতে "ফাদার।" তার নিচে নিজের হাতের পুনশ্চ। তাতে আছে উজ্জয়িনীসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা। তাকেও তিনি তাঁর আশীর্বাদ জানিয়েছেন। প্রাচীন ভৃত্য নাথুনী তাদের দুজনকেই সেলাম পাঠিয়েছে।

নাথুনী যে তাকে মনে রেখেছে তাতে তার রাগটা জুড়িয়ে জল হয়ে যায়। নতুবা সে বাপকে লিখত, আমি কি আপনার খাই না ধারি যে আপনি আমার সারা জীবনের বিলিব্যবস্থা করবেন? হাকিম হয়ে যদি আমি অসুখী হই তবে কি আপনি সে অসুখ সারাতে পারবেন? আর কী ছোট নজর আপনাদের! আই. সি. এস. হয়ে সারা জীবনের শেষে হব তো আমি প্রাদেশিক লাট বা হাই কোর্টের জজ। টম ডিক হ্যারি, রাম শ্যাম যদুও তা হয়ে থাকে। ওই যদি হয় আপনাদের উচ্চাভিলাষের চূড়ান্ত তবে সেই যে বুড়ী জজকে আশীর্বাদ করেছিল দারোগা হতে সেও ছিল চরম দুরভিলাষিণী। তার ছেলেটি বোধহয় দারোগাগিরির সাধনায় অকৃতকার্য হয়ে বুড়ীকে গঙ্গাতীরবাসিনী করেছিল।

বাদল তার বাবার চিঠি কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ব্যাঙ্কের ছেঁড়া কাগজের টুকরিতে বিসর্জন দেয়। বৃথা তর্ক এমন লোকের সঙ্গে! সে যদি কোনো দিন তার কণ্ঠস্বর পায় সেইদিন প্রমাণ করে দেবে সে সার টমাস কি সার রিচার্ড নয়, সার রামগোপাল কি সার শ্যামাচরণ নয়। সে বিংশ শতাব্দীর বাদল।

তার মনে পড়ে যায় O'Shaughnessy'র কবিতার লাইন—

"One man with a dream, at pleasure,
Shall go forth and conquer a crown;
And three with a new song's measure
Can trample an empire down."

বাদল ভাবে, কেবল আমি একা নই, আমরা সকলেই—সব মানুষই—শক্তিধর স্বাপ্নিক। আমরা যদি শুধু একবার বিশ্বাস করতুম যে আমরা ঘানির বলদ নই; আমরা চারটি খোরাকের জন্যে বা একটু আদরের জন্যে ঘানি ঘোরাতে বাধ্য নই, যদি বিশ্বাস করতুম যে আমরা নরপুঙ্গব, তা হলে কোন দিন এ ঘানি ঢুঁ মেরে ভেঙে এ ব্যবস্থা লাথি মেরে গুঁড়িয়ে গাঁক গাঁক করে গর্জন করতুম। মাসে মাসে টাকা পাঠান বলে বাবা মনে করেন তিনি আমাকে কিনে রেখেছেন, তেমনি মজুরি বা বোনাস দেন বলে পুঁজিপতিরা মনে করেন আমরা তাঁদের কেনা। যেদিন আমাদের আত্মবিশ্বাস জন্মাবে, আত্মবিস্মৃতি দূর হবে সেদিন আসবে ইতিহাসে আর এক দিন। সেদিন আমরা ঘুম থেকে জেগে দেখব যে আমরা মুক্ত। মুক্তির উল্লাসে আমরা সমস্ত দিন ধরে গড়ব আমাদের স্বপ্নের মায়াপুরী, আমাদের সব পেয়েছির দেশ।

বাদল স্বপ্ন দেখে মানবজীবনপ্রভাতের। সে প্রভাতে যার যেখানে খুশি সেখানে গিয়ে তাঁবু গাড়ছে, কেউ ভারতবর্ষ ছেড়ে ইংলণ্ডে, কেউ

ইংলণ্ড ছেড়ে ভারতবর্ষে। যার যে কাজে খুশি সেই কাজ করছে, যেটুকু দরকার সেইটুকু পারিশ্রমিক নিচ্ছে। যে যাকে ভালোবাসে তার সঙ্গে বিহার করছে, সন্তানসম্বন্ধে নিজেদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া করে নিচ্ছে। কোথাও কোনো সমাজপতি বা রাষ্ট্রপতি বা পুঁজিপতি নেই, পুরাকালের ডাইনোসর প্রভৃতি অতিকায় প্রাণীদের মতো বিলুপ্ত হয়েছে। পতি কিংবা পত্নী নেই, মানুষের উপর মানুষের মালিকী স্বত্ব উচ্ছেদ হয়েছে। সকলে স্বাধীন, কোলের শিশুও। সকলে সমান, যার পারিশ্রমিক কম সেও যেমন যার পারিশ্রমিক বেশি সেও তেমনি। প্রয়োজন অনুসারে যখন পারিশ্রমিক তখন সেটাকে পারিশ্রমিক না বলে প্রায়োজনিক বললে ক্ষতি নেই। সকলের প্রয়োজন সমান নয়, তা সত্ত্বেও সকলে সমান। যেমন শাল তাল দেওদার ওক পাইন সমান। কারো উপরে চোখ রাঙাবার কেউ নেই, সকলে এক একটি নবাব। তবে সকলের মধ্যে শৃঙ্খলা রাখতে, সামঞ্জস্য রাখতে সকলেরই মনোনীত একটা সমিতি থাকবে, সভা বসবে। সেই সমিতিকে রাষ্ট্র কিংবা সমাজ বলতে পার, চার্চ কিংবা সঙ্ঘ বলতেও পার, কিন্তু ক্ষমতা তার ব্যক্তির নিকট হতে লব্ধ, তার যা কিছু মূল্য তা ব্যক্তির দেওয়া। সে স্বয়ম্ভু বা স্বয়ংসিদ্ধ নয়। মানুষের জন্যে প্রতিষ্ঠান, প্রতিষ্ঠানের জন্যে মানুষ নয়।

নদীর বাঁধে ফিরে বাদল বসে বসে ঢুলছে এমন সময় নীলমাধব তাকে আবিষ্কার করে। মুখচেনা ছিল, বাক্যালাপ ছিল না। মাধব বাদলের গায়ে হাত দিয়ে আস্তে নাড়া দিল, বাদল চমকে উঠে বলল, "কে ?"

"আসুন, কথা আছে।" এই বলে মাধব তাকে বন্দী করল। ধরে নিয়ে গেল নিজের বাসায়, ছেড়ে দিল না।

অপ্সরা

১

কার্লস্‌বাডের পথে দে সরকার বলল উজ্জয়িনীকে, "উপন্যাস যে কবে লিখব স্থিরতা নেই, লিখলেও আপনি পড়বেন কিনা জানিনে। আপনাকে যখন সাথে পেয়েছি তখন উপন্যাসের কথাবস্তু শোনাতে চাই। শুনবেন?"

উজ্জয়িনীরও কিছু ভালো লাগছিল না। মা'র জন্যে তার মন খারাপ। হয়তো কোনো সাংঘাতিক অসুখ। বিদেশে বিভুঁইয়ে বিপদ কখনো একা আসে না। ওদিকে সুধীর জন্যেও তার মন কেমন করছিল। এই দোটানায় পড়ে দু'ধারের দৃশ্য উপভোগ করবার মতো শক্তি ছিল না তার। কাজেই গল্প করে ও শুনে সে বাস্তবকে ভুলতে পারলেই বাঁচে।

উজ্জয়িনীর সম্মতি নিয়ে যা শুরু হলো তা পল্লবিত হতে হতে প্রায় উপন্যাসেরই মতো অফুরন্ত হয়ে দাঁড়াল। দে সরকার অবশ্য গোপন করল যে তার উপন্যাসের নায়ক সে নিজে। উজ্জয়িনীরও উক্ত তথ্যে প্রয়োজন ছিল না। প্রণয়কাহিনীগুলি তার কৌতূহল উদ্দীপ্ত করছিল, আর দে সরকারও এমন ঘোরালো করে বলছিল যে স্বভাবত মনে হতে পারে বানানো। মাঝে মাঝে পরামর্শ নিচ্ছিল, "বলতে পারেন, এই খণ্ডটা কী ভাবে সমাপ্ত করা যায়? পদ্ম কি কুল রাখবে, না শ্যাম রাখবে?" যেন উজ্জয়িনীর মতামতের উপর উপন্যাসের ভবিতব্য নির্ভর করছে।

এমনি করে দে সরকার তার জীবনের বহুতর অভিজ্ঞতার উপাখ্যান ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলল। অত ব্যাপার সে সুধীকেও শোনায়নি। সুধীর বেলায় তার ভয় ছিল, কারণ সুধী তো বিশ্বাস করবে না যে ওগুলি অলীক। উজ্জয়িনীর বেলায় ভয় ছিল না, কারণ উজ্জয়িনীর ধারণা ওসব উপন্যাসের অঙ্গ। জানত না যে একজনের কাছে যা গল্প আরেকজনের কাছে তাই বাস্তব।

"আপনার বই," বলল উজ্জয়িনী, "রোমহর্ষক নয়, শুনে চমক লাগে না। কিন্তু ওর আগাগোড়া ট্র্যাজিক। আচ্ছা, আপনার ইচ্ছা করে না আপনার নায়কনায়িকাদের অন্তত একটিবারও সুখী করতে?"

"আমার কি অনিচ্ছা! কিন্তু করি কী, বলুন। যেমনটি ঘটেছে তেমনটি লিখতে হবে। লোকে ভাবে লেখকরা নিরঙ্কুশ! ওটা ভুল।"

"ঘটেছে, কেন বলছেন? সবটাই তো কাল্পনিক।"

"ঘটেছে," দে সরকার ঢোক গিলে বলল, "নায়কনায়িকাদের জীবনে।"

"কিন্তু নায়কনায়িকারা তো কাল্পনিক।"

দে সরকার কোণঠাসা হয়ে বলল, "কল্পলোকের ঘটনাও ঘটনা।"

উজ্জয়িনী ছুটি হাত জোড় করে বসেছিল, এক একবার জানালা দিয়ে চেয়ে দেখছিল প্রসারিত জার্মেনীর দিকে। কতবার খেয়াল হচ্ছিল এইখানে নামলে কেমন হয়, কিছুদিন থাকলে কেমন হয়। কিন্তু মা'কে না দেখা অবধি শান্তি নেই, মা যদি সুস্থ থাকেন সুধীদাকে না দেখা অবধি স্বস্তি নেই। তা হলে জার্মেনীর বুকের উপর দিয়ে যাওয়া আসাই সার। হল্যাণ্ড তো রাত্রে কখন পার হওয়া গেল মালুম হল না! শুধু গাড়ীবদলের ফাঁকে বার্লিনে কিছু সময় কাটল।

"তা যদি হয়," সে অনুযোগ করল, "আপনি ইচ্ছা করলেই ঘটনার শেষে সুখের সমাবেশ করতে পারতেন, এখনো পারেন।"

"হায়, বন্ধু!" দে সরকার গাঢ় স্বরে বলল, "আমার যদি সাধ্য থাকত! লেখকরা যে কত অসহায় পাঠকরা কী করে বুঝবেন!"

"লেখকরা পাঠকদের কাঁদিয়ে কী যে আনন্দ পান, তাঁরাই জানেন। কিন্তু ইচ্ছা করলে তাঁরা হাসাতেও পারেন, খুশি করতেও পারেন। আপনি কেন পারেন না!"

"আমার নিয়তি!"

উজ্জয়িনী তার চোখে চোখ রেখে বলল, "কই, আপনাকে কখনো হাসতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। আপনি কি তবে ও রসে বঞ্চিত?"

"চেষ্টা করলে," দে সরকারও চোখে চোখ রাখল, "হাসতে পারি, কিন্তু শাক দিয়ে যেমন মাছ ঢাকা যায় না হাসি দিয়ে তেমনি কান্না। আজ আপনার মুখেও তো হাসি দেখছিনে, চেষ্টা করলে সে হাসি আন্তরিক হবে কি?"

এই ব্যক্তিগত প্রশ্নের জন্যে উজ্জয়িনী প্রস্তুত ছিল না। বিরক্ত হলো। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে গুম হয়ে বসল।

দে সরকারও হৃদয়ঙ্গম করল যে সীমা লঙ্ঘন করেছে। এতদিনের তপস্যায় সে সহযাত্রী হবার সৌভাগ্য লাভ করেছে, সহানুভবী হবার দুর্লভ বর আরো সাধনাসাপেক্ষ। এ মেয়ে বাইরে পর্দা মানে না, ভিতরে ঘোর পর্দানশীন। এর সঙ্গে সারা দুনিয়া ঘুরে বেড়ালেও এর মনের বোরখা খুলবে না।

"আপনার গল্প থামালেন যে?" এক সময় উজ্জয়িনীর মৌন ভাঙল। "নাটালীকে লাগছিল বেশ।"

"থাক, আপনার মন ভালো নেই।"

"কেমন করে জানলেন? আমি তো বলিনি।"

"না, আপনি বলেননি। আপনার মনের প্রাইভেসী রক্ষা করেছেন। কিন্তু অমন একখানা টেলিগ্রাম পেয়ে কার না হৃদয় হু হু করে। তিনি অবশ্য আমার মা নন, তবু আমারই কি বুকটা ধড়ফড় করছে না? কেন তবে বোকার মতো বকর বকর করি?"

উজ্জয়িনী কোমল স্বরে বলল, "আমি কি আপনাকে দোষ দিয়েছি? শুধু বলেছি লেখকরা পাঠকদের কাঁদিয়ে কী যেন একটা আনন্দ পান। অন্যায় করেছি?"

"না, না, যথার্থ বলেছেন। আনন্দ পানই তো। আনন্দের জন্যেই লেখা। যিনি পারেন তিনি হাসিয়ে আনন্দ পান, খুশি করে আনন্দ পান। আর আমার মতো যাঁরা অক্ষম অসহায় লেখক তাঁরা কাঁদিয়ে সান্ত্বনা পান। সেও এক প্রকার আনন্দ। যে হতভাগারা কাঁদে তারা আরো দশজনকে দলে টানতে চায়, তাই চিমটি কেটে কাঁদায়।"

এর পরে উজ্জয়িনী আবার তার চোখে চোখে রাখল। আবেগ ভরে বলল, "কিন্তু আপনি কেন তাদের মতো অক্ষম অসহায় হতে যাবেন? আপনি হবেন শক্তিশালী লেখক, যার তূণে বিচিত্র শর—বিচিত্র চরিত্র। কারো অন্তরে সুধা, কারো অদৃষ্টে ব্যর্থতা, কেউ সম্পূর্ণ সুখী, কেউ জ্বলেপুড়েই মলো। চারদিকে চেয়ে দেখুন, জীবন কি একরঙা, না বহুরঙা?"

কার্লস্‌বাড ওরফে কার্লোভিভারী যাবার সংক্ষিপ্ত রাস্তা এ নয়। উজ্জয়িনীর অভিলাষ ছিল এই যাত্রায় বার্লিন দেখবে, যদিও পাঁচ ঘণ্টার বেশি দেখা হবে না। চিড়িয়াখানাটার উপর তার ঝোঁক। কিন্তু সেখানে গিয়ে মন লাগল না। দোকানে দোকানে ঘুরে মা'র জন্যে

কয়েকটা উপহার কিনল। স্টেশনে ফিরে এসে খেতে খেতে গাড়ীর সময় গুণতে গুণতে দে সরকারের কাহিনী শুনল। স্টেশন তার ভালো লাগে এইজন্যে যে সেখানে বহু বিচিত্র নরনারীর বিভিন্ন মনোভাবের চিত্র সচল ও সবাক। তারপরে এই ট্রেন!

সুরম্য নগর ড্রেসডেন পিছনে রেখে পার্বত্য পথ দিয়ে ট্রেন চলেছে। রেলপথের সহযাত্রিণী এল্‌বে নদী। নদীর দুই দিকে খাঁড়ার মতো খাড়া হয়ে উঠেছে পাহাড়। বিদায়বেলার সূর্য রঙের তুলি বুলাচ্ছে। দে সরকার মুগ্ধ কণ্ঠে বলল, "কী সুন্দর এ ধরণী!"

দুজনে তন্ময় হয়ে শোভা সন্দর্শন করল। কিন্তু তন্ময়তা সত্ত্বেও দে সরকার ভুলল না যে উজ্জয়িনীকে একাকী পাওয়া এই প্রথম, এই হয়তো শেষ, যদি না তাকে চিরকালের মতো পায়। এমন সুযোগ এক জীবনে দুবার আসে না—এই প্রথম, এই হয়তো শেষ। কার্লস্‌বাডে তার মা তাকে চোখে চোখে রাখবেন। সেখান থেকে যদি লণ্ডনে ফেরা হয় তবে তিনিও সঙ্গী হবেন। আর কয়েকটি ঘণ্টা পরে সুযোগের অন্ত। ট্রেন যতই লক্ষ্যের নিকটবর্তী হচ্ছিল দে সরকারের সুযোগের আয়ু ফুরিয়ে আসছিল।

কখন এক সময় সে অলক্ষিতে উজ্জয়িনীর একখানি হাত নিজের হাতে নিল। এমন অলক্ষিতে যে যার হাত সে টের পেল না।

"আচ্ছা, আপনি তো কবি, আপনার কি কখনো মন যায় না এমনি কোনো এক দুর্গম স্থানে কুটীর নির্মাণ করে বাস করতে?"

"আপনার?"

"আমারও।"

"কুটীর চেষ্টা করলে মেলে। কিন্তু কাল হয়তো কার্ল্‌স্‌বাডের কুহকে কুটীরের স্বপ্ন মনে থাকবে না। এমনি মানুষের মন!"

"না, ঠিক মনে থাকবে। কিন্তু আপনি তো বুঝবেন না আমার কী জ্বালা। আমার যে ইচ্ছা থাকলেও উপায় নেই।"

দে সরকার কান পাতল, কথা কইল না। পাছে উজ্জয়িনী রাগ করে, লোকটা কী অশিষ্ট, পরের বিষয় জানতে চায়!

চেক রাজ্যের সীমান্তে কাস্টম্‌সের পরীক্ষা। সে সময় উজ্জয়িনী ব্যস্ত হয়ে হাত তুলে নিল। দে সরকারও তাদের দুজনের মালপত্র খুলে দেখাতে লাগল। পাস্‌পোর্ট দেখে পরীক্ষক সম্ভ্রমের স্বরে বললেন, "ভারতীয়? টাগোর...গান্ধী..."

ইতিমধ্যে আরো কয়েকবার আরো কয়েকজনের মুখে ভারত সম্বন্ধে ঔৎসুক্য অভিব্যক্ত হয়েছে। উজ্জয়িনী জার্মান ভাষা জানে না, দে সরকার যেটুকু জানে তাতে বেশিক্ষণ চলে না। অপর পক্ষ ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে কিছু দূর চালিয়ে হাল ছেড়ে দেন।

হাঙ্গাম চুকলে উজ্জয়িনী বলল, "সকলের সঙ্গে মিশতে, সকলের জীবনের ভাগ নিতে এত সাধ যায়! কিন্তু ভাষা শেখবার উৎসাহ নেই। নিরুপায়!"

২

"ভাগ্যিস ভাষা জানেন না।" দে সরকার ভয়ে ভয়ে বলল, "জানলে ঝগড়া করতেন।"

"কেন, বলুন তো?"

"ওই যে পাসপোর্ট পরীক্ষক ও বলছিল, আপনার স্ত্রীর গায়ে ঠাণ্ডা লাগতে পারে, কোট পরিয়ে দিন। বাস্তবিক একটু একটু শীত বোধ হচ্ছে। পাহাড়ে রাস্তা।"

উজ্জয়িনী কোট গায়ে দিয়ে জবুথবু হয়ে বসল। বলল, "লোকটা বোকা। আমার ফোটার সঙ্গে আমাকে মিলিয়ে দেখেছে, আপনার নামের সঙ্গে আমার নাম মিলিয়ে দেখেনি।"

"আমি কিন্তু ওর কাছে কৃতজ্ঞ। কারণ আমার পক্ষে অত বড় গৌরব কল্পনাতীত।"

তা শুনে উজ্জয়িনী পরিহাস করল। "কথাটা আপনার স্ত্রীর পক্ষে গৌরবের নয়। তাঁকে চিঠি লিখে জানাব।"

"লিখলে ও চিঠি আপনার ঠিকানায় ফেরৎ আসবে।"

উজ্জয়িনী বুঝতে না পেরে বলল, "আপনার স্ত্রী বুঝি পতিনিন্দা সইতে পারেন না?"

"মাথা নেই, তার মাথাব্যথা।"

"ওহ্।" উজ্জয়িনী এতক্ষণে বুঝতে পারল। হেসে বলল, "বেশ যা হোক। যার বিয়ে হয়নি তার আঙুলে বিয়ের আংটি। আমার সন্দেহ ছিল আপনি বৌ থাকতে বোহেমিয়ান। যেমন হয়েই থাকে বিলেতে এসে ভারতের ছেলেরা।"

এবার দে সরকার তার আংটির ইতিহাস আরম্ভ করল। এ সেই আংটি যা সে পেয়েছিল তার সুইস বান্ধবীর কাছে। তাঁর সঙ্গেও আলাপ এই চেকোস্লোভাকিয়ায়, এমনি এক ট্রেনে। তখন তারা দুজনেই ফিরছিল পোলাণ্ড থেকে। তাঁর স্বামীর দেশ পোলাণ্ড।

"কিন্তু মনে রাখবেন," দে সরকার সতর্ক করল, "এ আংটি আমার নয়, এ কাহিনীও আমার নয়। এসব আরেকজনের, অর্থাৎ আমার উপন্যাসের নায়কের। কুমুদ লোকটা মোটের উপর কাল্পনিক হলেও আমার অন্তরঙ্গ, সেই সূত্রে তার হাতের আংটি আমার হাতে এসেছে।"

উজ্জয়িনী সন্দিগ্ধ স্বরে সুধাল, "কুমুদ বলে কি কেউ সত্যি আছে?"

দে সরকার মুশকিলে পড়ল। পালাবার পথ নেই দেখে মরীয়া হয়ে বলল, "না থাকলে এ আংটি আমি কার কাছে পেতুম ? এমন আংটি কি বাঙালীরা বিয়ের সময় পায় ?"

"তা হলে কুমুদ পেলো কী করে ?"

"সেই কথাই বলতে যাচ্ছি। অবধান করুন। কুমুদ আসছিল পোলাণ্ডের রাজধানী ওয়ারস বেড়িয়ে।...."

গল্প যখন সারা হলো তখন উজ্জয়িনীর সারা দেহে বিস্ময়। দে সরকার কিছুই গোপন করেনি, কুমুদের সঙ্গে তার বান্ধবীর বধূ সম্পর্কের উপর আবরণ টেনে দেয়নি।

"এ কি সত্য ?" উজ্জয়িনী বিশ্বাস করবে কি না ভাবছিল।

"কুমুদ জানে।"

"কুমুদ এখন কোথায় ?"

"বড় কঠিন প্রশ্ন করেছেন।" দে সরকার পাশ কাটাতে চাইল।

"যদি আপত্তি থাকে বলবেন না, আমার বেআদবি মাফ করবেন।"

"না, আপত্তি কিসের ? আপনি জানতে চান কুমুদ এখন কোথায়। যদি বলি, জানিনে, তা হলে মিথ্যা বলা হয়। যদি বলি, জানি কিন্তু বলব না, তা হলে কী মনে করবেন তা আন্দাজে বুঝি। সুতরাং বলে ফেলাই ভালো। দুদিন বাদে কোথায়ই বা আপনি, আর কোথায়ই বা আমি! তখন তো আপনার ঘৃণা আমার গায়ে লাগবে না। এই দুটো দিন বড্ড লাগবে।" গলা পরিষ্কার করে দে সরকার বলল, "তা বলে কেন আপনাকে ধোঁকা দেব ? কুমুদ এখন এইখানে"।

উজ্জয়িনী শুনে থ হয়ে রইল। একটু পরে হেসে বলল, "না। আমি অত সুবোধ নই। আংটি হয়তো কুমুদের, কিন্তু কুমুদ এখন এখানে নেই। সুতরাং আপনি দুদিনের বেশি অনায়াসেই আমাদের

ওখানে থাকতে পারেন। কেউ আপনাকে ঘৃণা করবে না। কেন করবে?”

“আশ্বস্ত হলুম।” দে সরকার একটা সিগারেট ধরাল। “আমি যে আমার মুখোস খুলতে পেরেছি এই আমার যথেষ্ট। এখন আমি নির্ভয়ে মুখ দেখাতে পারি।”

উজ্জয়িনী কাতর স্বরে বলল, “দুদিনের বেশি কেই বা থাকতে চায়! যদি মা'র শরীর নিরাময় দেখি আমিও আপনার সঙ্গেই ফিরব।”

“প্রার্থনা করি তাঁর সর্বাঙ্গীন কুশল। কিন্তু তিনি কি আপনাকে ফেরবার অনুমতি দেবেন?”

“ভালো থাকলে কেন দেবেন না?”

“কী জানি! আমার তো মনে হয় না যে ললিতা রায় ভিন্ন অন্য কারো উপরে আপনার ভার দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারবেন?”

উজ্জয়িনী দপ করে জলে উঠল। “আমার ভার আমি ভিন্ন অন্য কারুকে বইতে হবে না। আমি কি নাবালিকা?”

“মা'র চক্ষে হয়তো তাই।” দে সরকার ফোড়ন দিল।

“মা'র তা হলে চোখের অসুখ। ওর চিকিৎসা কার্ল্স্বাডে হবে না। ভিয়েনায় কিংবা অন্য কোথাও করাতে হবে। আমি তাঁকে লণ্ডনেই নিয়ে যাব।”

দে সরকার উস্কে দিয়ে বলল, “তাতে করে এই প্রমাণ হবে যে আপনি নাবালিকা, একটি chaperon না হলে আপনার লণ্ডনে থাকা নিরাপদ নয়, এবং আপনার জননীই আপনার chaperon.”

“কক্ষনো না।” উজ্জয়িনী চেঁচিয়ে বলতে যাচ্ছিল, অন্যান্য যাত্রীদের দিকে চেয়ে ফিসফিসিয়ে বলল, “আমি সম্পূর্ণ স্বাধীন। মা যদি ভালো থাকেন তা হলে আমি তাঁর নিষেধ সত্ত্বেও লণ্ডনে ফিরব অথবা তিনিই

ফিরবেন আমার সঙ্গে লণ্ডনে। আর আপনিই হবেন আমার সে যাত্রার chaperon, যেমন এ যাত্রার।" এই বলে সে আবার চোখে চোখ রাখল পরম নির্ভরভাবে।

দে সরকার তার একখানি হাত নিজের মুঠোয় ভরে গদ্‌গদভাবে বলল, "যেমন এ যাত্রার, তেমনি সে যাত্রার, তেমনি সব যাত্রার। সব যাত্রার।"

উজ্জয়িনীকে নিঃশব্দ দেখে সে আরো সাহস সঞ্চয় করে বলল, "এতদিন ভাবছিলুম কী নামে আপনাকে ডাকব। আজ যখন আপনি আমাকে শাপেরোন বলে অভিহিত করেছেন তখন আমিই বা কেন আপনাকে ডাকব না সখী বলে?"

উজ্জয়িনী সচকিত হয়ে এদিক ওদিক চেয়ে দে সরকারের চোখে একদৃষ্টে তাকাল। তার অনুভূতি তাকে করস্পর্শের করাঘাতের দ্বারা জানাল যে একজন তাকে কামনা করে।

"আমি," সে একটু শক্ত হয়ে বলল, "লণ্ডন থেকে সুধীদার সঙ্গে ভারতবর্ষে ফিরব, মিস্টার দে সরকার। তারপরে বোধহয় জেলে যাব। জেলযাত্রা অবশ্য মেয়েদের সঙ্গে, যদি দেশের মেয়েরা জাগে!"

দে সরকার রহস্য করল, "জাগে নয়, ক্ষেপে। না ক্ষেপিলে সব ভারত ললনা, এ ভারত আর ক্ষেপে না ক্ষেপে না।"

"বেশ, তাই হোক। ক্ষেপুক আর জাগুক আমি চাই যে মেয়েদের দিয়ে কিছু একটা কাজ হোক। দিনের পর দিন হাঁড়ি ঠেলা আর বছরে একটি করে ইংরেজের ক্রীতদাস সৃষ্টি করা কি একটা কাজ!"

উজ্জয়িনীর কণ্ঠস্বরে তীব্র দহন, নয়নদীপে জ্বলৎ শিখা।

"সব আগে স্বাধীনতা, তারপরে আহার বিহার বংশরক্ষা। যা সব আগে তার জন্যে আমাদের মেয়েদের জীবনের সব শেষেও যদি একটু-

খানি ঠাঁই থাকত। যদি জানতুম যে মা হবার পরে, ঠাকুমা হবার পরে আমরা স্বাধীন!”

“সেইজন্যেই তো বলি ওই অভিশপ্ত দেশে ফিরে কাজ নেই। আমি হয় ইউরোপে থাকব, নয় তাহিতি কিংবা সামোয়া দ্বীপে পালাব।” দে সরকার অকপটে জানাল।

“না, মিস্টার দে সরকার, দেশকে অমন করে বর্জন করা ঠিক নয়। দেশে গিয়ে দেশের মানুষকে জাগাতে হবে—দরকার হয় তো ক্ষেপাতে হবে। পুরুষরা কতকটা জেগেছে এবং ক্ষেপেছে। এখন মেয়েদের পালা। তাদের জাগানো বলুন, ক্ষেপানো বলুন, সেটা ঘটবে। তবে তো ভারত জাগবে, অথবা ক্ষেপবে।”

“মাফ করবেন।” দে সরকার আর একটা সিগারেট ধরাল। “আমরা প্রায় পৌঁছে গেছি। পরে এ নিয়ে তর্ক করা যাবে। দেখছি আপনি একজন পেট্রিয়ট। দুঃখের বিষয় আমি তা নই। কারণ পেটিয়টদের রুজি রোজগারের খোঁজ খবর নিয়ে আমার রুচি উবে গেছে। যাদের বয়স কম, আদর্শবাদ বেশি, সেই বেচারিদেরকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে নিজেরা গেছেন কাউন্সিলে কর্পোরেশনে লোকাল বোর্ডে। এবার শুনছি মেয়েদের পালা। আমি বলি, পালা নয়—পাল্লা। পলায়ন কর।”

ইতিমধ্যে উজ্জয়িনী তার হাত খুলে নিয়েছিল। উঠে বলল, “প্রায় পৌঁছে গেছি। তা হলে যাই, সাফ সুতরো হয়ে আসি। আপনি ততক্ষণে জিনিসপত্র গুছিয়ে গুনতি করে রাখুন।”

৩

স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন মিসেস গুপ্ত স্বয়ং, তাঁর সঙ্গে তাঁর ইংরেজ সহচরী মিস আর্চার। এই অল্পবয়সী মেয়েটি ফরাসী ও জার্মান ভাষা জানে, কন্টিনেন্টের পথঘাট চেনে। একে তিনি বহাল করেছিলেন লণ্ডনে থাকতে, লণ্ডন ছাড়বার এক দিন আগে।

"মা," উজ্জয়িনী উল্লসিত হল, "তুমি ভালো আছ তা হলে।"

"হাঁ, ডিয়ার।" তিনি তাকে প্রকাশ্যে চুম্বন করলেন। "বার কয়েক বাথ নিয়ে আমার বাত অনেকটা সেরেছে। তারপর, কুমার, তুমি তো এলে, তোমার বন্ধু সুধী?"

"সুধীদা," উজ্জয়িনী উত্তর কেড়ে নিল, "কী করে আসবে? তার যে পীস্ কন্‌ফারেন্‌স্।"

"প্যাসফিস্ট কন্—" দে সরকার সংশোধন করতে গেল।

উজ্জয়িনী তাকে ঠেলা দিয়ে বলল, "আপনি আপনার নিজের কাজে মনোযোগ দিন। মাল এখনো নামল না। কী দেখছেন?"

ধমক খেয়ে দে সরকার মিস আর্চারের মুখ থেকে চোখ ফিরিয়ে নিল। মিস আর্চার বললেন, "থাক, আমি সে ভার নিচ্ছি। আপনারা এগিয়ে যান, বাইরে গাড়ী দাঁড়িয়েছে।"

দে সরকার একবার ভাবল শিভ্যালরির খাতিরে মিস আর্চারকে বলে, "ধন্যবাদ, মিস। কিন্তু আপনি কেন? আমিই ওসব করব। আমি তো এ দেশে নবাগত নই।" কিন্তু উজ্জয়িনীর চাউনি তাকে নির্বাক করেছিল। সে উজ্জয়িনীর আদেশ পালন করতে গিয়ে মিস আর্চারকে বিনাবাক্যে উপেক্ষা করল।

ফল হলো এই যে দে সরকার ও মিস আর্চার দু' জনেই মালের কাছে

থাকলেন। তা লক্ষ্য করে উজ্জয়িনী থমকে থামল। সুতরাং মিসেস গুপ্তকেও থামতে হলো।

"ও কী করছেন? একজন থাকলে কি যথেষ্ট হতো না? ছেড়ে দিন। বুঝলে, মা, এই ভদ্রলোকটি একটি পাকা গিন্নী। এমন সংসারজ্ঞান তুমি কোথাও পাবে না। এখন এঁর একটি কর্তা থাকলে ষোলো কলা পূর্ণ হত।"

"এস, কুমার। ভিকি সমস্ত পারবে।" মিসেস গুপ্ত অভয় দিলেন। "ওটি একটি অমূল্য রত্ন। ছোটবেলা থেকে কন্টিনেণ্টে মানুষ হয়েছে কি না, এসব রাজ্যের হালচাল জানে ও বোঝে। ভিকি, তুমি রইলে?"

উজ্জয়িনীর আশঙ্কা ছিল তার মা হয়তো রোগে পঙ্গু। কিন্তু দেখা গেল তাঁর বয়সের তথা শরীরের ওজন দিনকের দিন কমছে। তিনি যেন হাই হীলের উপর উড়ে চললেন। শাড়ীখানিও পরেছিলেন মনোজ্ঞ ভাবে। স্টেশনের লোক মেয়ের চেয়ে মায়ের দিকে তাকাল বেশি, মনে মনে তারিফ করল সেই ভারতীয় রূপসীকে। দুজনেই তন্বী, কিন্তু মেয়ের চেয়ে মায়ের মুখের ছাঁদ সুষম। উজ্জয়িনী এর জন্যে তার মাকে ঈর্ষা করে। রঙের জন্যেও। কিন্তু রং একটু মলিন হলে কী হয় তার ত্বক চিকণ, তার অঙ্গের সুরভি প্রসাধননিরপেক্ষ। উজ্জয়িনীর বৈশিষ্ট্য তার লাবণ্য আর সুজাতার বৈশিষ্ট্য তাঁর রূপ।

দে সরকার পেছিয়ে পড়ছিল। তার তো উড়ে চলবার সাধ্য নেই। পুরুষ মানুষ, হাই হীল সে পাবে কোথায়? কিন্তু উজ্জয়িনী উল্টো বুঝছিল। মনে করছিল মিস আর্চারের খাতিরেই সে পেছিয়ে পড়ছে। মাঝে মাঝে থমকে থেমে ফিরে ফিরে আড় নয়নে অগ্নিবাণ হানছিল। আর তা দেখে দে সরকারের অন্তরাত্মা বলছিল, তদা নাশংসে বিজয়ায়…

হোটেলে পৌঁছেই মিসেস গুপ্ত কফির ফরমাস দিলেন। এটা সেটা জিজ্ঞাসা করতে করতে এক সময় বললেন, "তার পর, কুমার, তোমার বন্ধু বাদলের কী খবর ?"

দে সরকার উৎসাহিত হয়ে বলল, "বাদলের জন্যে বড় কষ্ট হয়। পাগলের মতো টেম্‌সের বাঁধে পড়ে আছে, দেশলাই বেচে খায়।"

"হোয়াট !" তিনি হতভম্ব হলেন। "তুমি নিশ্চয় ও কথা বলতে চাও না ?"

"কথাটা সত্যি।" উজ্জয়িনী সাক্ষী দিল।

"আশ্চর্য !" মিসেস গুপ্ত শিউরে উঠলেন। "Well, I never !"

"সুধীদা তোমাকে ও বিষয়ে কী যেন লিখেছে, মা। চিঠিখানা আছে আমার—কোথায় রাখলুম, বলতে পারেন ?"

দে সরকার দেখেনি। বলতে পারল না। উজ্জয়িনী মুচকি হেসে বলল, "না, আপনি পাকা গিন্নী নন। এখনো কাঁচা আছেন।"

"সুধী কেন তার বন্ধুকে কাছে রাখে না ?" তিনি বাদলের জন্যে আজ যতটা উদ্‌বেগ প্রকাশ করলেন ততটা কখনো করেননি। "মাই পুওর বোয়! কী যে তার ব্যথা, কিছুই বুঝতে পারিনে। কমিউনিস্ট না বোলশেভিক, কী ওদের বলে ? ওই যারা রাজার শত্রু ?"

উজ্জয়িনী সংশোধন করল, "রাজার নয়, ধনীর।"

"একই কথা।" তিনি কানে তুললেন না। "ওরা তো ছেলে ধরে নিয়ে যায় শুনেছি। ওরা কি তবে বাদলকেও ভুলিয়ে নিয়ে গেছে ?"

দে সরকার বলল, "না, মা।" উজ্জয়িনীর মা'কে মাতৃসম্বোধন করে সে আত্মীয়তার সুখ পাচ্ছিল। "না, মা। ওরা জুজু নয়। বাদল ভুল করে ওদের দলে জুটেছে। কিন্তু নদীর বাঁধে দেশলাই বিক্রী করা বোধহয় ওদের দলের নির্দেশ নয়।"

"তবে কাদের শিক্ষা?"

"আমার নিজের মনে হয় বাদল য়্যানার্কিস্ট।"

"হোয়াট!" মিসেস গুপ্ত মূর্চ্ছা যাবেন এমন অনুমান হলো। তাঁর মেয়ে তাঁকে এক হাতে ধরে আর এক হাত দিয়ে একটা ঘুঁষি বাগাল। তার স্বামীর নামে এ কী নতুন অপবাদ!

দে সরকার তাড়াতাড়ি বলল, "দোহাই আপনার। য়্যানার্কিস্ট আমি টেররিস্ট অর্থে বলিনি। ওর মানে নৈরাজ্যবাদী—যারা কোনো রকম গভর্নমেণ্ট মানে না। কোনো রকম শৃঙ্খলা বা শৃঙ্খল।"

কফিতে চুমুক দিতে দিতে মা বললেন, "ওর পাগলামির নাম যাই হোক না কেন, নাম নিয়ে তর্ক করা বৃথা! আমি এর প্রতিকার চাই। কালকেই রায় বাহাদুরকে cable করব যে তিনি আপনি এসে তাঁর পুত্রের দায়িত্ব নিন। যেমন আমি আপনি নিয়েছি আমার কন্যার।"

"ওহ্!" উজ্জয়িনীর এতক্ষণে হুঁশ হলো যে তার মা তাকে আনিয়েছেন নিজে অসুস্থ বলে নয়, সে অভিভাবকশূন্য বলে।

"মা," সে তাঁকে একটু বাজিয়ে দেখল, "আমরা কবে ফিরব?"

"কারা?" তিনি ভ্রূভঙ্গী করলেন। "কোথায়?"

"ইনি আর আমি। সম্ভব হলে তুমিও।" উজ্জয়িনী দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলল, "লণ্ডনে"।

"কেন! লণ্ডনে তোমার কী কাজ? তুমি তো দেশলাই বেচবে না। আর আমি সেখানে ফিরব কোন মুখে?"

তিনি বিশদ করলেন তাঁর বক্তব্য। "ইংলণ্ডের পুলিশ এখনো আমাকে জানায়নি যে তারাপদ এতদিনে ধরা পড়েছে। এই যাদের কর্মতৎপরতা তাদের রক্ষণাবেক্ষণে সঁপে দেবার মতো অজস্র সম্পত্তি

আমার নেই। থাকলে," তিনি স্বর নামিয়ে বললেন, "এই হোটেলে ঘর নিয়ে বাস করতে হতো না। একটা ভিলা কিনতুম।"

তিনি আরো খোলসা করে বললেন, "না, ডিয়ার! লণ্ডনে ফেরা ঘটবে না, আমার জীবনেও না, তোমার জীবনেও না, যদি না তোমার স্বামী তোমাকে ডাকে।"

তার স্বামী! এইমাত্র সে তার স্বামীর পক্ষ নিয়ে দে সরকারের উপর খড়্গহস্ত হচ্ছিল। কিন্তু মা'র উক্তি শুনে তাঁর উপরে রুষ্ট হলো। সে তা হলে স্বাধীন নয়, স্বেচ্ছাগতি নয়। এ কী অসহনীয় অন্যায়! তার ইচ্ছা করছিল সেই রাত্রেই কার্লস্‌বাড ছেড়ে পালাতে।

দেখা গেল ইতিমধ্যেই বহুসংখ্যক নরনারীর সঙ্গে তাঁর আলাপ পরিচয় হয়েছে। এঁরা নানা দিগ্‌দেশাগত। কেউ জার্মান, কেউ ফরাসী, কেউ আমেরিকান, কেউ চেক। সবাই তাঁকে দূরে রেখে অভিবাদন জানায়, নিজ নিজ টেবিল থেকে দুটো একটা কুশল প্রশ্ন করে। এখানে প্রায় সকলেই স্বাস্থ্যের জন্যে আগন্তুক। কে কেমন বোধ করছে, আর ক'দিন থাকতে হবে, কথোপকথন প্রধানত এই সূত্র ধরে অগ্রসর হয়। হতে হতে অন্যান্য প্রসঙ্গে পথ হারায়।

উজ্জয়িনীরা ছত্রিশ ঘণ্টা ভ্রমণ করে ক্লান্ত। তাই মিসেস গুপ্তকেও সেদিন জটলা ছেড়ে উঠতে হল।

"এস, তোমাদের কার কোন ঘর দেখিয়ে দিই। আজ বিশ্রাম কর, কাল তোমাদের বেড়াতে নিয়ে যাব। এটা লণ্ডন নয়, এখানে বিশেষ কেউ ব্রেকফাস্টের জন্যে নামে না। ঘরে বসেই ব্রেকফাস্ট খেয়ো। ন'টার সময় আমি তোমাদের ডেকে পাঠাব। আমার কিছু কেনাকাটা আছে, সেটা সেরে খুব এক চোট বেড়ানো যাবে। কয়েকটা call-ও আছে। তোমাদেরকে এখানকার সমাজে ইন্‌ট্রোডিউস করা আমার

প্রথম কাজ। একটা পার্টি দেব, ভাবছি। পার্টিতে তুমি কী পরবে, বেবী? শাড়ীগুলো সঙ্গে এনেছ, না লণ্ডনে টমাস কুকের জিম্মা রেখে এসেছ?"

উজ্জয়িনীর ঘুম পাচ্ছিল। হাই তুলে বলল, "কাল ওসব কথা। এই আমার ঘর? বেশ, যথেষ্ট জায়গা। কোথায় স্নান করব, বলে দাও। স্নান আজ সারা দিন হয়নি। গা ঘিন ঘিন করছে। আচ্ছা, আমি তা হলে স্নানের আয়োজন করি। গুড নাইট, মাদার। গুড নাইট, মিস্টার দে সরকার।"

৪

স্নান করে শীতল হবে ভেবেছিল। অঙ্গজ্বালা নিবল না।

এ তো কয়লার গুঁড়া নয় যে সাবানের জলে উঠবে। অথবা নয় থিতানো ঘাম যে গরম জলে গলবে। উজ্জয়িনীর ঘুম পাচ্ছিল, কিন্তু আসছিল না। যতই মনে পড়ছিল একজনের আঙুলের ছোঁয়া ততই তপ্ত হয়ে উঠেছিল শুধু সেইটুকু ঠাঁই নয়, সকল দেহ।

এমন তো কখনো হয়নি। কুমার ও সে কতবার এক সঙ্গে নেচেছে। স্পর্শ করেছে পরস্পরের স্কন্ধ, কটি, কর। কোনো দিন মনে কোনো ভাব উদয় হয়নি, দেহে উদয় হয়নি কোনো তাপ। কেন তা হলে আজ এমন হলো? কুমার তাকে সখী বলে ডেকেছে সেইজন্যে কি?

উপন্যাসের নায়ক কুমুদের কাহিনীগুলি একে একে মনে পড়তে থাকল। কুমুদ বন্দী হতে চেয়েছে প্রত্যেক বার, কিন্তু কেউ তাকে বাঁধতে রাজি হয়নি। তার সঙ্গে তুলনা করা যাক বাদলকে। বাদল মুক্তিপাগল, কোনোখানে বদ্ধ হবে না। তার স্ত্রী তাকে

বাঁধতে পারেনি, অন্য কেউ যদি পারত তবে সে নদীর বাঁধে বাসা করত না। বাদল মুক্ত পুরুষ। কুমুদ ওরফে কুমার বন্ধনকামী।

এমন যে কুমার সে তার রক্ত রাঙা হৃদয় অনাবৃত করেছে উজ্জয়িনীর সম্মুখে। সখী বলে বিশ্বাস করেছে। আঙুলে আঙুল জড়িয়েছে। আগুন লাগিয়েছে গায়ে। করবে কী উজ্জয়িনী!

সে রাত্রে ঘুম যদি বা হলো বার বার ভেঙে গেল। পাশাপাশি যার সঙ্গে সারাদিন বসে কাটিয়েছে সে মানুষটি কি পাশে নেই? কুমার, তুমি কোথায়! উজ্জয়িনী এ পাশ ও পাশ করে, কাউকে কাছে পায় না। ক্রমে ক্রমে প্রত্যয় হয় যে এটা ট্রেন নয়, হোটেল। আসন নয়, শয্যা। এখানে কুমার অনধিকারী। উজ্জয়িনী লজ্জিত হয়, বালিশে মুখ ঢাকে। তখনো তার মনে হতে থাকে ট্রেন চলেছে, কুমার চলেছে, সখী চলেছে, কে জানে কোন নিরুদ্দেশ যাত্রায় তখনো তার তনুতে অতনুর পরশমণিরাগ।

পরের দিন যখন মা'র সঙ্গে দেখা হলো সে বলল, "মা, আমি, যাব না, তুমি যাও। কেনাকাটা করতে চাও, দে সরকারকে নাও। উনি বাজার সরকার হবেন। আমি আর একটু শুয়ে থাকলে সুখী হব।"

কারো সঙ্গে, কারো পাশে বসে, কারো হাত ধরে নিরুদ্দেশ যাত্রার যে সুখ একবার আস্বাদন করেছে সেই সুখ পুনঃ পুনঃ কল্পনা করে সুখী হবার ছল এ। তার মা ঠাওরালেন, এটা ক্লান্তি মোচনের আকাঙ্ক্ষা। তার প্রস্তাবে সায় দিলেন।

দে সরকার শূন্য মন্দিরে একাকী নিশিযাপন করেছিল, ভোরে উঠে ভাবছিল আজকের দিন সে তার দয়িতাকে কী দিয়ে অর্চনা করবে, কোন উপহার কিনবে। ফুল যেমন সুলভ হয়েও দুর্লভ

তেমন তো আর কিছু নয়। কার্লস্‌বাডের ফুলের দোকানে কি এমন ফুল মিলবে না যা পেলে দেবী বরদা হন?

উজ্জয়িনীর প্রস্তাবে সে ব্যথিত হলো, কিন্তু নিজের ক্লান্তির দ্বারা পরিমাপ করতে পারছিল তার ক্লান্তি। পীড়াপীড়ি করল না। মিসেস গুপ্তের প্রতি মনোযোগ দিল। তাঁকে সন্তুষ্ট করে, তাঁর আস্থা অর্জন করে, তাঁর দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ হতে পারলে কার্লস্‌বাডে আরো কিছুদিন অবস্থান করতে তিনিই তাকে সাধবেন। বাজার সরকারের কাজে সত্যি তার জুড়ি নেই। তার পূর্বপুরুষদের কেউ হয়তো মোগল বাদশাদের বাজার সরকার ছিলেন, তাই থেকে সরকার পদবী।

উজ্জয়িনী সন্ধ্যার আগে নামল না, শুয়ে শুয়ে দিবাস্বপ্ন দেখল। সুধীর জন্যে তার মন কেমন করছিল, কিন্তু এমনি চঞ্চল তার মন যে সুধীর চিন্তায় নিবিষ্ট থাকছিল না। সুধীর চিন্তা আধখানা রেখে বাদলের চিন্তায়, বাদলের চিন্তা আধখানা রেখে কুমারের চিন্তায় ঘুরঘুর করছিল। তিনজনেই দুঃখী। সুধীর জীবনকে দুঃখের করেছে অশোকা। বাদল দুঃখ পাচ্ছে মানুষের দুঃখ দূর করতে না পেরে। এদের দুজনের একজনেরও প্রয়োজন নেই উজ্জয়িনীকে। সে সহস্র চেষ্টাসত্ত্বেও সুধীকে সুখী করতে অক্ষম, বাদলকে সুখী করা তো নারীর অসাধ্য। বাকি থাকে তৃতীয় জন। কুমারের দুঃখ, সে যত বার সব দিতে চেয়েছে ততবার ষোলো আনার কিছু কম পেয়েছে। যারা দিয়েছে তারা হাতে রেখে দিয়েছে। কুমার কেন তা সহ্য করবে! সে চায় পূর্ণ দানের বিনিময়ে পূর্ণ দান। হৃদয় নিয়ে খেলায় হাতের পাঁচ লুকিয়ে রাখা চলে না। হাতের সব ক'টা তাস টেবলের উপর মেলতে হয়। তা হলেই খেলা জমে। নইলে একদিন খেলা ভেঙে যায়।

এই যদি হয় কুমারের দুঃখ যে তার সঙ্গে একজনও খেলার নিয়ম মেনে খেলতে রাজি হলো না তবে এ দুঃখ বোধহয় তার সখীর ক্ষমতার অতীত নয়। তাস খেলায় তারা প্রায়ই পার্টনার হতো লণ্ডনে। নাচ যদি একটা খেলা হয় তবে তাতেও তারা হয়েছে পার্টনার। সে সব খেলা যে এই খেলারই প্রথম পাঠ বোকা মেয়ে অতটা ভাবেনি। খেলাকে মনে করেছে খেলা ছাড়া কিছু নয়। আর একজন যে জীবন পণ করে খেলায় নেমেছে তা যদি জানত তবে হয়তো গোড়ায় ইস্তফা দিত।

সন্ধ্যায় যখন সাক্ষাৎ হলো কুমার দিল একটি গার্ডিনিয়ার শাখা। উজ্জয়িনী চমৎকৃত হয়ে বলল, "ওমা, এ যে আমাদের গন্ধরাজ।"

কুমার সেটিকে পরিয়ে দিল সখীর কটিদেশে। ওর সাঙ্কেতিক অর্থ, আজ আমরা পরস্পরের সাথী হব নৃত্যে।

উজ্জয়িনী পুলোকিত হলো ঐ সঙ্কেতে। বিনা বাক্যে ব্যক্ত করল, নিশ্চয়, সাথী হব প্রতি বার।

তাদের হোটেলে সে রাত্রে নাচের আয়োজন ছিল। দু'জনে নাচল যতক্ষণ আসর চলল। মিসেস গুপ্তও নাচলেন, তবে বিশেষ কোনো একজনের সঙ্গে না। কেউ প্রার্থনা করলেই তিনি পূরণ করছিলেন, প্রার্থীরা একাধিক হলে প্রথমাগতকে বরণ করেছিলেন। এতে তাঁর জনপ্রিয়তা বাড়ছিল। কিন্তু জনতা এত বেশি যে কোনো একজনের বরাতে দ্বিতীয় বার বরণের অবকাশ ছিল না।

উজ্জয়িনীকেও অনুরোধ করছিল অনেকে। সে তাদের সরাসরি অগ্রাহ্য করছিল সলাজে ও সবিনয়ে। চুপি চুপি বলছিল, "দুঃখিত। আমি অঙ্গীকারবদ্ধ।" তা শুনে কোনো কোনো নাছোড়বান্দা জানতে চাইছিল, "কাল? পরশু? তরশু?" কিন্তু কুমারের দিকে চেয়ে তার ভরসা হচ্ছিল না। কারণ ঠিক সেই সময়েই কুমারের চাউনি

পড়ছিল আর কোনো তরুণীর চোখে। তারা যে ওর প্রতীক্ষা করছিল তা অস্পষ্ট ছিল না।

সে রাত্রেও স্নান করে উজ্জয়িনী শীতল হলো না, তার প্রতি অঙ্গ জ্বলতে থাকল। শুয়ে শুয়ে সে যেন নাচতে লাগল, কুমারের হাতে হাত সঁপে, কাঁধে হাত রেখে, কুমারকে কটি বেষ্টন করতে দিয়ে। গার্ডিনিয়ার শাখাটি তার বালিশের উপর ছিল, পুষ্পিত শাখা। কখনো সেটিকে বুকে চেপে ধরল, কখনো নাকে। এ কী মধুর যন্ত্রণা!

এতদিন যেন সে ঘুমিয়েছিল, আজ হঠাৎ জেগেছে। এ যেন তার নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ। তার অহল্যার শাপমোচন।

কিছুতেই তার ঘুম আসছিল না। জানালার ধারে চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। বাইরে জ্যোৎস্না ফিনিক ফুটেছে। ঋজু দীর্ঘ বনস্পতি একাগ্র চিত্তে ধ্যান করছে। ধাপে ধাপে পাহাড়। তার গায়ে গায়ে পাইন বন। দু'দিকে দুই নদী।

কেউ কেন তার পাশে নেই? উজ্জয়িনী নিঃসঙ্গ বোধ করল, বোধ করল যেন কার বিরহ। পৃথিবীর তো কোথাও কোনো অভাব নেই, প্রকৃতিও আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ। মানুষ কেন কারো অপেক্ষা রাখে? কেন তার অসার লাগে এই সৃষ্টি, যদি না থাকে আর এক জোড়া চোখ, আর এক জোড়া কান, আর একটি মুখ, আর একটি বুক।

সে উঠে পায়চারি করল। করতে করতে এক সময় দ্বার খুলে বেরিয়ে পড়ল। নিঝুম পুরী। কেউ কোথাও নেই। লোভ হলো এক বার বাইরে বেড়িয়ে আসতে। অবশ্য রাতের পোশাকের উপর ড্রেসিং গাউন জড়িয়ে বাইরে বেড়ানো চরম নির্লজ্জতা। কিন্তু যার রক্তে জ্বলছে আকাশের তারা সে কি লোকনিন্দায় টলবে? হোটেলের গেট খোলা ছিল। সে আকাশের তলে এসে দাঁড়াল।

মরি মরি! কী উতরোল নৃত্য! আকাশের জ্যোৎস্নাজালা নৃত্যশালায় জ্যোতির্ময় পুরুষদের সঙ্গে জ্যোতিষ্মতী ললনাদের তালে তালে পদক্ষেপ ও ঘূর্ণন। রাত যতক্ষণ থাকবে নাচ ততক্ষণ চলবে। তারপরে অঙ্গন শূন্য করে রঙ্গী ও রঙ্গিনীরা নেপথ্যে বিশ্রাম করবে জোড়ায় জোড়ায়।

আকাশের তারা, বনের পাখী, সকলেরই জোড়া। কেউ বিজোড় নয়। সে কেন একা? কেন? কেন?

সইতে পারে না এই একাকিত্ব। ধৈর্য ধরতে পারে না। কাল সকালে আবার দেখা হবে, কিন্তু কাল সকাল যেন কত কাল পরে। কেন সকাল হয় না? কেন? কেন?

পা টিপে টিপে ফিরে আসে। এবার ধরা পড়ে। পোর্টারকে ঘরের নম্বর দেয়। পোর্টার তাকে তার ঘরে পৌঁছে দিয়ে একটু দাঁড়ায়। লোকটা মরতে দাঁড়িয়ে থাকে কেন? খেয়াল হয়, বকশিষ। পার্স খুলে হাতে যা ওঠে দান করে। পোর্টার সেলাম জানায়। আপদ বিদায় হয়।

উজ্জয়িনী মেঝের উপর এলিয়ে পড়ে। তাতে যদি একটু শীতল হয়। দুই হাতের উপর মাথা রেখে ঘুমকে সাধে। আয়, ঘুম আয়। কেন আমাকে জাগিয়ে রাখিস, জুড়ি যখন ঘুমিয়ে!

৫

আগেও একবার সে এই দশা অতিক্রম করেছে। কিন্তু তখন সে ছিল তার সমবয়সীদের তুলনায় বালিকা, অপরিণত বয়সে পরিণীতা, তাই অকালে জাগরিতা। অকাল বোধনও বোধন, কিন্তু এমন নয়।

সেটা যেন প্রথম বর্ষণ, ঝড়ের মতো এলো, গেল, মাটি ভিজল না। শুধু উঠল একটা আর্দ্র উচ্ছ্বাস, ভিজে হাওয়ার হা হুতাশ। আর এটা যেন আষাঢ়ের আসন্ন বারিপাত, সঙ্গে বজ্রপাতও আছে। বর্ষণের আগে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘচমূ গগন ছেয়েছে, সারি সারি শিবির ফেলেছে। এবার যা আসছে তা জয়ের দাবী রেখে আক্রমণ।

শঙ্কায় তার বুকে দোলন লাগে, হর্ষে তার গায়ে শিহরণ। "প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।" এ কাঁদন কি ফুরাবে? মনে হয় রজনী ভোর হবে, তবু এ রোদন শেষ হবে না। নিদ্রার আরাধনা বৃথা।

সদ্য জাগ্রতা নারী প্রবোধ মানে না, সম্ভব অসম্ভবের ভেদ স্বীকার করে না। তার কাছে বাস্তব যেন স্বপ্ন, স্বপ্ন যেন বাস্তব। তার অভিলাষ অভিলষিতের প্রতি শরবৎ ধাবমান, অভিলষিতলাভে শরবৎ তন্ময়। "সমাজ সংসার মিছে সব।" সুধীর ছায়া পড়ে অভিসার সরণিতে, সে ছায়া বিবেকের। উজ্জয়িনী দৃক্‌পাত করে না, তার এতদিনের সুধীদা যেন কেউ নয়, যেন একটা অনভিপ্রেত বাধা। আর বাদল? সে তো মুক্তি নিয়েছে ও দিয়েছে। একদিন বাঁধন ছিল, আর তো নেই।

কয়েক মাস ধরে সে ভাবতে অভ্যস্ত হয়েছে যে সে কুমারী, তার কুমারী নামে পরিচয় দিয়েছেও। কিন্তু এর আগে নিশ্চিত জানত না যে দে সরকারও কুমার। দে সরকার যে অমন আভাস দেয়নি তা নয়, কিন্তু তার আঙুলের আংটি বিপরীত সাক্ষ্য দিচ্ছিল। এখন নিঃসংশয় হওয়া গেল যে সে কুমার। তার নামটিও কুমার! শুধু কুমার নয়, কৃষ্ণ।

কৃষ্ণ! তোমাকে আমি বৃন্দাবনে পাইনি। কত অন্বেষণ করেছি, বিড়ম্বিত হয়েছি। এবার কি তুমি আপনি ধরা দিলে? প্রিয়তম, এ

কি তুমি, সত্যি তুমি? দেবতা আমার, মানুষের রূপে এসেছ, বিগ্রহ-রূপে নয়। আমাকে তোমার ভালো লেগেছে, নিয়েছ এই গন্ধরাজের অভিজ্ঞান, করেছ তোমার নর্ম সহচরী। আমি কি এর যোগ্য? জানিনে। যদি যোগ্য হতুম তবে কেন মানুষ হয়ে জন্মাতুম? তেমন পুণ্য নেই বলেই তো মানুষ। তাই কি তুমি মানুষ হয়ে মানুষের যোগ্য হলে? তুমি আমার চেয়ে ভালো না হলেই ভালো, হলে কি আমার কোনো আশা থাকে? আমি তোমার দোষ ধরব না, অপরাধ নেব না, বিচার করব না। কেবল তুমি যদি অন্য কারো হও তবে আমি বিদায় নেব। তুমি পুরুষ। পুরুষের স্বভাব ওই। অতএব আশ্চর্য হব না। শুধু নিজের প্রস্থানের পথ মুক্ত রাখব। তুমিও অবন্ধন, আমিও অবন্ধনা। আমাদের কেলিকুঞ্জের দ্বার অবারিত থাকবে।

সে রাত্রেও তার সুনিদ্রা হলো না। ফলে ক্লান্তি গেল না। উপরন্তু সর্দি দেখা দিল! পরের দিনও সে নিচে নামল না, ঘরে শুয়ে রইল। তার মা দে সরকারকে তার কাছে বেশিক্ষণ বসতে দিলেন না, নিজেও বেশিক্ষণ বসলেন না। পূর্ণ বিশ্রামের উপদেশ দিয়ে, চিকিৎসার ব্যবস্থা করে, 'কল' করতে চললেন মিস আর্চারকে নিয়ে। দে সরকারের উপর বাজার করবার বরাত পড়ল। বেচারার ইচ্ছা ছিল শুশ্রূষা করতে, কিন্তু ইচ্ছা থাকলেও উপায় নেই। এই কথাটাই সে বোঝাতে চাইল চাউনি দিয়ে। কিন্তু তার সেই অসহায় ভঙ্গী দেখে উজ্জয়িনী হাসি চাপতে পারল না।

"মা, তোমার ফিরতে কি খুব দেরি হবে?"

"না, দেরি হবে বলে তো মনে হয় না। তোর যদি দরকার হয় মেডকে ডেকে বলিস ফ্রাউ উন্টারমেয়ারকে খবর দিতে, তিনি যা হয় করবেন।"

"আমি বলছিলুম," উজ্জয়িনীর চোখের কোণে দুষ্ট হাসি, "আমার যদি মরণ কি তেমন কিছু হয় তবে কি আমি মাতৃভাষায় দুটো একটা কথা কইতে পাব না তার আগে?"

"ও কী রে!" মা আদর করে বললেন, "তোর কী হয়েছে যে তুই ও কথা মুখে আনছিস! চুপটি করে শুয়ে থাক। বকবক করলে শরীর সারে না। আমি সকাল সকাল ফিরব।"

"বলছিলুম," উজ্জয়িনী কাশতে কাশতে না হাসতে হাসতে রেঙে উঠল, "মাতৃভাষায় কি মা ভিন্ন আর কারো সঙ্গে কথা কওয়া চলে না? বকবক করব না, শুনব। তাতে কি প্রাণহানির ভয় আছে?"

তিনি এতক্ষণে বুঝলেন। গম্ভীর ভাবে বললেন, "না, তা হতে পারে না। এখানকার কর্তারা এসব বিষয়ে একটু কড়া। একে তো আমরা পুবদেশী বলে সবাই সব সময় নজর রেখেছে। তার উপর তোর শ্বশুর মশায়ের কাছে জবাবদিহির দায় আছে, তা কি এক মুহূর্ত ভুলতে পারি?"

উজ্জয়িনীর মুখ চুন। তিনি ফিরে দেখলেন না। দে সরকার তাঁর অনুসরণ করবার সময় মাথা ঘুরিয়ে দেখল উজ্জয়িনীর চোখে জল।

যে পরাধীন তার প্রাণে প্রেমের সাধ কেন? সে ভালোবাসতে যায় কোন অধিকারে? কুমারের সঙ্গে তার কী করে তুলনা হবে? কুমার যে স্বাধীন, সে যে তা নয়। বাদল তাকে শাসন করছে না, তাই বলে কি সে স্বকীয়া? বাদলের পিতা, তাঁর বংশ, তাঁদের সমাজ—এঁদের শাসন আপাতত স্থগিত রয়েছে, যেহেতু সে বিদেশে। দেশে একবার ফিরলে কি এঁরা তাকে ধরে নিয়ে যাবেন না, তার উপর মালিকী স্বত্ব জারি করবেন না? তার মনে পড়ে যায় সুধীদার

সতর্কবাণী। "তুই যেভাবে মানুষ হয়েছিস তোর পক্ষে কোন কাজের কী পরিণাম তা উপলব্ধি করা শক্ত।"

কুমার হাজার হোক বনের পাখী। আর সে তার সব জারিজুরি সত্ত্বেও খাঁচার পাখী। বনের পাখীর সঙ্গে খাঁচার পাখীর মিল হবে কী মন্তরে!

তবে কি তাকে তার জননীর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করতে হবে? শ্বশুরের সঙ্গে তো নিশ্চয়ই। সমাজের সঙ্গেও? কার উপর নির্ভর করে সে তার সোনার শিকল কাটবে? কুমারের উপর কিসের ভরসা? বনের পাখী, বনে পালাতে পারে যে কোনো দিন। খাঁচার পাখী তখন কোন কুলে কুলায় পাবে? পিতৃকুল, মাতৃকুল, শ্বশুর কুল—তিন কুলে কেউ রাজি হবে কি তাকে আশ্রয় দিতে?

নিজেরই উপর তার অন্তিম নির্ভরতা। কিন্তু নিজের সম্বল যা আছে তা শর্তাধীন। তার পিতা তাকে প্রভূত সম্পত্তির ন্যাসী করে গেছেন, যদি ক্লিনিক চালায়। তার কিন্তু মতি নেই সেবাকার্যে। কিসে যে তার মতি তাও সে জানে না। ভাবতে পারে না। কেউ যদি তাকে গ্রহণ করত, করে নিপুণ হস্তে গড়ত, তা হলে সে এক তাল মাটির মতো নীরবে আত্মসমর্পণ করত। তেমন মানুষ বাদল কিংবা সুধী! দু'জনের একজনও তাকে নিল না। কুমার যদি নেয় তবে সে খুশি হবে নিশ্চয়, কিন্তু কুমার কি তাকে গড়তে পারবে? তেমন যোগ্যতা কি ওর আছে? যদি নষ্ট করে তবে তো তার সব দিক গেল। সে নিজের পায়েও দাঁড়াতে পারবে না।

তার মা হঠাৎ ফিরে এসে তার বিছানার উপর ধপ করে বসে পড়লেন। উত্তেজনায় তাঁর বাক্‌স্ফুরণ হলো না! তিনি শুধু তার

মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, "বেবী, my love! তাড়াতাড়ি সেরে ওঠ।"

"কেন, মা, কী হয়েছে আমার যে তুমি অমন ব্যস্ত হচ্ছ?"

"বেবী ডিয়ার, my own!" তিনি তাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "এক সঙ্গে চার চারটে নিমন্ত্রণ। সব এখানকার বড় বড় পরিবার থেকে। বনেদী ঘর থেকে। চিনিও না এঁদের সবাইকে। এ সৌভাগ্য কার জন্যে জানিস্? তোর জন্যে। তুই তোর সঙ্গে করে এনেছিস সৌভাগ্য। তোর পয় আছে।"

"আমি কোথাকার কে!" সে নম্রভাবে বলল। "হয়তো ওঁরা আমার স্বদেশকে সম্মান দেখাতে চান।"

স্বদেশ! তিনি বিস্মিত হলেন। ভারতের খাতিরে কেউ তাঁকে, তাঁর মেয়েকে ও তাঁর 'আত্মীয়' মিস্টার না মসিয়ে দে সরকারকে নিমন্ত্রণ করবে, এ কি কখনো সম্ভব! ভারত এমন কী দেশ যে তার খাতিরে—না, বাজে কথা।

"আসতে পারি?" এই বলে প্রবেশ করল দে সরকার। তার হাতে সেই তারিখের একখানা খবরের কাগজ। তাতে ছাপা হয়েছে তাদের তিনজনের ফোটো! লক্ষ করে গুপ্তজায়া লাফ দিয়ে উঠলেন।

"অবাক কাণ্ড। কোনোদিন তো এমন হয়নি।" নিজের ফোটো ছাপা হয়েছে দেখে ফেটে পড়তে যাচ্ছিলেন, ধরাধরি করে তাঁকে বসিয়ে দেওয়া হলো। "কী লিখেছে এর নিচে? পড়তে পারো তুমি, কুমার? কোন ভাষা এটা?"

জার্মান ভাষায় লেখা ছিল তিনজনের নাম ধাম, দেশের নাম। দে সরকার পড়ল, "এই ভারতবর্ষীয় অতিথিদের প্রতি স্বাগত সম্ভাষণ। কাশ্মীরের মনোহর দৃশ্যে লালিত এই রাজপুত পরিবার চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের

বংশধর। গোলকোণ্ডার হীরক এঁদের অঙ্গুরীয়ক ও অপরাপর অলঙ্কার মণ্ডন করে।"

উজ্জয়িনীও উত্তেজনার আতিশয্যে উঠে বসল। তার মা কাগজখানা সযত্নে ভাঁজ করে নিজের কাছে রেখে দিলেন। "কিন্তু কার কাছে পেলো আমাদের ফোটো? তুই দিস্‌নি তো?" তিনি প্রশ্ন করলেন সগর্বে ও সস্নেহে।

"না, মা। আমি তো ঘরে বন্ধ রয়েছি কাল থেকে।" সে অনুমানে বলল, "কুমার নিশ্চয়। কুমার, তুমি ফোটো চেয়ে নিয়েছিলে, সে কি এইজন্যে?"

কুমার বলল, "দোহাই তোমার। কিন্তু ফোটোর নিচের কথাগুলি আমার নয়।"

৬

সর্দির সাধ্য কী যে টেকে! চার চারটে নিমন্ত্রণ মিলে তাকে চার দিক থেকে ঘেরাও করল। মিসেস গুপ্ত মেয়েকে ফুটবাথ দিলেন, তার আগে একবার বাথরুমে বসিয়ে আনলেন। নিজেই তাকে মাসাজ করলেন। এত যত্ন, এমন আদর সে বহু কাল পায়নি। সে নাকি সৌভাগ্য বহন করে এনেছে, তাই এত সোহাগ, এমন সম্বর্ধনা।

মা ও মেয়ে দু'জনেরই এক চিন্তা, এক ধ্যান। শাড়ী কোথায়, চুড়ি কোথায়, হীরে বসানো আংটি আর কানের ফুল কোথায়! কাগজে যা রটে তার কিছু কিছু বটে। শেষটা কি অপদস্থ হতে হবে! চার চারটে নিমন্ত্রণ! যার তার নয়, সম্ভ্রান্ত মহলের।

দে সরকারের উপর ভার পড়ল প্রাগ থেকে জহরৎ কেনবার!

দু'একদিন দেরি হলেও ক্ষতি নেই, কিন্তু উপযুক্ত ভূষণ না হলে প্রতিপত্তির অপূরণীয় ক্ষতি। তখন আর কি কেউ নিমন্ত্রণ করবে! কাগজে ছবি ছাপিয়ে দে সরকার যে ব্যাপারটি বাধিয়েছে তার সাজা কয়েক হাজার টাকা। মিসেস গুপ্ত তাঁর ব্যাঙ্কের উপর চেক লিখে বাজার সরকারের হাতে দিলেন। ভগবানকে মনে মনে প্রার্থনা করলেন যে কুমার যেন তারাপদ না হয়।

"তোর কি মনে হয়, বেবী," দে সরকার চলে গেলে তিনি চুপি চুপি বললেন, "কুমার তারাপদর মতো উধাও হবে?"

উজ্জয়িনী ক্ষেপে গিয়ে বল্ল, "তুমি কি মানুষ চেন না, মা? জান না তুমি কুমার হচ্ছে রাজকুমার? মানে, হতে পারত, যদি তার পূর্বপুরুষের সেই জায়গীর থাকত?"

"কই, ওসব তো শুনিনি।"

"কী করে শুনবে? ওদের কি আর সেই অবস্থা আছে? গরিব হলে যা হয়—ধন নেই, ভাণ আছে। ওর কাছে তিন হাজার টাকার মূল্য কী? হয়তো উড়িয়ে দিয়ে আসবে শূন্য হাতে।"

তিনি থতমত খেয়ে বলে উঠলেন, "য়্যাঁ! সর্বনাশ!"

"না, মা।" মেয়ে অভয় দিল। "ও হিসাবী লোক। ওড়াতে চাইলেও পারে না। গরিব হলে যা হয়। পাই পয়সার সুমার রাখে। ও কি অত খরচ করবে ভেবেছ? তোমার অর্ধেক টাকা বাঁচিয়ে আনবে।"

"বেঁচে থাকুক।" তিনি আশীর্বাদ করলেন আশ্বস্ত হয়ে।

"আমি হলে," মেয়ে তাঁকে ভয় পাইয়ে দিল, "সত্যি সত্যি উধাও হতুম।"

"দূর! কী যে বকছিস!" তিনি চুমু খেলেন।

"মিথ্যে নয়, মা। উধাও হয়ে এমন কোনো দেশে যেতুম যেখান থেকে কেউ আমাকে ফিরিয়ে আনতে পারত না। সুধীদাও না, বিভূতিদাও না।" সে তাঁর বুকে মুখ ঢাকল।

"ছি। অমন কথা ভাবতে নেই।" তিনি তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন। "তোর জন্যে কি আমার কম আক্ষেপ, বেবী! তোর দিদিদের বিয়ে আমি দিয়েছি, তাই তারা কেমন সুখী হয়েছে। তোর বাবা যদি আমার কথা শুনতেন তবে কি তোর এ দুর্দশা হত! সুপাত্রের সঙ্গে বিয়ে দিলে কি—"

"থাক, মা! অপাত্রের সঙ্গে বিয়ে হয়নি আমার। তুমি ভুল বুঝেছ।"

"সুপাত্র না অপাত্র সে বিচারে কাজ কী এখন!" তিনি সহানুভূতির স্বরে বললেন। "বুঝি সব, তবু আপসোস হয় তখন আমার কথা যদি কেউ শুনত।"

"তুমি ভুল বুঝেছ, মা।" সে পুনরুক্তি করল। "বাদল চিরদিনই সুপাত্র। বরং আমিই ওর অপাত্রী। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে তা নয়। প্রশ্ন হচ্ছে, যদি তার আমাকে প্রয়োজন না থাকে, যদি আমারও না থাকে প্রয়োজন, তবে কি আমরা অকারণে আবদ্ধ হয়ে রইব আবহমান কাল?"

তিনি তার গালে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, "প্রয়োজন না থাকবে কেন? আছেই তো।"

"মা, তুমি আবার ভুল বুঝলে। আমি বলেছি, যদি না থাকে। মনে কর আমাদের কথা হচ্ছে না। হচ্ছে অন্য কোনো দম্পতির কথা। যদি তারা নিঃসংশয়ে উপলব্ধি করে যে প্রায়োজন বাস্তবিক নেই তবে কি তারা সমাজের মুখ চেয়ে স্বামী স্ত্রীর ভূমিকায় অভিনয় করে যাবে সারা জীবন?"

তিনি আতঙ্কিত হলেন। "কী করে জানলি যে প্রয়োজন নেই? বলেছে বাদল অমন কথা?"

"না, অতটা স্পষ্ট করে বলেনি।" সে মানল। "কিন্তু যা বলেছে তার মর্ম এক রকম স্পষ্ট। তা ছাড়া মুখে বলাই কি একমাত্র বলা? কাজ দিয়ে কি বলা যায় না?"

সে কেঁদে নালিশ করল।

তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। "অমন কত হয়! তুই কি মনে করিস্ আমার জীবনে ওরকম হয়নি! তোর বাবা," তিনি থেমে বললেন, "তোকে নার্স করতে চেয়েছিলেন কেন?"

"কারণ ওই ছিল ওঁর আদর্শ।"

"বটে!" তিনি বক্রোক্তি করলেন। "বাস্তবকে না পেলে লোকে আদর্শ বানায়, যেমন সীতাকে বনবাসে পাঠিয়ে স্বর্ণ সীতা।"

উজ্জয়িনী তার রূপবতী জননীর দিকে চেয়ে অবাক হয়ে ভাবল, তবে কি রূপের আকর্ষণও তার পিতাকে সপ্রেম করেনি? কে ছিল সেই নার্স? কী ছিল সেই নার্সের?

"যাক ও সব কথা। আমিও সারা জীবন সহ্য করেছি একজনের আদর্শের গ্যাকামি। তোকেও সহ্য করতে হবে আরেক জনের। এই মহাপ্রভুর আদর্শ ভর করবে তোর মেয়ের মস্তকে।"

"আমি," সে দৃঢ়কণ্ঠে জানাল, "মা হব না।"

"কী ছাই বকছিস্ রে তুই!" তিনি তার গালে ঠোনা মারলেন। "হওয়া না হওয়া কি তোর এক্তারে! বিধাতার কারসাজির তুই কতটুকু বুঝিস্। কিসে যে কী হয়, সে সব যারা দেখেছে তারা জানে।"

"আমি মা হব না। অন্তত এ জন্মে নয়।" সে রুদ্ধশ্বাসে বলল।

তিনি তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, "আমারও সে

সঙ্কল্প ছিল। রক্ষা করতে পারিনি বলেই রক্ষা, নইলে তোকে পেতুম কী করে?”

“তোমার লোভ ছিল ছেলের মা হতে। তাই বার বার তিনবার মেয়ের মা হলে। আমার তেমন কোনো লোভ নেই। আমি নিঃস্পৃহ।”

তিনি হেসে বললেন, “নিষ্কাম?”

সেও হেসে বলল, “না, নিষ্কাম নই। নিঃস্পৃহ।”

তিনি ব্যঙ্গ করলেন, “তাই বল! নিষ্কাম নয়, নিঃস্পৃহ! ফল সমান।”

“তা কেন হতে যাবে? সবাই কি তোমার মতো বোকা?” সে করুণার সহিত বলল। “দেখছি তো ইউরোপের মেয়েদের। দেখে শিখছি।”

তার মা এবার রাগ করলেন। “ওদের দোষগুলো শিখতে হবে না। গুণগুলোই শেখা উচিত। আমার কপাল মন্দ, তাই একজন আই. সি. এসের পাঠ না শিখে বোলশেভিকের পার্ট শিখছেন। আর একজন শিখছেন নিষ্কাম না হয়ে নিঃস্পৃহ হতে।”

উজ্জয়িনী তামাশা করল, “না শিখে উপায় আছে? তুমি কি বলতে চাও আমি অনির্দিষ্টকাল তপস্যা করব?”

তিনি দারুণ আঘাত পেয়ে হতবাক হলেন। পরে বললেন, “এসব কী রে! তোকে তো আমি খুব pure বলেই জানতুম।”

“আমি খুব pureই আছি।” সে অকুণ্ঠিতভাবে বলল। “আমি খুব pureই থাকব, মা, যদি কারো সঙ্গে থাকি।”

তিনি অজ্ঞান হতে হতে সামলে নিলেন। তার মুখে হাত দিয়ে বললেন, “না, আর ওসব শুনতে চাইনে। এখন বল, কী পরবি? তোর সর্দি তো সেরে গেছে। এবার ওঠ, ক্যাবিন ট্রাঙ্কটা খোল।”

এর পরে দু'জনাতে কী যে ফিস ফিস গুজ গুজ চলল, কে কী পরবে, না পরবে, এ বিষয়ে পরামর্শ—না অন্য কোনো বিষয়ে গোপনীয় আলাপ —আমরা তা লিপিবদ্ধ করব না।

বিকালের দিকে দেখা গেল তাঁরা মোটরে উঠছেন, সেই যে বেটা পোর্টার সে মোটরের দরজা খুলে দাঁড়িয়েছে। বোধহয় খবরের কাগজে এঁদের ফোটো দেখে চিনেছে, বিশেষ করে উজ্জয়িনীকে। তার কপালে এক রতি গোলকোণ্ডার হীরক জুটলেও জুটতে পারত, যদি না সে কাল রাত্রে অমন "বলে দেব"র ভঙ্গীতে খাড়া থাকত রাজপুত রমণীর ঘরের বাইরে। বেচারার কাঁচুমাচু মুখখানা দেখে উজ্জয়িনীর মায়া হলো। সে তাকে খামখা দশ ক্রোনেন বকশিষ দিল।

নিমন্ত্রণের বৈঠকে কথায় কথায় চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের নাম ওঠে। চন্দ্রগুপ্তকে যে কেন কেউ কেষ্ট বিষ্টু ঠাওরায় মিসেস গুপ্ত তা ভেবে পান না। তাঁর ইতিহাসের বিদ্যা পর্যাপ্ত নয়, চন্দ্রগুপ্ত যে স্যাণ্ড্রাকোটাস নামে ইউরোপেও প্রসিদ্ধ তা তিনি জানতেন না। তাঁর এক বিশিষ্ট আত্মীয়ের নাম ইতিহাসে লেখে না। সে মহাপুরুষ ভারতবর্ষের বড়লাটের সচিব। তিনি উক্ত পরিচয়ের উপরেই জোর দেন, কিন্তু ক্যাবিনেট মেম্বর শুনে চাপা হাসির ঢেউ খেলে যায়। ক্যাবিনেট শব্দের ফরাসী অর্থ তাঁর অজ্ঞাত। বড়লাটের পায়খানার মেথর যে একজন ভাগ্যবান পুরুষ এ সম্বন্ধে কারো দ্বিমত নেই, তবে কিনা শুনলে সুড়সুড়ি লাগে।

"ইংরেজশাসিত ভারতবর্ষে," কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করেন, "ওই পদই কি ভারতবাসীর পক্ষে উচ্চতম পদ?"

গুপ্তজায়া সাহঙ্কারে উত্তর দেন, "হাঁ, মহাশয়।"

৭

দে সরকার প্রাগ থেকে যা কিনে আনল তার ডিজাইন তার নিজস্ব। দু'জনের জন্যে দুটি প্ল্যাটিনামের টিকলি, উজ্জয়িনীরটিতে হীরকের কুমুদ, সুজাতারটিতে হীরকের কমল। তাঁরা উচ্ছ্বসিত ভাষায় বন্দনা করলেন তাকে ও তার মনোনীত মণিকারকে।

সিঁথিতে টিকলি পরে তাঁরা যখন নিমন্ত্রণ রক্ষা করে বেড়ালেন সেখানকার সমাজে একটা হুলস্থুল বাধল। টিকলি জিনিসটা কেমন তাই দেখতে কত লোক হোটেলে হাজির হলেন। ফোটো ছাপা হলো ফ্যাশন পৃষ্ঠায়। যাঁরা 'কল' করলেন তাঁদের সকলের জন্যে মিসেস গুপ্ত একটা পার্টি দিলেন। যাঁরা নিমন্ত্রণ করলেন তাঁদের তিনি প্রতিনিমন্ত্রণ করলেন।

এসব কাজে দে সরকার তাঁর দক্ষিণ হস্ত। সে তারাপদ নয় এর জাজ্বল্যমান প্রমাণ ললাটে ধারণ করে তিনিও তার প্রতি সুদক্ষিণ হয়েছিলেন। সে আর কিছু চায় না বা নেয় না। চায় উজ্জয়িনীর সান্নিধ্য। মাঝে মাঝে তিনি তার নিবেদন মঞ্জুর করতেন। তবে হোটেলে নয়, বনভোজনের সময় পাইন বনে।

"সখী," কুমার বলে তার প্রিয়দর্শনাকে, "বার বার বিফল হয়ে জীবনের কাছে আমি অধিক প্রত্যাশা করিনে। আমার দাবী যারপর-নাই কম।"

"শুনি।" উজ্জয়িনী কৌতূহলে উৎকর্ণ হয়।

"আমার একনিষ্ঠতার অঙ্গীকার তুমি হয়তো বিশ্বাস করবে না, কিন্তু আমার প্রকৃতি এমন নয় যে আমি শিকারের গর্বে একটির পর একটি শিকার করতে চাইব। ভালোবাসতে আমার আরাম লাগে না, বরং

ক্লেশ হয়। সাধ করে কি কেউ ক্লেশে পড়তে চায়? যায় কোনো একটা প্রাপ্তির প্রত্যাশায়। আমার সে প্রত্যাশা আমি যারপরনাই ক্ষুদ্র করেছি। শুনবে?"

"শোনাও।" উজ্জয়িনী অরক্ত হয়।

"মনে কিছু করবে না?"

"না। কেন?"

"হয়তো মনে লাগবে, সেইজন্যে ক্ষমা চেয়ে রাখছি, সখী।" কুমার করযোড় করল।

দু'জনে একটা ঝরণার ধারে পাশাপাশি বসল। হাতে হাত রেখে।

"শোন তা হলে বলি।" কুমার শুরু করল আকাশের দিকে চেয়ে। যেন সাক্ষী করছিল সূর্যদেবকে। "সেদিন তোমাকে যে উপন্যাসের কথাবস্তু শোনানো হলো তা কতগুলি উপাখ্যানের সমষ্টি নয়। প্রত্যেকটি উপাখ্যানেরই একটি শিক্ষা আছে। সে শিক্ষা আমি দ্বিতীয়বার চাইনে। যা প্রথম তাই চরম। আমার জীবনে পুনশ্চ নেই।"

উজ্জয়িনী অনুধাবন করছিল দেখে সে থামল না, বলে চলল। "আমি দ্বিতীয়বার স্বর্গের অমৃত চাই নে। তা যদি হয় তবে নারীর সঙ্গে রমণের সুখ আমার জীবনে দ্বিতীয়বার আসুক, এ কামনা আমার নয়।"

সখীর পাংশু মুখ অবলোকন করে সে অপ্রতিভ হলো। ভেবে বলল, "না, আমি ঠিক বোঝাতে পারছিনে। আমার বক্তব্য এই যে আমার ন্যূনতম দাবী তা নয়। যদি আমার ন্যূনতম দাবী মেটে তবে আমি অতিরিক্ত নিতে কুণ্ঠিত হব না।"

এর পরে আবার আকাশের দিকে চেয়ে উজ্জয়িনীর হাত ধরে বলল, "বন্ধু, তুমি সতী হও, পতিব্রতা হও, কল্যাণী হও, দেশ উজ্জ্বল কর।

আমি বাধা দেব না, অন্তরায় হব না। আগে মনে হতো বাদলের সঙ্গে আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা। তার পরে মনে হতো সুধীর সঙ্গে। এত দিনে আমি আত্মদর্শন করেছি। এবার আমি সুধীর সমুখে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারব। বাদলের সামনে চোরের মতো চোখ নিচু করে থাকব না।"

উজ্জয়িনী তন্ময় হয়ে শুনছিল। কুমার বলে চল্‌ল তন্ময় হয়ে, "তবে? তবে আমার কী বাঞ্ছা? এমন কিছু নয়, অতি সামান্য। যখনি যে খেলা খেলবে তখনি আমাকে ডেকো। টেনিস ব্যাডমিণ্টন গল্‌ফ্‌, সাঁতার তাস, যখনি যে খেলা খেলবে তখনি আমাকে সাথী কোরো। জীবনে তোমার পার্টনার হওয়া প্রত্যাশাতীত। কিন্তু নৃত্যে যেন আমিই তোমার পার্টনার হতে পাই। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমি সমান কুশলতার সহিত খেলব, আমাকে সাথী করে তুমি কোনো দিন কোনো খেলায় হারবে না। আমি যদি ছবি আঁকি তুমি হবে আমার মডেল। যদি বই লিখি তুমি হবে আমার নায়িকা। যদি মানুষ হই তুমি হবে আমার প্রেরণা। মানুষ আমি হবই, যদিও ফোর্ড কিংবা Cecil Rhodes না।"

উজ্জয়িনী কী যেন বলতে চেষ্টা করে। তার মুখে কথা জোগায় না। কুমার তার জন্যে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে, তারপরে বলে, "একটা গল্প আছে। বোধহয় আনাতোল ফ্রাঁসের। শুনবে? শোন তবে। এক ছিল বাজীকর। বাজী দেখানো ছাড়া দুনিয়ায় সে আর কিছু শেখেনি বা করেনি। একদিন সে গির্জায় গিয়ে মা মেরীকে উদ্দেশ করে বলল, প্রভু, ভজন পূজন সাধন আরাধনা কেমন করে করতে হয় জানিনে। বয়সও নেই যে নতুন করে শিখব। জানি কেবল বাজী দেখাতে। তাই দেখাই। এই বলে সে একাগ্র মনে

মা মেরীকে তার ক্রীড়াকৌশল দেখাল। মা মেরী দয়া করে গ্রহণ করলেন তার নৈবেদ্য।"

উজ্জয়িনীর নয়নে জল এলো। মুক্তার মতো এক একটি ফোঁটা টপ টপ করে পড়তে থাকল, জমতে থাকল, কুমারের একটি হাতে। কুমারের সেই হাতটি নিয়ে খেলা করতে করতে সে বলল, "আমি যদি ভগবান হতুম ভক্তের সঙ্গে লীলা করতুম অবাধে। কিন্তু আমার পায়ে পায়ে বাধা। এই যে তোমার সঙ্গে বসেছি এও চুরি করে। খুঁজতে খুঁজতে মা এসে পড়বেন আর তোমার কথার উত্তর দেওয়া হবে না। কুমার, আমি যেদিন স্বাধীন হব সেদিন তোমার ন্যূনতম দাবীর চেয়ে অতিরিক্ত দেব। সেটা আমার free gift।"

কাঁপতে কাঁপতে কুমার বলল, "সত্যি ?"

"তিন সত্যি।" উজ্জয়িনী নয়ন নত করল। "কিন্তু মনে রেখো, সেটা আমার free gift। উপরি পাওনার উপর তোমার কোনো দাবীদাওয়া নেই। কোনো দিন তা নিয়ে তুমি পীড়াপীড়ি করতে পাবে না। যেদিন উপরির জন্যে হাত পাতবে সেদিন পাওনাটুকুও হারাবে। বুঝলে কিছু ?"

কুমার পীড়িত স্বরে বলল, "সব বুঝেছি। আমার ভাগ্য।"

"কিছুই বোঝনি।" উজ্জয়িনী একটা ঝিলিক হেনে বলল, "কিন্তু বোঝাবারও সময় নেই আজ। শোনো। যেদিন আমি স্বাধীন হব সেদিন কেলি করব তোমার সঙ্গেই, একমাত্র তোমারই সঙ্গে। কেলি বলতে শুধু টেনিস তাস না, বোঝায় আরো কিছু যা আমি না বললেও বুঝবে। সেটাও তোমার পাওনা, যদি স্বাধীন হই।" যদি'র উপর জোর দিল।

স্বাধীন মানে স্বকীয়া। কুমার বুঝল ঠিকই। কিন্তু তা কি

সম্ভবপর! ডিভোর্স কি এতই সহজ! বাদল তো সম্মত, কিন্তু আইন যে অতি বিশ্রী। কে ঐ ইল্লৎ ঘাঁটবে!

"তা হলে তোমার উপরি পাওনা কোনটা?" উজ্জয়িনী নিজেই এর উত্তরে বলল, "আমার ইচ্ছা নেই গৃহিণী হতে, গৃহস্থালী চালাতে। দেশে যদি হোটেল না থাকে আশ্রম আছে, কারাগার আছে। আমাকে রান্না করতে, মুদির হিসাব রাখতে, জামাকাপড় সেলাই করতে, রোগীর সেবা করতে হবে না। ছেলে মানুষ করা দূরে থাক ছেলের মা হতে আমি নারাজ। কাজেই আমাকে ও নিয়ে পীড়াপীড়ি কোরো না। আমার যদি মন যায় তবে আমি এমনি তোমার ঘরে হাজির হব, তোমার ঠাকুর চাকরকে ধমক দিয়ে ভাগাব, তোমার হাঁড়ি ঠেলব, তোমার নাড়ি দেখব, টেম্পারেচার নেব, পোশাক ধোলাই করতে দেব, রুমালে সাবান ঘষব, সিগরেটের ছাই যেখানে সেখানে ফেললে কান ধরে সে ছাই তোমাকে দিয়ে সাফ করাব।"

তা শুনে কুমার তার কান বাড়িয়ে দিল। উজ্জয়িনী কানশুদ্ধ মাথাটা তার কোলের উপর টেনে নিল। চড় মেরে বলল, "আমার যদি মন যায় অমি তোমাকে দিয়ে আমাদের বাগানের মালীর কাজ করিয়ে নিতে পারি বিনা মজুরিতে।"

"সে কী! তোমাদের বাগান! তোমরা কারা!" কুমার চমকে উঠল। "তুমি তো বলেছ যে তুমি হবে স্বকীয়া!"

"একশো বার। কিন্তু সুধীদা আর আমি," সে বিষণ্ণ স্বরে বলল, "যে এক সঙ্গে দেশের কাজ করব। আমাদের যদি একটা আশ্রম কি আস্থানা থাকে তবে একটা বাগান থাকা বিচিত্র নয়। তুমি সেই মালঞ্চের হবে মালাকর।" সে একটু ঝুঁকল।

কুমার তার ঝুঁকে থাকা মুখখানি মুখের কাছে টেনে ধরে যা করল তা লিখতে সাহস হয় না। প্রায় পাঁচ মিনিট কারো মুখে রা নেই।

তার পরে কুমারই তাকে ছেড়ে দিয়ে বলল, "সুধী সব জানে।"

"তাই নাকি?" প্রিয়া সচকিতে সুধাল। "কবে? কী করে?"

"প্রথম থেকেই। যেদিন তুমি লণ্ডনে পা দিলে সেই দিন থেকে।"

"তুমিও কি সেই দিন থেকে—" সে শরমে শেষ করতে পারল না।

"না, তারও পূর্বে তোমার ছবি দেখে।" কুমার তাকে আলিঙ্গন করল।

হিসাবনিকাশ

১

সুধীর চিত্তকে আচ্ছন্ন করেছিল তার আসন্ন সংসারপ্রবেশ। আর মাস কয়েক পরে তার জীবনের দ্বিতীয় কক্ষ উদ্‌ঘাটিত হবে। কী আছে সেই রুদ্ধদ্বার কক্ষে! কে জানে হয়তো কত আধিব্যাধি, কত দুর্ঘটনা, কতবার কারাদণ্ড, বেত্রাঘাত, গুলি! কত মামলা মোকদ্দমা, তদ্বির তদারক, আদায় উশুল, ঝঞ্ঝাট! থাকলেও থাকতে পারে প্রজাবিদ্রোহ, মহাজনবিদ্বেষ, লুটতরাজ, খুন। কাজ কী এখন থেকে খতিয়ান করে! যখন সে গৃহস্থ হবে তখন তার গৃহ-স্থ ভালোমন্দের সঙ্গে একে একে পরিচয় হবে। তার গৃহ অবশ্য ভারত।

সব সমস্যার সমাধান আছে, যদি থাকে সম্মুখীন হবার মতো শিক্ষা। শিক্ষা তো এতদিনে প্রায় সমাপ্ত হতে চলল। সেকালের আশ্রমগুরুগণ তাঁদের শিষ্যদের বিদায় দেবার সময় যে ভাষায় আশীর্বাদ করতেন তার আভাস রয়েছে উপনিষদে। সুধীর মনে জাগে তেমনি একটি শ্লোক। মনে হয় তার গুরু যেন তাকে বিশেষ করে বলছেন সংসারপ্রবেশের প্রাক্‌কালে—

> "যদর্চিমদ্ যদণুভ্যোঽণু চ
> যস্মিন্ লোকা নিহিতা লোকিনশ্চ
> তদেতদক্ষরং ব্রহ্ম স প্রাণ স্তদু বাঙ্‌মনঃ
> তদেতৎ সত্যং তদমৃতং তদ্বেদ্ধব্যং সোম্য বিদ্ধি।"

যিনি অর্চিমান, যিনি অণুর চেয়েও সূক্ষ্ম, যাঁর মধ্যে লোকসমূহ

রয়েছে, রয়েছে লোকবাসিসমূহ, তিনি অক্ষয় ব্রহ্ম। তিনিই প্রাণ, তিনিই বাক্ মন। সত্য তিনি, অমৃত তিনি, তাঁকে বিদ্ধ করতে হবে, সোম্য, বিদ্ধ কর।

শর যেমন করে লক্ষ্য ভেদ করে তেমনি করে ভেদ করতে হবে তাঁকে, তন্ময় হতে হবে। জীবনের প্রতি কাজে, প্রতি ভাবনায়, প্রতি বাক্যে স্মরণ করতে হবে তাঁকে, যুক্ত থাকতে হবে তাঁর সঙ্গে, স্থিত হতে হবে সেই কেন্দ্রে। কিছুতেই যেন কেন্দ্রচ্যুতি না ঘটে, না ঘটে মূলচ্ছেদ। লক্ষ্যের সঙ্গে যেন শরের বিচ্ছেদ না ঘটে, আর যাই ঘটুক।

"তদ্বেদ্ধব্যং সোম্য বিদ্ধি।" ধ্বনিত হতে থাকে সুধীর শ্রবণে, মনে। তাঁকে বিদ্ধ করতে হবে, সোম্য, বিদ্ধ কর।

করব, বিদ্ধ করব। সুধী কথা দেয়।

অবশেষে সহায় যখন শুনল যে সুধীর গন্তব্যস্থল জেরার্ড্‌স্ ক্রস্ তখন বিস্ময়ের সহিত মন্তব্য করল, "আরে ও তো বহুৎ নজদিগ্ হৈ। গিয়ে সেই দিনই ঘুরে আসা যায়।"

"তা যদি বল," সুধী স্মরণ করাল, "এ দেশে এমন কোন গ্রাম বা নগর আছে যেখান থেকে সেই দিনই ঘুরে আসা যায় না? কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ঘুরে আসা কি সেইদিনই সঙ্গত?"

সহায় আশা করেছিল য়্যাড্‌ভেঞ্চার। সুধীর যুক্তি শুনে জবাব দিল, "না, না। অত কাছে আমি যাব না। সাত সপ্তাহ ধরে প্রস্তুত হচ্ছি যখন, তখন ওয়াই নদীর উপত্যকা কিংবা তেমনি কোনো দুর্গম স্থানে যাব।"

সে বোধহয় জানত না যে ওয়াই নদীর উপত্যকা শুনতে যেমন দুর্গম বাস্তবিক তেমন নয়।

"কোথাও যাওয়া," সুধী বলল, "যদি সেখানকার দৃশ্য দর্শনের জন্যে

হয় তবে ওয়াই নদীর উপত্যকাও তোমাকে সাত দিনের বেশি ধরে রাখতে পারবে না। আর যদি হয় সেখানকার মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের জন্যে তবে জেরার্ড্‌স্‌ ক্রস্‌ থেকেও ঘুরে আসা সহজ নয় সাত সপ্তাহের আগে।”

সহায় ও কথার মর্ম বুঝল না। সহায়ের অভাব পূরণ করতে সুধী আরো খানকয়েক দেশী বই সুটকেসে ভরল। বিদেশে একজন দেশের লোক সঙ্গে থাকলে দেশের সান্নিধ্য উপলব্ধি করা যায়। লোকের অভাবে বই।

প্রতি রবিবার মার্সেলের সহিত অবসরযাপন তার অভ্যাস। এত কালের সেই অভ্যাসে ছেদ পড়বে। মার্সেল তা শুনে এমন গম্ভীর হলো যে ওইটুকু মেয়ের পক্ষে এতটা গাম্ভীর্য অস্বাভাবিক। যেন সে অন্তরে অন্তরে অনুভব করছিল দাদার স্বদেশপ্রয়াণ আসন্ন, এই পল্লীপরিক্রমা তার পূর্বাভাস। আগামী রবিবারে দাদা আসবে না. তার পরের রবিবারেও না, তার পরের রবিবারেও না। তবে আর কবে আসবে? মার্সেল অত ভাবতে পারে না। চুপ করে থাকে।

সুধীর এক একবার মনে হয় জেরার্ড্‌স্‌ ক্রস্‌ যখন এত কাছে তখন মাঝে মাঝে এসে মার্সেলের সঙ্গে দেখা করে যাওয়া অসাধ্য হবে না। কিন্তু আর কয়েক সপ্তাহ পরে যখন কন্টিনেন্টের পথে দেশে ফিরে যাবে তখন তো মাঝে মাঝে এসে দেখা করবার সাধ্য থাকবে না। যা অনিবার্য তা এমনি করে সইয়ে নিতেই হয়। জীবনব্যাপী অদর্শনের পূর্বাভ্যাস এই মাসাধিকের অদর্শন। মার্সেল বুঝেছে ঠিকই। তাকে ভুল বুঝিয়ে তার কিংবা কারো কল্যাণ নেই।

সুধী তাকে প্রতিশ্রুতি দিল যে প্রতি রবিবারে তার নামে তার দাদার কাছ থেকে একটি করে পার্সেল আসবে। ডাক পিয়ন এসে

খোঁজ নেবে, কার নাম মার্সেল, মার্সেল কার নাম। তার নামে পার্সেল, পার্সেলে তার নাম। কী মজা। ডাক পিয়ন কিন্তু বিশ্বাস করতে চাইবে না যে এইটুকু মেয়ের নামে পার্সেল। কাজেই মার্সেলকে ভালো করে খাওয়া দাওয়া করে বেশ মোটাসোটা বড়সড় হাত হবে। তা হলেই ডাক পিয়ন বিশ্বাস করবে যে এই সেই মার্সেল যার নামে পার্সেল।

সুধী বলল সুজেৎকে, "রবিবারগুলোতে ওকে বেড়াতে নিয়ে যেয়ো। বাড়িতে বসে থাকতে দিয়ো না, বসে থাকলে ভাববে। ওকে বোলো, দাদাকে যদিও দেখা যায় না তবু দাদা খুব কাছেই আছে। চিরদিন কাছেই থাকবে, যদিও দেখা হয়তো হবে না।"

সুজেৎ আন্দাজ করেছিল সুধীর এ বাণী শুধু মার্সেলের জন্যে নয়, আর একজনের জন্যেও। সুধী যে তার কাছের মানুষ হয়ে চিরদিন থাকবে এই যথেষ্ট সুখ, দেখা যদিও হবে না। মাধুরীভরা চাউনি দিয়ে সুজেৎ ব্যক্ত করল তার ধন্যতা। বেচারি সুজেৎ। সে বুঝি কোন এক কাব্যের উপেক্ষিতা।

সুধী শুনেছিল জেরার্ডস্ ক্রস্ থেকে সামান্য দূরে স্ট্যান্‌লি ফেয়ারফিল্ড্ বাস করেন। ফেয়ারফিফল্ড্‌কে সে ইংলণ্ডের বিবেক বলে ভক্তি করত, যদিও চাক্ষুষ পরিচয় হয়নি। সন্ধান নিল তাঁর প্রতিবেশী হওয়া সম্ভব কিনা। সুধীর সন্ধান তাঁর কর্ণগোচর হলে তিনি স্বতই তাকে আহ্বান করলেন তাঁর অতিথি হতে। আশাতীত সৌভাগ্য। কিন্তু সুধীর অভিপ্রায় ছিল বাদলকে কাছে রাখতে, পরে যখন উজ্জয়িনী যেতে চাইল তখন তাদের দু'জনকে একত্র রাখতে। সহায়ও কৌতূহলী হয়েছিল। এসব ভেবে সুধী লিখল সে যদি অল্প দিনের জন্যে একা আসত তা হলে তাঁর অতিথি হতে পেলে কৃতার্থ হতো, কিন্তু সদলবলে

মাসাধিকাল তাঁর উপরে অত্যাচার করা অসমীচীন হবে। তিনি তা পড়ে টেলিগ্রাম করলেন, তোমরা সকলেই স্বাগত যতদিন খুশি।

সুধীর বন্ধু ছোট রিজার্ড বললেন, "ফেয়ারফিল্ডকে আপনি চেনেন না। তিনি হচ্ছেন সত্যিকার ক্রিশ্চান। তাঁকে এক মাইল হাঁটতে বললে তিনি দু' মাইল হাঁটেন। ক্লোক চাইলে কোটটাও দেন।"

তার পর বাদল, উজ্জয়িনী ও সহায় একে একে সরে দাঁড়াল। ফেয়ারফিল্ডের আতিথ্য স্বীকার করতে সুধীর নিজের বাধা রইল না, কিন্তু দ্বিধা রইল মাসাধিক কাল সম্বন্ধে। সে কথা সে তাঁকে জানিয়ে রাখল।

জেরার্ডস্ ক্রস্ স্টেশনে তাকে নিতে এসেছিলেন ফেয়ারফিল্ডের পালিতা কন্যা মুরিয়েল। সুধীর চেয়ে বয়সে কিছু বড়, দেখলেই দিদি বলে ডাকতে সাধ যায়। তিনি সংবাদ দিলেন যে ফেয়ারফিল্ড্ স্বয়ং আসতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ঠিক এই সময়ে আরো কয়েকজন তাঁকে দেখতে আসছেন শুনে বাড়ি থাকতে বাধ্য হলেন।

সুধী বলল, "কী অন্যায়! স্টেশনে কারো আসার কী দরকার! আমি কি আমার নিজের লোকদের কাছে আসছিনে?"

মুরিয়েল বললেন, "নিশ্চয়। সকলেই আমরা একই পিতামাতার সন্তান। ঈশ্বর আমাদের পিতা, ধরিত্রী আমাদের মাতা।"

তখন সুধী বলল, "আমরা একই পরিবারভুক্ত। সুতরাং আমি আপনার ভাই, আপনি আমার দিদি।"

পায়ে হাঁটতে হলো সমস্ত পথ। এ দেশে বিছানা বয়ে বেড়াতে হয় না। ছয় সপ্তাহের জন্যে শহরের বাইরে গেলেও কেউ একখানা স্যুটকেসের বেশি নেয় না। কিন্তু সুধীর স্যুটকেসটা একটু ভারী ছিল।

"দিন আমাকে।" মুরিয়েল জোর করে কেড়ে নিলেন।

"আপনি পারবেন না," সুধী অনুযোগ করল, "ওটা আপনার চেয়েও ভারী।"

"আপনি দেখছি গোটা লণ্ডন শহরটাই প্যাক করে এনেছেন। কেন, আমাদের ওখানে কিসের অভাব? বাবা তো আপনার জন্যে পরনের কাপড়ও সাফ করে রেখেছেন।"

সুধী হেসে বলল, "শুনেছি তাঁকে ক্লোক চাইলে কোট মেলে। যাতে কিছু চাইতে না হয় সেজন্যে আমি সবই এনেছি। কিন্তু দিদি, দিন। অন্তত বইগুলো বের করে নিতে দিন।"

সংস্কৃত, হিন্দি ও বাংলা কেতাব দেখে দিদি চমৎকৃত হলেন। তার পর বললেন, "আপনি আমাকে পড়ে শোনাবেন, বুঝিয়ে দেবেন। রাজি?"

"সানন্দে। কিন্তু আপনারই কষ্ট। অনুবাদ করবার পক্ষে আমার ইংরেজী জ্ঞান যথেষ্ট নয়, দিদি।"

বইয়ের বাণ্ডিল বয়ে সুধী পাশে পাশে চলল।

২

ফেয়ারফিল্ড্ সুধীর হাতে মৃদু মৃদু ঝাঁকানি দিয়ে মোলায়েম স্বরে বললেন, "তা হলে তুমিই চক্রবর্তী। এস, এস।"

দীর্ঘকায় বর্ষীয়ান পুরুষ, বহু যুদ্ধের বীর। তাঁর যুদ্ধগুলো সশস্ত্র নয়, স-লেখনী। কিন্তু মসীযুদ্ধেরও বহু দুঃখতাপ আছে, সেই অগ্নিপরীক্ষায় তিনি বারংবার দগ্ধ হয়েছেন। কোথায় পর্তুগিজ আফ্রিকার গহন অরণ্য, কোথায় মরক্কোর মরুভূমি, কোথায় অমৃতসর, কোথায় ডামাস্কাস—যখনি যেখানে অন্যায় অনুষ্ঠিত হয়েছে তখনি সেখানে ফেয়ারফিল্ড্ উপস্থিত হয়েছেন, তদন্ত করেছেন, রিপোর্ট লিখেছেন, রিপোর্ট ছাপা না হলে

আপনি শান্তি পাননি, অপরকেও শান্তি দেননি। ইদানীং তিনি অবসর ভোগ করছেন, বয়সও হয়েছে প্রায় সত্তর।

মুরিয়েল তাঁর এক বন্ধুর কন্যা। বন্ধু ও বন্ধুপত্নী উভয়েই পরলোকে। মেয়েটি কচি বয়স থেকে তাঁকেই বাবা বলে জানে। তিনি নিজে নিঃসন্তান, তাঁর স্ত্রী তাঁকে ছেড়েছেন মতভেদের দরুণ।

"আমার আশা ছিল তুমি তোমার বন্ধুদেরও আনবে, কিন্তু তুমিও যে তাদের মতো পেছিয়ে যাওনি এতেই আমি খুশি।" তিনি সুধীকে তার জন্যে নির্দিষ্ট ঘর দেখিয়ে বাগানে নিয়ে গেলেন। সেখানে আরো জনকয়েক অভ্যাগত ছিলেন, সুধীর সঙ্গে তাঁদের পরিচয় করালেন।

সুধী লক্ষ্য করল তাঁরা কেউ তাঁকে ফেয়ারফিল্ড্ বলে উল্লেখ করলেন না, ডাকলেন স্ট্যানলি কিংবা স্ট্যান বলে। অথচ তাঁরা যে সকলেই তাঁর অন্তরঙ্গ এমন মনে হবার হেতু ছিল না। তাঁর ব্যবহারে এমন কিছু ছিল যা পরকে আপন করে, বাইরের লোককে করে ঘরের লোক। শুধু তাই নয়, তাঁর প্রভাব এমন যে দু'জন অপরিচিত অতিথিও কয়েক মিনিটের মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে চির পরিচিতের মতো বিশ্বাস বিনিময় করে। কিছুক্ষণ যেতে না যেতে দেখা গেল সুধীর নামধাম প্রত্যেকের নোটবুকে উঠেছে, প্রত্যেকেই তাকে সনির্বন্ধ নিমন্ত্রণ করছেন ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে ও শহরে।

পৃথিবীতে অনেক আশ্চর্য বস্তু আছে, কিন্তু গ্রীক নাট্যকার যথার্থ ই লিখেছেন মানুষের মতো আশ্চর্য কিছু নেই। সুধী যতবার বেড়াতে বেরিয়েছে ততবার বিস্ময়াবিষ্ট হয়েছে মানুষের স্নেহমমতায়, আদর আপ্যায়নে। দিন দুই তিন পরে কেউ তাকে বিশ্বাস করে শুনিয়েছে জীবনের গোপনীয় ইতিহাস, কেউ তার পরামর্শ চেয়েছে দাম্পত্য প্রসঙ্গে। অথচ ইংরেজের মতো চাপা স্বভাব নাকি অন্য কোনো জাতির

নয়। এবারেও সুধী অভিভূত হলো সৌজন্যে আত্মীয়তায়। সে ধরে নিয়েছিল গ্রামে যখন যাচ্ছে তখন প্রকৃতিকে পাবে সব সময়। কিন্তু মানুষ কেন তাকে ছাড়বে! শান্তিবাদীদের বৈঠক ব্যতীত এত রকম এত এন্‌গেজমেন্ট এসে জুটল যে তার হাসি পেলো নিজের পূর্ব ধারণায়। এর চেয়ে লণ্ডন ছিল নিভৃত।

ইংলণ্ডের কোনো কোনো গ্রামে এখনো কারুশিল্পের অস্তিত্ব আছে। শিল্পীরা আপন আপন কুটীরে বসে সৃষ্টি করে। কোথাও পশমের খদ্দর, কোথাও হাতে তৈরি লোহার সরঞ্জাম, কাঠের আসবাব, রাফিয়ার ঝুড়ি, কোথাও চীনামাটির বাসন, চামড়ার কাজ, কোথাও বা নক্‌শী কাঁথা পাওয়া যায়। সুধী তার আলাপীদের সঙ্গে দিন ফেলল শিল্পীদের দর্শন করতে। দিদির এতে প্রচুর উৎসাহ, ফেয়ারফিল্‌ডেরও।

সুধী আবিষ্কার করল যে ফেয়ারফিল্‌ড্‌ স্বয়ং দপ্তরীগিরি করেন, বই বাঁধেন। আর দিদি গ্রামের মেয়েদের জন্যে পোশাক বানান, শহুরে ধরণের নয়, লুপ্তপ্রায় প্রাচীন পদ্ধতির। অবশ্য আধুনিক জীবনযাত্রার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে।

একদা সুধীও নিয়মিত চরকা কাটত, কোনো একপ্রকার কারুশিল্প না শিখলে গ্রামের মানুষের সঙ্গে বেমালুম মেশা যায় না। কিন্তু স্বদেশে থাকতেই সে অভ্যাস শিথিল হয়েছিল কলেজের আবহাওয়ায়। বিদেশে আসার পর একেবারেই ছিন্ন হয়েছে। তার পরিবর্তে অন্য কোনো অভ্যাস আয়ত্ত হয়নি, সুধীও সেদিকে মন দেয়নি। একজন দপ্তরীর কাজ, একজন দর্জির কাজ করছেন দেখে সে লজ্জায় বই পড়ায় ইস্তফা দিল। বসে গেল বই বাঁধাই শিখতে। ভারতের গ্রামে যে ওর বিশেষ কোনো প্রয়োজন আছে তা নয়, তবু হাত দুটো যে খাওয়া ভিন্ন আর কিছু জানে না এ গ্লানি যেমন করে হোক মোচন করতে হবে।

ফেয়ারফিল্ড সুধীকে শিক্ষানবীশরূপে লাভ করে আহ্লাদিত হলেন। তাঁকে শিক্ষাগুরুরূপে লাভ করাও সুধীর সৌভাগ্য। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দুজনে নীরবে কাজ করে যান, দু'জনেই অক্লান্ত। ফেয়ারফিল্ড্ বলেন, "ক্রিশ্চান কে? যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যেদিনকার রুটি সেই দিন রোজগার করে।" সুধী শুনে অবাক হয়। খ্রীস্ট ধর্মের এমন অপূর্ব ব্যাখ্যা সে যদি বা কোথাও শুনেছে তবু এমন অকৃত্রিম দৃষ্টান্ত-সহযোগে শোনেনি।

"সার," সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করে সুধী, "যিনি প্রতিদিন বই লিখতে পারতেন তাঁর পক্ষে বই বাঁধাই করা কি বেগার নয়?"

তিনি মুখ না তুলে উত্তর করেন, "না, তা কেন হবে? রোজ এত প্রেরণা কোথায় পাব যে বই লিখব? যখন পাই তখন লিখি বৈকি।"

সুধীর সংশয় যায় না। সে নিবেদন করে, "সার, ক্রিশ্চান কি অহরহ ন্যায়ের জন্যে ক্ষুধিত পিপাসিত নন? তাঁকেও কি প্রেরণার জন্যে প্রতীক্ষা করতে হয়?"

সুধী আরো একটু বিশদ করে, "সার, পৃথিবীতে অন্যায় কি দৈনন্দিন ব্যাপার নয়?"

তিনি এবার মুখ তুলে তাকান। সকরুণ তাঁর দৃষ্টি। "নিশ্চয়। কিন্তু ক্রুসেড যদিও প্রতি নিয়ত প্রয়োজন তবু তার প্রেরণা আসে না প্রত্যহ। যখন আসে তখন রুটির জন্যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলার ফুরসৎ থাকে না। অন্য সময় কিন্তু সেইটেই রুটিন।"

সুধীও বোঝে ন্যায়ের জন্যে সংগ্রাম যদিও সব সময় প্রয়োজন তবু তার আয়োজন করতে বহুকাল লাগে। কিন্তু রুটির জন্যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলা নিয়ে সে একমত হতে পারে না। তার নিজের বেলায়

স্থির আছে সে তার পৈত্রিক বিষয় আশয় দেখবে, কৃষির ও মহাজনীর উপস্বত্ব থেকে সংসার চালাবে, উদ্বৃত্ত বিত্ত গ্রামের জন্যে ব্যয় করবে। সুধীর বিশ্বাস এই হচ্ছে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের আদর্শ। এর মধ্যে কায়িক শ্রমেরও ঠাঁই আছে। সে চাষীর সঙ্গে জুটে হাল ঠেলবে, মাঝির সঙ্গে জুটে দাঁড় ধরবে, কাটুনীর সঙ্গে জুটে সুতো কাটবে। উপরন্তু অধ্যাপনা করবে। যখন আসবে সংগ্রামের আহ্বান তখন সেও তার গ্রামের কামার কুমোর চামার ছুতোর ময়রা মুদি গয়লা মাঝি মজুর চাষী এক জোটে সাড়া দেবে, কেননা তৎপূর্বে সুধী তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে জুটে তাদের এক জোট হতে অভ্যস্ত করেছে। সে তাদের নেতা হতে চায় না, হতে চায় তাদেরই একজন, হলোই বা সে তালুকদার ও মহাজন ও অধ্যাপক ব্রাহ্মণ। তাদের দুঃখসুখের সাথীকে কি তারা পর ভাববে?

এই যদি হয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের আদর্শ, ক্রিশ্চান আদর্শ কি এর থেকে সত্যই স্বতন্ত্র? সত্যিকার ব্রাহ্মণ কি সত্যিকার ক্রিশ্চান নন?

সুধীর ব্যক্তিগত পরিকল্পনায় উপর পরিস্থাপিত এই প্রশ্ন শুনে ফেয়ারফিল্ড্ চিন্তিত হন। অনেকক্ষণ ইতস্তত করে এক সময় বলেন, "তোমাকে কেমন করে সাহায্য করব, সুধী? আমি যে মাত্র একটি আদর্শের সঙ্গে পরিচিত। বল দেখি, ব্রাহ্মণ কি ডাক শুনলে গৃহিণী, সন্তান, আশ্রিত, আত্মীয়, বন্ধু—সবাইকে ছাড়তে প্রস্তুত? গৃহ, গৃহপালিত পশু, সঞ্চয়, সম্পত্তি—সব ছাড়তে?"

সুধী চট করে জবাব দেয় না, অন্তর অন্বেষণ করে। সে কী কী ছাড়তে পারে, কাকে কাকে ছাড়তে পারে, গণনা করে। বুকটা দমে যায়। ব্রাহ্মণ যদি সব ছাড়তে, সবাইকে ছাড়তে, পারত তবে সাতশো

বছর পরাধীন হতো না তার দেশ। ক্রিশ্চান তা পারে বলেই অর্ধেক ধরণীর অধীশ্বর।

"ব্রাহ্মণ," সুধী বিনতির সহিত বলে, "আপ্রাণ চেষ্টা করবেন সবাইকে সঙ্গে নিতে। ছাড়তে হয় তারাই তাঁকে ছাড়বে, তিনি কেন কাউকে ছাড়বেন! সম্পত্তি সম্বন্ধেও সেই কথা।"

ফেয়ারফিল্ড্ ধরতে পারেন না। তাকান।

সুধী বোঝায়, "যুধিষ্ঠির যখন দুর্গম পন্থায় যাত্রা করেন তখন স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়েছিলেন, ভাইদেরকেও। তাঁরা তাঁকে একে একে ছাড়লেন, চলতে চলতে পড়লেন, আর উঠলেন না।"

"আর সম্পত্তি?"

"সম্পত্তি তার নিজের নিয়মে বাড়বে বা কমবে, আসবে বা ছাড়বে। আমি সে বিষয়ে নির্লিপ্ত। যেমন সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত ভোগ করি তেমনি ভোগ করব পার্থিব সম্পত্তির উদয়াস্ত। দারিদ্র্যকে আমি ভয় করিনে, ঐশ্বর্যকেও না।"

ফেয়ারফিল্ড্ গভীরভাবে বলেন, "দরিদ্রের আশা আছে, ধনীর ধন থাকতে নেই স্বর্গরাজ্যের আশা। ক্রিশ্চান যদি দীন দরিদ্র না হয় তবে ক্রশ বইতে অক্ষম, ক্রুসেডের অযোগ্য। এ যেমন সম্পত্তি সম্বন্ধে নির্দেশ তেমনি স্বজন' সম্বন্ধে অনুশাসন—'He that loveth father or mother more than me is not worthy of me ; and he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me. And he that taketh not his cross, and followeth after me is not worthy of me.'"

বলতে বলতে তাঁর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আসে। সারা জীবনের দুঃখ আভাসিত হয় আননে।

৩

সত্যিকার ব্রাহ্মণের সঙ্গে সত্যিকার ক্রিশ্চানের তবে এইখানে প্রভেদ যে প্রয়োজনকালে সংগ্রাম করতে একজন একাকী উদ্যত, আর একজন অপর দশ জনের মুখাপেক্ষী। আমরা যে হেরেছি তার কারণ আমরা ডাক শুনে ডাকাডাকি করেছি, লোক জড় হবার আগে লড়াইয়ের লগ্ন উত্তীর্ণ হয়েছে। অতীতে যা হয়েছে ভবিষ্যতেও তাই হতে পারে, এ কথা মনে উদয় হতেই সুধীর মনটা কেমন করে।

তা হলে কী করতে হবে? অপর দশজনের জন্যে অপেক্ষা না করে একা অগ্রসর হতে হবে, গুলির সামনে বুক পেতে দিতে হবে, আগুনের উপর জল ঢালতে হবে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে খাড়া হতে হবে। একজনের বীরত্ব দেখলে আরো দশজন সাহস পাবে, একজনের পরাক্রম দেখলে আরো দশজন বল পাবে। সহস্র বক্তৃতায় যা হবার নয় একটিমাত্র দৃষ্টান্তে তা হবে। কিন্তু নাই বা হল কিছু, নাই বা এলো কেউ। একজনের অগ্রগমন সমগ্র দেশেরই অগ্রগমন, একজনের সংগ্রাম সমগ্র দেশেরই সংগ্রাম, একজনের "না" সমগ্র দেশেরই "না।" লগ্ন উত্তীর্ণ হবার আগে বরযাত্রীরা যদি হাজির না হয় তা হলেও বিয়ে বন্ধ থাকে না, যদি বর সময়মতো পৌঁছায়।

তা বলে কি গ্রামের কামার কুমার চামার ছুতোরকে ডাকা হবে না? ময়রা মুদি গয়লা মাঝির একজন হতে হবে না? মুচির সঙ্গে জুতো সেলাই বামুনের সঙ্গে চণ্ডীপাঠ করতে হবে না? অবশ্য, অবশ্য, অবশ্য। সুধীর প্রোগ্রাম যেমন আছে তেমনি থাকবে, শুধু তার সঙ্গে জুড়তে হবে ফেয়ারফিল্ডের উদ্যত ভাব। সুধীকে এমনি বেপরোয়া হতে হবে। এমনি অনপেক্ষ।

সুধীর শান্তিবাদী বন্ধুরা সমবেত হলে সে তাঁদের বৈঠকে যোগ দিতে থাকল। বেশির ভাগই ঘরোয়া বৈঠক।

টাউনসেণ্ড বললেন, "আমরা বৃত্তাকারে ঘুরছি, বৃত্তের বাইরে বেরোতে পারছিনে, এই হয়েছে মুশকিল। যুদ্ধ যতদিন বাধেনি ততদিন আমাদের হাতে কাজ রয়েছে, কিন্তু যুদ্ধ যদি কোনো গতিকে একবার বাধে", তিনি গলা পরিষ্কার করলেন, "তা হলে আমরা জেলে যাওয়া ছাড়া কী যে করতে পারি ভেবে পাইনে। যাই করি না কেন, সাহায্য করা হবে, সায় দেওয়া হবে। আহতের শুশ্রূষাও বিগ্রহের সাহায্য।"

ব্রিজার্ড বসেছিলেন গালে হাত দিয়ে। বললেন, "জানিনে। কিন্তু এমন কিছু করতে চাই যাতে যুদ্ধ থামে। শুধু আহতের শুশ্রূষা করে কী হবে, আহত যাতে আর না হয় তাই করণীয়।"

"আমিও," বললেন রেভারেণ্ড বার্নেট, "মনে করি তাই। এমন কিছু করতে হবে যাতে ভ্রাতৃহত্যা বন্ধ হয়। তেমন কিছু," তিনি দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, "আমাদের প্রভুর অনুসরণ।"

"তার মানে কী, বব?" টাউনসেণ্ড কৌতূহলী হলেন।

"আমি আমাদের প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে বলব আমাকে অনুমতি দিন অপর পক্ষের প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে। অনুমতি পেলে বার বার দেখা করব দু' জনের সঙ্গে, প্রাণপণ চেষ্টা করব একটা সম্মানজনক নিষ্পত্তিপত্র দু' জনকে দিয়ে স্বাক্ষর করাতে।"

টাউনসেণ্ড বলে উঠলেন, "বেচারা বব!"

বার্নেট বলতে লাগলেন, "যখন দেখব নিষ্পত্তির লেশমাত্র সম্ভাবনা নেই, দু'জনেই নাছোড়বান্দা, তখন—"

মিস মার্শল কণ্ঠক্ষেপ করলেন, "তখন?"

"তখন আর কী!" বার্নেট আবেগভরে বললেন, "তখন আমাদের

সেনাপতির সঙ্গে দেখা করে বলব, আমাকে গুলি কর। না করলে আমি প্রত্যেকটি সৈনিককে বোঝাব ভ্রাতৃহত্যায় অনন্ত নরক।"

"আহ্!" বললেন মিস মার্শল। "তোমার প্রবর্তনায় যদি এ পক্ষের লোক লড়াই ছেড়ে দেয় ও পক্ষের লোক উড়ে এসে জুড়ে বসবে। তাতে ভ্রাতৃহত্যা বন্ধ হতে পারে, ক্রীতদাসত্ব শুরু হবে, বব।"

বার্নেট বললেন, "ক্রীতদাসত্ব শুরু হলে কী করব জানিনে, জানতে চাইনে। তখনকার কথা তখন ভাবব এবং প্রভুর কাছে প্রার্থনা করব, মড।"

"ওটা কোনো কাজের কথা নয়।" মড মাথা নাড়লেন।

"পরাধীনতা নৈব নৈব চ।" মুখ খুললেন ফেয়ারফিলড্।

"স্ট্যান।" টাউনসেণ্ড অনুরোধ করলেন, "তুমিই বল।"

"বব," ফেয়ারফিলড্ সম্বোধন করলেন বার্নেটকে, "তুমি ধরে নিচ্ছ যে দুই প্রধান মন্ত্রীই সমান অবুঝ। কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে আমাদের মন্ত্রীরা তোমার সম্মানজনক নিষ্পত্তিতে রাজি, অথচ অপর পক্ষ নারাজ। যদি অভ্রান্তরূপে জানতুম যে আমাদের দিকেই অন্যায় তা হলে তোমার কর্মপদ্ধতি সমর্থন করতুম, বব। কিন্তু অন্যায় তো অপর পক্ষের হতে পারে।"

বার্নেট ব্যাকুলভাবে বললেন, "কে বিচার করবে! কে বিচার করবে! আমি কি অভ্রান্ত! তুমি কি অভ্রান্ত!"

"সেইখানেই তো ফ্যাসাদ।" টাউনসেণ্ড মুচকি হাসলেন। যেন তিনি জানতেন এ প্রশ্ন উঠবে।

"সেইজন্যেই আমি ধরে নিচ্ছি যে ভ্রাতৃহত্যা নিজেই একটা অন্যায়। রাজনীতির ন্যায় অন্যায় বুঝিনে, ধর্মনীতির অন্যায়ই আমার পক্ষে যথেষ্ট।" বলে বার্নেট দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন।

"না, না।" ফেয়ারফিল্ড্ ছাড়লেন না। "অমন করে এড়িয়ে গেলে চলবে না। যারা কারুর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেনি, অত্যন্ত নির্বিবাদী জাতি, যারা কিছুমাত্র অন্যায় করেনি, যাদের একমাত্র অপরাধ তাদের ভৌগোলিক অবস্থান, তেমন জাতিকে যদি কেউ হঠাৎ আক্রমণ করে তবে কি তারা প্রবলের উদ্ধত অন্যায় পড়ে পড়ে সহ্য করবে? প্রতিরোধ করবে না?"

সকলেই অনুমানে বুঝলেন বেলজিয়ামের কথা হচ্ছে। নিঃশব্দে সমর্থন করলেন।

"প্রতিরোধ", বার্নেট স্বীকার করলেন, "করবে বৈকি। কিন্তু খ্রীস্টীয় উপায়ে।"

"খ্রীস্টীয় উপায়," ফেয়ারফিল্ড্ জেরা করলেন, "বলতে ঠিক কোন জিনিসটি বোঝায়? মাফ্ কোরো আমার অজ্ঞতা।"

বার্নেট নিরুত্তর রইলেন। ব্লিজার্ড তাঁর তরফ নিয়ে বললেন, "আর যাই হোক নরহত্যা নয়। নরহত্যার বিরুদ্ধে অতি স্পষ্ট নিষেধ রয়েছে, স্ট্যান। 'Thou shalt not kill.' তোমার মতো খাঁটি ক্রিশ্চানকে কি তা মনে করিয়ে দিতে হবে?"

ফেয়ারফিল্ড্ মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। ছোট ব্লিজার্ড পিতার সঙ্গে তর্কে নামলেন। বললেন, "কিন্তু নিয়মমাত্রেরই নিপাতন আছে।"

বড় ব্লিজার্ড জিজ্ঞাসা করলেন, "আরো নয়টি নিষেধবাক্যেরও নিপাতন আছে কী?"

জন এদিক ওদিক তাকালেন। 'ব্যভিচার করিও না।' এই নিষেধবাক্য কি নিপাতননিরপেক্ষ নয়? তবে হত্যার বেলায় নিপাতন কেন?

ফেয়ারফিল্ড্ বিনীতভাবে বললেন, "বব, তোমার সঙ্গে আমি বহু

পরিমাণে একমত। শুধু ঐ খ্রীস্টীয় উপায় নিয়ে পনেরো বছর ধরে কলহ করে আসছি। আর রনি, তুমি যে নিষেধবাক্যের উল্লেখ করলে সেইটেই চরম যুক্তি। তার নিপাতন নেই। কিন্তু আমি ও নিষেধ অমান্য করব, করে অনন্ত নরকে পুড়ব, তবু পরাধীনতার জীবন্ত কবরে এ দেশের কিম্বা ও দেশের কিম্বা কোনো দেশের লোককে পচতে দেব না। বলতে পারো আমি ক্রিশ্চান নই। তা হোক, কিন্তু আমি ন্যায়বান।"

ব্যস্ত হয়ে ব্লিজার্ড বললেন, "তুমি যে ক্রিশ্চান তথা ন্যায়বান এ বিষয়ে সন্দেহ করবার অধিকার আছে কার? তোমার জীবনটাই তো সাক্ষ্য। কিন্তু স্ট্যান, তুমি ক্রিশ্চান হলে কী হয় উপায়টা খ্রীস্টীয় কি না সন্দেহ। অন্তত আমার তো সন্দেহ ঘুচল না। পরাধীনতা ঘৃণ্য, কিন্তু পরহত্যা পাপ। আমি পাপ করব কোন সাহসে? যদি একটা করি আর একটা করতে বাধা কিসের?"

"ওটা হচ্ছে দুর্বল চিত্তের পরিচায়ক।" ফেয়ারফিল্ড্ মন্তব্য করেই মাফ চাইলেন। "আমি পাপ করব পরম সাহসে। এবং একটাই করব, আর একটা নয়। ততখানি আত্মসংযম আমার আছে।"

"প্রভু তোমাকে ত্রাণ করবেন।" বার্নেট অভয় দিলেন।

টাউনসেণ্ড এতক্ষণ চুপ করে শুনছিলেন। বললেন, "স্ট্যানলির শান্তিবাদ যে পর্বতে চূর্ণ হচ্ছে সেটার নাম ন্যায়সম্মত উপায়। তাঁর বিশ্বাস নরহত্যাও ন্যায়সম্মত, যদি হয় ক্রুসেডের সামিল। যা ন্যায়সম্মত তা খ্রীস্টীয় হোক বা না হোক, তাই ক্রিশ্চানের বরণীয়। কেমন, স্ট্যান, ঠিক বুঝেছি কি না?"

"অবিকল বুঝেছ।" ফেয়ারফিল্ড্ মানলেন।

"এখন আমাদের মুশকিল হয়েছে এই যে আমরা যে উপায় অবলম্বন করতে চাই তা যদি কেবল ন্যায়সম্মত হয়, খ্রীস্টীয় না হয়, তা হলে আমরা

পূর্ণ হৃদয়ে প্রতিরোধ করতে পারিনে, বিবেকে বাধে। আমরা চাই যে সে উপায় যেমন ন্যায়সম্মত হবে তেমনি খ্রীস্টীয় হবে। ঠিক বোঝাতে পেরেছি কি ?"

"ঠিক, ঠিক।" সাড়া দিলেন মিস মার্শল, বৃদ্ধ ব্লিস্তার্ড, আরো অনেকে।

"আমি জানি যে নরহত্যাও ন্যায়সম্মত হতে পারে, যদি হয় ক্রুসেডের সামিল। নইলে Thoreau কী করে সুখ্যাতি করতেন জন ব্রাউনের —যে ব্রাউন নিগ্রো দাসদের স্বহস্তে মুক্ত করবার জন্যে দাসব্যবসায়ীদের স্বহস্তে খুন করেছিলেন ?"

"আমিও", ফেয়ারফিল্ড্ জানালেন, "সুখ্যাতি করি।"

"তুমি," টাউনসেণ্ড অনুযোগ করলেন, "আমাদের মধ্যে সেরা ক্রিশ্চান হয়েও কী করে তা পারো ? যা ন্যায়সম্মত তা কি সব সময়ে খ্রীস্টীয় ?"

"আমার কাছে খ্রীস্টীয়তার অন্য কোনো মাপকাটি নেই। আমার বিশ্বাস যা ন্যায়সম্মত তাই খ্রীস্টীয়।" ফেয়ারফিল্ড্ নরম স্বরে বললেন।

"আমরা তোমাকে শ্রদ্ধা করি, স্ট্যান। কিন্তু তোমার সঙ্গে আমাদের মতভেদ দেখছি বদ্ধমূল।" ব্লিস্তার্ড রায় দিলেন।

"কিন্তু পরাধীনতা সম্বন্ধে," মিস মার্শল কণ্ঠক্ষেপ করলেন, 'তোমাদের কারো কারো সঙ্গে আমারও মতভেদ বদ্ধমূল, রনি। সে দিক থেকে স্ট্যান আমার নিকটতর।"

"সব সময় না।" ফেয়ারফিল্ড্ মাথা নাড়লেন। "যদি দেখি যে অন্যায় আমাদের মন্ত্রীদের, আক্রমণ আমরাই করেছি বা অপরকে আক্রমণের উপযুক্ত কারণ দিয়েছি, তবে বোয়ার যুদ্ধের সময় যা করেছিলুম তাই করব। পদে পদে বাধা দেব, লোকমত গঠন করব।

সে বারে আমি প্রার্থনা করেছিলুম, হে ঈশ্বর, আমার দেশ যেন হারে। অন্যায় দেখলে আবার সেই প্রার্থনা করব। নিজের দোষে দেশ যদি পরাধীন হয় যথাকালে পরাধীনতারও প্রতিরোধ করব, মড। পরাধীনতার ভয়ে অন্যায়কারীর হাতে হাত মেলাব না। সে হাত খুনীর।"

মুরিয়েল সুধীর কানে কানে বললেন, "এবার আপনার পালা।"

সুধী বলল, "এখনো নয়। এবার জনের।"

জন অর্থাৎ ছোট ব্রিজার্ড সুধীর পাশে বসেছিলেন। আলাপে যোগ দিয়ে বললেন, "একবার পরাধীন হলে তারপরে কি প্রতিরোধশক্তি থাকে? থাকলে সে আর কতটুকু? বিজেতার প্রথম কাজই হবে অস্ত্র কেড়ে নেওয়া। দ্বিতীয় কাজ ভেদনীতির বীজ বপন করা। প্রতিরোধের যতই বিলম্ব হবে প্রতিরোধশক্তিরও ততই অভাব হবে। দেশ তখন স্বাধীনতার জন্যে বিজেতার দ্বারে ধর্ণা দিয়ে বা আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর উপর বরাত দিয়ে অমানুষ হবে। কাজেই পরাধীন হতে দেওয়া কিছুতেই চলতে পারে না, সার। নিজের দোষেও না, নিজের লোকের প্রার্থনার ফলেও না। আপনি যদি পদে পদে বাধা দেন আপনাকে বন্দী করা হবে। দুঃখিত।"

ফেয়ারফিল্ড্ প্রতিধ্বনি করলেন, "দুঃখিত।"

মিস মার্শল শান্তিবারি সেচন করে বললেন, "ইংলণ্ড কখনো অন্যায় করবে না। আমরা অবহিত থাকব।"

৪

টাউনসেণ্ডের দৃষ্টি যখন সুধীর উপর পড়ল তখন সে বুঝতে পারল এবার তাকে কিছু বলতে হবে। মনে মনে প্রস্তুত হতে থাকল।

"আমাদের ভারতীয় বন্ধু," টাউনসেণ্ড আহ্বান করলেন, "হয়তো এই বৃত্ত থেকে আমাদের উদ্ধার করবেন।"

সুধী বিনীতভাবে বলল, "আমিও জিজ্ঞাসু। আমার সাধ্য কী যে উদ্ধার করি!"

"তোমার সুবিধা এই যে তুমি এমন একটি দেশ থেকে এসেছ যে দেশে কিছু কাজ হচ্ছে। আমাদের তো কেবল কথার কচকচি।" বললেন ব্লিজার্ড।

"আপনি আমার দেশকে স্নেহ করেন বলেই ও কথা বলতে পারছেন। কিন্তু আমি তো জানি কাজ কতটুকু হচ্ছে।"

"আপনি," বললেন বার্নেট, "এমন একটি দেশ থেকে আসছেন যেখানে খ্রীস্টীয় উপায়ের অনুশীলন হচ্ছে। সেদিক থেকে আপনার সাক্ষ্য মূল্যবান।"

সুধী ক্ষণকাল আত্মস্থ হয়ে বলল, "কোনটা ন্যায়সম্মত কোনটা খ্রীস্টীয় এসব বিশেষণের বদলে আমি ব্যবহার করতে চাই আর এক জোড়া বিশেষণ। আমি বলব যুদ্ধে সচরাচর যে উপায় ব্যবহৃত হয় সেটা পুরাতন, যেটা আমরা ভারতবাসীরা ব্যবহার করতে চেষ্টা করছি সেটা নূতন। কামান, বিমান, ডুবো জাহাজ, এ সব আমার মতে পুরানো, যদিও এদের উদ্ভাবকদের মতে আনকোরা। অহিংস অসহযোগ হচ্ছে নতুন, যদিও মানুষের ইতিহাসে এর প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ অগণ্য।"

জন বললেন, "সিভিল ও মিলিটারি এ দুটি বিশেষণের দোষ কী?"

সুধী বলল, "আছে দোষ। সিভিলও অনেক সময় প্রচ্ছন্ন মিলিটারি। কিন্তু যতই বিবেচনা করবেন ততই বুঝতে পারবেন কেন আমি অন্য এক জোড়া বিশেষণ ব্যবহার করছি। ইতিমধ্যেই আরো কত রকম

নামকরণ হয়ে গেছে। যথা, সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয়। আমার মতো যাঁরা বিশ্বাস করেন যে একটা উপায় এখনো অপরীক্ষিত, এখনো পরীক্ষণাগারে আবদ্ধ, তাঁরা তাকে নতুন উপায় বলেই উল্লেখ করবেন। তার যে কত বৃহৎ সম্ভাবনা তা একমাত্র ঐ বিশেষণেই ব্যক্ত হয়।"

ফেয়ারফিল্‌ড্‌ বললেন, "আমি যখন তোমাদের দেশে গেছলুম তখন ওর একটু ইঙ্গিত পেয়েছিলুম, কিন্তু এখনো বিশেষ ওয়াকিবহাল নই। তুমি কি সত্যি জানো ভারত ঐ অস্ত্রে জিতবে?"

"ফলাফল ঈশ্বরের হাতে। আমরা শুধু যত্ন করতে পারি।" সুধী বলল।

"হয়তো ইংরেজের সঙ্গে সংঘাতে। কিন্তু আফগান, রুশ, জাপানী—এদের সঙ্গে রণ করে জিতবে কি?" মিস মার্শল এমন স্বরে সুধালেন যেন ওর উত্তর সম্বন্ধে তিনি নিঃসন্দেহ।

সুধী লক্ষ্য করেছিল শান্তিবাদীদের অনেকেরই মর্মগত ধারণা ভারতের সত্যাগ্রহ কেবল ইংরেজের সঙ্গেই সম্ভবপর, উত্তর পশ্চিমের হিংস্র উপজাতি অথবা এশিয়ার অন্যান্য দুর্দ্ধর্ষ জাতির সঙ্গে নয়।

বলল, "নূতন অস্ত্রের কোনখানে নূতনত্ব তা যদি উপলব্ধি করি তবে পুরাতন অস্ত্রধারীমাত্রেরই আক্রমণ প্রতিহত করতে পারি। কার্যতঃ পারব কি না কেমন করে বলব!"

টাউনসেণ্ড চুপ করে শুনছিলেন। প্রশ্ন করলেন, "কোনখানে?"

"এইখানে যে প্রতিপক্ষের হৃদয় জয় করাই এর উদ্দেশ্য।" সুধী চেয়ে দেখল বার্নেটের চোখে স্বর্গীয় আভা।

"আমরা ভারতের লোক আমাদের ইংরেজ শাসকদের হৃদয় জয় করতে পারি এ বিশ্বাস আমাদের আছে, এর কারণ এ নয় যে অন্যান্য জাতিদের হৃদয় নেই। এর কারণ অন্য কারো সঙ্গে আমাদের এ জাতীয়

সম্পর্ক নেই। যদি কোনো দিন হয় তবে হৃদয়জয়ের একই অস্ত্র ব্যবহৃত হবে।"

"তুমি যাকে হৃদয় জয় বলছ," ব্লিজার্ড দুষ্টুমি করে বললেন, "সেটা পকেট জয়। তোমরা আমাদের কাপড়ের কলগুলো জখম করেছ, এর পরে আর কী কী জখম করবে তোমরাই জানো।"

ফেয়ারফিল্ড্ বললেন, "বেশ করেছ। আমাদের হৃদয় তো আমাদের পকেটে।"

"সেইখানে হাত ঢুকিয়ে একদিন হৃৎপিণ্ডের নাগাল পাব, জানি। কিন্তু রহস্য থাক। ল্যাঙ্কাশায়ারের জখমের জন্যে আমরা দুঃখিত। কী করা যায়! যুদ্ধমাত্রেরই পরিণাম জখম। অহিংস হলেও তা যুদ্ধ। কিন্তু আমরা আপনাদের বন্ধুতা চাই, সেইজন্যে আমাদের অস্ত্র আপনাদের আর্থিক বিপর্যয় ঘটালেও এমন কোনো অহিত করবে না যাতে বন্ধুতা পরাহত হয়।"

সুধীর কণ্ঠস্বরে বজ্রের দৃঢ়তা, কিন্তু তার উচ্চারণ কুসুমকোমল।

আর্থিক বিপর্যয় শুনেই কারো কারো চক্ষু চড়ক গাছ। দু'চার লাখ সৈনিকের মৃত্যু তার তুলনায় ছেলেখেলা।

"আর্থিক বিপর্যয়?" টাউনসেণ্ড কী যেন শুঁকলেন।

"না, বোলশেভিজম নয়।" সুধী হাসল। "বোলশেভিকরা হৃদয় জয় করে না, অন্তরের পরিবর্তনে আস্থাহীন।"

টাউনসেণ্ড বিনা বাক্যে বললেন, "তাই বল!"

ফেয়ারফিল্ড্ জানতে চাইলেন পুরাতন অস্ত্রের সঙ্গে বলপরীক্ষায় নূতন অস্ত্রের কতটুকু আশা।

সুধী বলল, "ষোলো আনা। পুরাতন অস্ত্র দিয়ে পুরাতন অস্ত্র ঠেকানো যায়, তাতে জয়ের আশা আট আনা আট আনা। কিন্তু

নতুন অস্ত্র দিয়ে পুরোনো অস্ত্রকে একেবারে অকেজো করে দেওয়া যায়। শূন্যে তরোয়াল ঘোরালে কেউ না কেউ কাটা পড়তে পারে, কিন্তু কাটবার আনন্দে কি সৈনিক যুদ্ধে যায়? ও তো কসাইয়ের কাজ। সৈনিক চায় তলোয়ারের অঙ্গে তলোয়ারের ঝঞ্ঝনা। সৈনিক চায় মারণের সঙ্গে মরণের উত্তেজনা। যেখানে মরবার ভয় নেই, কেবল মারবার ধুম, সেখানে সৈনিকের সুখ নেই, তার অস্ত্রেরও অতৃপ্তি। সুতরাং পুরাতন অস্ত্র নূতনের কাছে নিষ্প্রভ।"

"কী জানি!" ফেয়ারফিল্ড্ চিন্তিত হলেন। "তোমার উক্তি হয়তো সত্য। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা অন্যরূপ। আমি এমন সৈনিকও দেখেছি যারা পৈশাচিক ভাবে অত্যাচার করেছে, নিরস্ত্রদের নিরীহতার সুযোগ নিয়েছে। কসাই ওদের চেয়ে ভালো, কারণ কসাই তো স্বজাতিহিংস্রক নয়, কসাই তো মানুষ মারে না। প্রার্থনা করি তোমাদের দেশে অমৃতসরের পুনরাবৃত্তি না ঘটুক। কিন্তু অন্যত্র ঘটতে পারে। ইংলণ্ডে ঘটতে পারে। কাজেই তুমি আমাদের পুরাতন অস্ত্র বর্জন করতে বোলো না। আট আনা ভরসাও কম নয় হে। এক আধ আনার চেয়ে বেশি।"

সুধী মাথা নোয়াল। এ নিয়ে কি তর্ক করা চলে!

ব্লিজার্ড বললেন, "তা হলে শান্তিবাদের নাম করা কেন? এ পাট তুলে দিলেই হয়।"

"না, শান্তিবাদেরও প্রয়োজন আছে। কিন্তু তার অর্থ collective security. কোনো নেশন যুদ্ধ বাধালে বাকি সব নেশন মিলে sanctions প্রয়োগ করবে। তাতেও যথেষ্ট শিক্ষা না হলে মারণাস্ত্র প্রয়োগ করবে। ক্রিশ্চানের কর্তব্য হচ্ছে দুর্বলের রক্ষণ, দুষ্টের দমন।"

৫

সুধীর সঙ্গে যাঁর সবচেয়ে মতের মিল তাঁর নাম ম্যাক্স্ আণ্ডারহিল। মধ্যবয়সী, সুগঠিতদেহ, কুঞ্চিত কেশ, গ্রীক স্ট্যাচুর মতো দেখতে।

তিনি সুধীর পক্ষ নিয়ে বললেন, "ঈশ্বর না থাকলে যেমন ঈশ্বরকে উদ্ভাবন করতে হয় তেমনি নতুন অস্ত্রকে। পুরাতন অস্ত্রের উপর ভরসা রাখা মানে তো পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মারণাস্ত্রনির্মাণ। তার কি সীমা আছে?"

ফেয়ারফিল্ড্ বললেন, "ঐ যে বলেছি, collective security. সকলের অস্ত্র একত্র করবার ব্যবস্থা থাকলে পাল্লা দেবার প্রশ্নই ওঠে না।"

"নিশ্চয় ওঠে।" ম্যাক্স্ মাফ চাইলেন। "অবশিষ্টের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে নেশনটা বিগ্রহ বাধাবে সে কি প্রস্তুত না হয়ে বাধাবে? তার প্রস্তুত হওয়া, অবশিষ্টের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মারণাস্ত্র সংগ্রহ করা। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অবশিষ্টও তাই করবে। কে জানে সেই নেশনটা কোন্ নেশন, কত দূর তার দৌড়! যদি রাশিয়া হয় তবে তার পাল্লার পরিধি অনেক দূর। সুতরাং আমরা যদিও অবশিষ্টের সামিল তবু আমাদের ভাগে অস্ত্রশস্ত্রের পরিমাণ খুব বেশি না হলেও খুব কম পড়বে না, স্ট্যান।"

জন প্রতিবাদ জানালেন। "রাশিয়া," তিনি বললেন, "সে নেশন নয়। রাশিয়া কারো সঙ্গে যুদ্ধ বাধাতে চায় না, বাধাতে চায় ফাসিস্ট ইটালী।"

ফেয়ারফিল্ড্ বললেন, "যদি খুব বেশি না পড়ে তবে তোমার উক্তি তোমার যুক্তির প্রতিকূল। নতুন অস্ত্রের আবশ্যকতা ভারতবর্ষের মতো নিরস্ত্র দেশে রয়েছে, যদিও তার সাফল্য সম্বন্ধে আমি সন্দিহান। এ দেশে তার আবশ্যক কী?"

"সেই কথাই বোঝাতে চেষ্টা করছি।" ম্যাক্স্ বললেন, "আমি রাশিয়ার দৃষ্টান্ত দেওয়ায় জন আমাকে সাম্যবাদবিরোধী সমঝেছে। আচ্ছা, এবার উদাহরণ দিই রুরিটানিয়ায়। রুরিটানিয়া যদি বিশ বছর ধরে লুকিয়ে লুকিয়ে তৈরি হতে থাকে তবে বিশ বছরের শেষে হঠাৎ আমাদের ঘুম ভাঙবে। আমরা দেখব আমাদের ও রুরিটানিয়া ব্যতীত অন্যান্য দেশের যেসব মারণাস্ত্র আছে সে সব একত্র করলেও জয়ের আশা নেই। আমরা তখন উর্ধ্বশ্বাসে অস্ত্রনির্মাণ আরম্ভ করে দেব। কিন্তু তার আগে রুরিটানিয়া হয়তো গোটাকয়েক দেশকে ঘায়েল করে তাদের অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নিয়েছে। পরের বলে বলীয়ান হয়ে সে যখন আমাদের অভিমুখে অগ্রসর হবে তখন অবশিষ্ট নেশন বলতে হয়তো পাঁচটি কি সাতটি। স্ট্যান, তখন তোমাকে বাধ্য হয়ে উদ্‌ভাবন করতে হবে নতুন অস্ত্র, যে অস্ত্রের ব্যবহার রুরিটানিয়া জানে না। স্ট্যান, এমনি করে ইতিহাস সৃষ্টি হয়। যাদের সমপরিমাণ প্রস্তরাস্ত্র ছিল না তারা বুদ্ধি খাটিয়ে ধাতব অস্ত্র উদ্‌ভাবন করেছিল। কোণঠাসা হয়ে মানুষ ক্রমাগত নতুন অস্ত্র উদ্‌ভাবন করে এসেছে, আমাদের যুগে সেই নতুন অস্ত্র হচ্ছে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ।"

এবার কণ্ঠক্ষেপ করতে হলো সুধীকে। "নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ কথাটি আমার নয়, কারণ আমার দেশে যে অস্ত্রের পরীক্ষা চলেছে তা সর্বতোভাবে সক্রিয়, যদিও তার দ্বারা কারো প্রাণহানি অঙ্গহানি বা যাতনাভোগ ঘটবে না। কষ্ট যা কিছু তা মনের।"

"এবং," ব্লিজার্ড চোখ টিপলেন, "পকেটের।"

"না, পকেটেরও নয়। প্রতিপক্ষ ইচ্ছা করলে লুটের ধনে পকেট বোঝাই করতে পারে। ক্রিশ্চানরা ক্লোক চাইলে কোটটাও দেন। আমরা বলি, শুধু কোট কেন, সব নাও, নিয়ে বিদায় হও।"

কেউ কেউ হেসে উঠলেন, কিন্তু কারো কারো বুকে তীর বিঁধল।

"আমরা তো বিদায় হতেই চাই," গম্ভীরভাবে বললেন মিস মার্শল, "কিন্তু নাবালকদের প্রতি আমাদের তো একটা ঐতিহাসিক দায়িত্ব আছে। আমরা চলে এলে মাইনরিটিদের যে কী দশা হবে তাই ভেবে আমাদের আসার দেরি হচ্ছে। কিন্তু আসবই আমরা একদিন। থাকব না, ঠিক জেনো।"

"ধন্যবাদ।" সুধী হাসি চাপল। "নাবালকরা ততদিনে সাবালক হয়ে থাকবে। প্রত্যেকেই এক একটা মেজরিটি!"

মুরিয়েল সুধীকে চোখের ইশারায় নিবৃত্ত হতে বললেন। সুধীও জানত যে ভারত সম্বন্ধে অধিকাংশেরই একটু দুর্বলতা ছিল। এমন কি স্বয়ং ফেয়ারফিল্ডের। যদিও জালিয়ানওয়ালাবাগের পর্বে তিনি নিজের দেশকে অভিশাপ দিয়ে প্রবন্ধ লিখেছিলেন। কথায় কথায় এখনো তিনি বলে থাকেন, "ইংলণ্ড যদি সত্যিকার ক্রিশ্চান হয় তা হলে তার স্থান আছে ভারতে। ভারত খ্রীস্টকে চেয়েছিল বলেই ইংলণ্ডকে পেয়েছিল।"

ম্যাক্স্ বললেন, "নতুন অস্ত্র যে উদ্ভাবন করতে হবে এটা আমার বিচারে ঐতিহাসিক প্রয়োজন। তবে দেশভেদে তার প্রকারভেদ থাকবে, নামভেদও প্রকারভেদের আনুষঙ্গিক। সুতরাং সুধীর সঙ্গে আমি ও নিয়ে তর্ক করব না। ওঁর দেশ সম্বন্ধে উনিই প্রকৃষ্ট বিচারক।"

"নিশ্চয়। নিশ্চয়।" স্বীকার করলেন ফেয়ারফিল্ড্। "কিন্তু আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে নূতনের মোহে আমরা যেন পুরাতনকে না ছাড়ি। জানো তো, পুরোনো পিদিমের বদলে নতুন পিদিম নিয়ে আলাদিনের কী বিপদ ঘটেছিল।"

টাউনসেণ্ড এতক্ষণ এক মনে নোট লিখছিলেন। সুধীকে সুধালেন, "তুমি বলছিলে নতুন অস্ত্রে সাফল্যের সম্ভাবনা ষোলো আনা। তুমি কি স্থির জানো যে ওটা অতিরঞ্জন নয়?"

সুধী ফাঁপরে পড়ল। চিন্তা করে বলল, "যার দই সে তো ভালো বলবেই। অস্ত্রটা ভারতের স্বকীয়, অন্তত ব্যাপকভাবে ওর প্রয়োগ অন্যত্র হয়নি। ভারতসন্তান আমি, ওতে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে, একমাত্র ওরই দ্বারা আমরা স্বরাজ পাব, একটা বিরাট ভূখণ্ডের আশাআকাঙ্ক্ষার রাগে রঞ্জিত আমার উত্তর কি অতিরঞ্জিত হয়েছে, সার?"

টাউনসেণ্ড আশ্বাস দিয়ে বললেন, "অতিরঞ্জনের জন্যে অপরাধী করছিনে। জানতে চাইছি বাস্তবিক সাফল্যের সম্ভাবনা কতটুকু বা কতখানি। তুমি ভারতসন্তান হিসাবে উত্তর না দিয়ে মানবসন্তান হিসাবে উত্তর দাও দেখি। যে কোনো দেশে ওর সম্ভাবনা কত দূর— পুরাতন অস্ত্রের সঙ্গে তুলনায়?"

সুধীকে রীতিমতো মনন করতে হলো। টাউনসেণ্ড চান বৈজ্ঞানিক উত্তর। এমন উত্তর যাতে আশাআকাঙ্ক্ষার অনুরঞ্জন থাকবে না।

"যা এখনো অপরীক্ষিত তার বিষয়ে যাই বলি না কেন কতক পরিমাণে আশারঞ্জিত হবেই। ষোলো আনার স্থলে সাড়ে তিন আনা বললেও বৈজ্ঞানিকের বিচারে টিকবে না। অতএব আমি ষোলো আনাই বলব, যে কোনো দেশে ষোলো আনা।" সুধী শৈলের মতো অবিচল রইল।

"তুমি ভয়ঙ্কর লোক।" টাউনসেণ্ড হাসলেন।

"নতুন অস্ত্র," ম্যাক্স্ বললেন, "যদি উদ্ভাবন করতে হয় তবে ষোলো আনা সাফল্যের সম্ভাবনা তার অন্তর্নিহিত বলে ধরে নিতে হবে।

নতুবা উদ্‌ভাবনের কোনো অর্থ হয় না, বেন। তুমি কি মনে করেছ সাড়ে তিন আনা সাফল্যের জন্যে নতুন অস্ত্র ও সাড়ে বারো আনা সিদ্ধির জন্যে পুরোনো অস্ত্র ব্যবহার করবে? দুই একসঙ্গে বা পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করা চলে না, বেন।"

তাঁর উক্তি যুগপৎ সমর্থন ও সংশোধন করে সুধী বলল, "দুই একসঙ্গে চলতে পারে না, ম্যাক্‌স্‌, কিন্তু পর্যায়ক্রমে চলতে পারে বৈকি। রুরিটানিয়ার আক্রমণ প্রত্যাহত করতে পুরাতন অস্ত্র যদি ব্যর্থ হয় তবে যে কোনো দেশ একাকী দাঁড়াতে পারে নতুন অস্ত্র হাতে নিয়ে। কিন্তু তার আগে তাকে স্বেচ্ছায় নিরস্ত্র হতে হবে, যদি অনিচ্ছায় নিরস্ত্রীকৃত হয় তা হলে স্বেচ্ছায় পুরাতন অস্ত্রের মায়া কাটাতে হবে। নতুন অস্ত্রে যার ষোলো আনা বিশ্বাস নেই তার ষোলো আনা সিদ্ধি নেই, আর নতুন অস্ত্রে ষোলো আনা বিশ্বাস মানে পুরোনো অস্ত্রে ষোলো আনা অবিশ্বাস।"

ম্যাকস্‌ বললেন, "আমিও ঠিক সেই কথাই বোঝাতে চেষ্টা করেছি, সুধী।"

টাউনসেণ্ড বললেন, "ম্যাক্‌স্‌, তোমাকে আমরা ভারতবর্ষে পাঠাব। তুমি নিজের চোখ কান খোলা রেখে পরিমাপ কোরো ওদের সাফল্য। আমার নিজের মনে হয় সুধীর কথার পিছনে কিছু অভিজ্ঞতা আছে, কিন্তু অভিজ্ঞতার ভাগ যদি হয় সাড়ে তিন আনা তো অভিলাষের ভাগ সাড়ে বারো আনা। আমার সন্দেহ হয় মাটিতে একটি আঙুল রেখে বাকি নয়টা আঙুলে ওরা শূন্যে দাঁড়াতে চাইছে। কিন্তু আমরা ইংরেজরা বাস্তববাদী, আমরা দশটি আঙুল দিয়ে মাটিতে দাঁড়িয়ে দুই হাতে আকাশের চাঁদ পাড়তে চাই। আমরা আদর্শকে ভালোবাসি বলে বাস্তবকে ভুলতে পারিনে। চাঁদ আমাদের প্রিয়, কিন্তু পৃথিবীও প্রিয়া।"

টেবল বাজিয়ে এত জন সায় দিলেন যে টাউনসেণ্ডকে দেখে মনে হলো তিনি সেদিনকার যুদ্ধে জিতেছেন।

ফেরবার পথে মুরিয়েল বললেন সুধীকে, "শুনলেন তো। আমরা ইংরেজরা মাটিও ছাড়ব না, চাঁদও পাড়ব। পুরাতন অস্ত্র যেন মাটি, নূতন অস্ত্র যেন চাঁদ।"

সুধী হেসে বলল, "আমরা ভারতীয়রাও কম যাইনে। আমাদের অনেকের ধারণা নতুন অস্ত্রে স্বরাজ লাভ করলেও স্বরাজ রক্ষা করা অসম্ভব, তার জন্যে লাগবে পুরোনো অস্ত্র। কাজেই আমরা অহিংসার ম্যাট্রিক্যুলেশন পাশ করে তার পরের দিনই নাম লেখাব হিংসার কলেজে।"

"তা হলে আপনাদের মনোভাব আমাদেরই মতো।"

"ঠিক উল্টো। হিংসায় আপনাদের বিশ্বাস টলেছে, আপনারা তবু তাকে ছাড়তে পারছেন না প্রাকৃটিকাল কারণে। হিংসায় আমাদের অটল বিশ্বাস, সেই আমাদের ছেড়েছে বলে আমরা অহিংসার নিশান ধরেছি। এই অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসান না হলে আমাদের দ্বারা কোনো মহৎ কাজ হবে না, দিদি। তবে আশা আছে—" সুধী আকাশের দিকে তাকায়। সেদিন চাঁদ ছিল।

৬

সুধীর নিজের তেমন কোনো অন্তর্দ্বন্দ্ব নেই, সুধী সে হিসাবে সুখী। কিন্তু মানুষের জগতে বহির্দ্বন্দ্ব আছে, সুধীও মানুষ, তাকেও বহির্দ্বন্দ্বের দিনে অস্ত্র ধরতে হবে। সে অস্ত্র পুরোনো না হয়ে নতুন হলেও তা অস্ত্র, তার সঙ্গে নিজের ও পরের ক্ষয়ক্ষতি জড়িত। তার

দ্বারা হৃদয় জয় করতে চাইলেও জ্বালার উপশম হয় না। জ্বালা উভয় পক্ষেরই।

সহিংস হোক অহিংস হোক সংঘর্ষমাত্রেই দুঃখের। সংঘর্ষ যাতে না বাধে, যাতে নিবারিত হয় সেই প্রয়াসই প্রাথমিক কর্তব্য। কিন্তু সকলের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে যদি একদিন ও জিনিস বাধে তবে সহিংস কিংবা অহিংস কোনো একটা অস্ত্র হাতে নিতেই হবে। সুধীও বাদ যাবে না, যেহেতু সে মানুষ। ননকোঅপারেশন আন্দোলনে সুধীও যোগ দিয়েছিল, যেহেতু সে ভারতীয়। আর একটা আন্দোলন যে আসন্ন তা সে দেশের কাগজ পড়ে আন্দাজ করতে পারছিল। সংসার প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই হয়তো সংগ্রাম প্রবেশ। এ কথা মনে হলেই সুধীর মন কেমন করে।

ইংলণ্ডকে সে বাদলের মতো স্বদেশ বলে গ্রহণ করেনি, কিন্তু স্বদেশের মতো ভালোবেসেছে। এর একটি বর্ণ মিথ্যা নয়। যেমন এ দেশের প্রকৃতি তেমনি এ দেশের মানুষ, দুই তার কাছে আপনার। কাকে বেশি পছন্দ করে, প্রকৃতিকে না মানুষকে, তা সে বলতে পারবে না। কিন্তু ছাড়তে চায় না কাউকেই। উপায় নেই, ছাড়তেই হবে। জীবনটাই একটানা একটা ত্যাগ। তার পদে পদে প্রিয়জনকে পিছনে ফেলে যেতে হয়। মাতৃগর্ভ ত্যাগ না করলে শিশু ভূমিষ্ঠ হয় না। মায়ের কোল ত্যাগ না করলে হাঁটতে ছুটতে খেলতে পায় না। একদিন খেলাঘর ত্যাগ করে পাঠশালায় চলে যায়, মা বেচারি কাঁদে।

আর কিছুদিন পরে সুধী ইংলণ্ড থেকে বিদায় নেবে। সে বিদায় দুঃখের। কিন্তু তার চেয়ে আরো দুঃখের, বিদায়ের পরে সেই ইংলণ্ডের সঙ্গেই সংঘর্ষ। এত ভালোবাসা, এত সদ্ব্যবহার, আতিথ্য,

আলাপ, সম্পর্কস্থাপন, দিদি বলে ডাকা—সংঘাতের দিন এসব কোথায় থাকবে! তবু তো তা অহিংস সংগ্রাম, বড় জোর পকেটের উপর দাগ রাখবে, হৃদয়ের উপর নয়। যদি সহিংস হতো, তা হলে কি দুঃখ রাখবার ঠাঁই থাকত? জার্মানে ইংরেজে ফরাসীতে কী করে সেবার লড়াই বাধল, কী করে আবার বাধবে? ওরা যে নাড়ীর বাঁধনে বাঁধা! সুধীর মতো কত সুধী, মুরিয়েলের মতো কত মুরিয়েল, আণ্ট এলেনরের মতো কত আণ্ট এলেনর ওদের ঘরে ঘরে।

ভোর না হতেই সুধীর ঘুম ভেঙে যায়, সে তাড়াতাড়ি নিত্যকর্ম সেরে বেরিয়ে পড়ে। মাঠে মাঠে বেড়ায়, ঘাসের ফুল কুড়ায়, পাখীর ডাক শোনে, গাছের গড়ন লক্ষ্য করে, মানুষের সঙ্গে করে কুশলবিনিময়, জেনে নেয় কোন ফুলের কোন পাখীর কোন গাছের কী নাম। ইংরেজরা এ সব বিষয়ে ভারতীয়দের তুলনায় ওয়াকিবহাল। দেশে যেমন প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রগাঢ় ঔদাস্য বিলেতে তেমন নয়। সুধী অনেক সময় ভাবে প্রকৃতির সঙ্গে যাদের বিরোধের সম্পর্ক তারাই তার প্রেমিক। ইউরোপের মানুষ পশুপাখী শিকার করে বলেই তাদের খবর রাখে, চেনে ও যত্ন করে। আমরা অহিংস বলে উদাসীন। অহিংসার এই দিকটা প্রীতিকর নয়। মানুষের সঙ্গে মানুষের বিরোধের সম্পর্ক বলেই কি এত দেশভ্রমণ, সভাসমিতিতে যোগদান, আমোদপ্রমোদে অভিনিবেশ? অহিংসার প্রাদুর্ভাব হলে কি যে যার দেশে একঘরে হয়ে অপরের প্রতি অন্ধ ও বধির হবে? তা যদি হয় তবে অহিংসার বিপক্ষেও বলবার আছে।

প্রাতরাশের সময় সুধী কুটীরে ফিরলে ফেয়ারফিল্ড্ তাকে ক্ষেপিয়ে বলেন, "কি হে। আজ কার গাড়ীতে চড়ে দিগ্বিজয় করে এলে?"

হয়েছিল কী, একদিন বেড়াতে বেড়াতে সুধী দেখল পিছন থেকে আসছে একখানা কার্ট অর্থাৎ এক-ঘোড়ার গাড়ী। সুধীর মনে পড়ল সুধীন্দ্র বসুকে একজন গাড়োয়ান একবার গাড়ীতে চড়তে ডেকেছিল। সে তো আমেরিকায়। বিলেতে কি তেমন গাড়োয়ান আছে? সুধী ভাবছে, এমন সময় সত্যিই সে গাড়োয়ান গাড়ী থামিয়ে তাকে ডাকল। ডেকে বলল, "চড়বেন?" সুধী তার পাশে বসল। সেই যে বসল তারপরে নামল গিয়ে চার পাঁচ মাইল দূরে ভিন্ গাঁয়ে, গাড়োয়ানের ঘরে। তার সঙ্গে চা খেয়ে আরো কয়েক জায়গা ঘুরে, আরেক জনের বাড়িতে তুপুরের খাবার খেয়ে, আবার সেই গাড়োয়ানের ওখানে চা খেয়ে সুধী সেদিন সন্ধ্যাবেলা ফিরল। ইতিমধ্যে ফেয়ারফিল্ড্ সর্বত্র লোক পাঠিয়েছেন তাকে খুঁজতে, মুরিয়েল তাকে না খাইয়ে খাবেন না বলে অভুক্ত রয়েছেন। সুধী ভীষণ লজ্জিত হলো এসব শুনে ও দেখে।

সুধী বলে, "না, আর দিগ্বিজয়ে যাচ্ছিনে। আমার সেই ভাষণ এখনো সমাপ্ত হয়নি। লিখে শেষ করতে হবে।"

"ওহ্। তোমার সেই অস্ত্রমনোনয়ন? তুমি সেদিন বলেছিলে তোমার দেশের পৌরাণিক বীরদের এক এক জনের এক একটি স্বমনোনীত আয়ুধ থাকত। তোমার মতে প্রত্যেক দেশেরও এক একটি স্বমনোনীত রণপদ্ধতি থাকে। স্পেনের যেমন গেরিলা, রাশিয়ার যেমন পোড়ামাটি তোমাদের তেমনি অহিংস অসহযোগ।"

সুধী বলে, "আমার বিশ্বাস জয়ের শর্ত হচ্ছে স্বাদেশিক রণপদ্ধতি যে কী· তা আবিষ্কার করা ও তাতেই লেগে থাকা। আমার দেশের অধিকাংশ মানুষ নিরামিষাশী। যারা জীবনধারণের জন্যে জীবহত্যা করে না তারা দেশের জন্যে নরহত্যা করবে, এ কি কখনো হয়?

অধিকাংশকে বাদ দিয়ে যদি মুষ্টিমেয়কে দিয়ে লড়াই করা হয় তবে তাতে জয়ের সম্ভাবনাও মুষ্টিপরিমেয়।"

ফেয়ারফিল্‌ড্‌ বলেন, "তা হলে, বাপু, এদেশের অধিকাংশ মানুষ তো নিরামিষাশী নয়, এ দেশে তোমার রণপদ্ধতি সফল হবার কতটুকু আশা ? কেন তবে তুমি টাউনসেণ্ডকে ষোলো আনার আশা দিলে ?"

সুধী অপ্রস্তুত হয়ে কৈফিয়ৎ দেয়, "পুরাতন অস্ত্র যদি ব্যর্থ হয় তবে আপনারা হয়তো ওর মায়া কাটানোর সঙ্গে সঙ্গে আমিষেরও মায়া কাটাবেন।"

ফেয়ারফিল্‌ড্‌ তখন ইংরাজোচিত আত্মপ্রত্যয়ের সহিত এই কথা কয়টি বলেন, "তার ঢের দেরি আছে।"

সুধীর ভাষণ শান্তিবাদীদের বৈঠকে অনুরূপ গুঞ্জন তুলল। নতুন অস্ত্রের সন্ধান নিতে সকলেই উৎসুক, কিন্তু তার জন্যে জীবনের ধারা পরিবর্তন করতে বিশেষ কারো উৎসাহ দেখা গেল না। নিরামিষাশীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। সে দিক থেকে সুধীর সমর্থকের অভাব হলো না। কিন্তু সুধীর প্রধান যুক্তি তা নয়। সুধী চায় স্বাচ্ছন্দ্য পরিহার। সুধী বলে খাওয়া কমাতে হবে, পরা কমাতে হবে, উপকরণের ভার লাঘব করতে হবে, উপনিবেশ বা অধীন দেশ থেকে এমন কিছু আমদানি করা চলবে না যাতে তাদের টান পড়ে, উপনিবেশে বা অধীন দেশে এমন কিছু রপ্তানী করা চলবে না যাতে তাদের শিল্প ধ্বংস হয়। এক কথায় যে জীবন শোষণের উপর প্রতিষ্ঠিত তার পরিবর্তে যে জীবন শোষণসংশ্রবহীন সে জীবন বরণ করতে হবে। তা হলেই মরণ বরণ করা সহজ হবে, যারা মরতে প্রস্তুত তাদের পরাভব নেই।

"মরতে প্রস্তুত কে নয় ? যে টর্পেডো ছোঁড়ে, ট্যাঙ্ক চালায়,

আকাশে ওড়ে, বোমা ফেলে সেও তো মরতে প্রস্তুত। শোষণ অবশ্য পরিতাপের বিষয়, কিন্তু তার দরুণ কেউ মরতে কুণ্ঠিত হয়েছে বলে তো জানিনে।" বললেন সার চার্লস্ হোল্ট্বী।

সুধী নিবেদন করল, "আমিও জানিনে, কিন্তু আমার বাক্যের তাৎপর্য এই যে কোনো দিন যদি কোনো কারণে মারণাস্ত্র ফুরিয়ে যায়, কম পড়ে বা তুলনায় নিকৃষ্ট হয় তবে যারা মরতে প্রস্তুত হয়ে যুদ্ধে নেমেছিল তারাও কুণ্ঠিত হয়ে পিছু হটে। পিছু হটে না কেবল তারাই যাদের জীবনযাপনের প্রণালী এমন যে তাতে পরস্বাপহরণের ইঙ্গিত নেই, যাদের বিবেক সম্পূর্ণ অমলিন।"

"কিন্তু এর সঙ্গে নতুন অস্ত্রের কী সম্পর্ক! তুমি যাদের কথা বলছ তারা শোষণকার্যে বিরত হলে মারণাস্ত্রের অভাব কিংবা অপকর্ষ সত্ত্বেও মারে এবং মরে, পিছু হটে না। সুধী, তোমার ও যুক্তি সোশ্যালিস্টদের। অহিংসকদের নয়।" সমালোচনা করেন ম্যাক্স্ আণ্ডারহিল।

"ঠিক।" সায় দেন জন ব্লিজার্ড।

"আমিও," সুধী ঘোষণা করল, "কতকটা সোশ্যালিস্ট। কিন্তু থাক ও কথা। আমার গবেষণার ফল হচ্ছে এই যে শোষণবিরতির সঙ্গে মরণবরণের গভীরতর সম্পর্ক আছে, সেটা সব যুদ্ধে প্রকাশ পায় না, পায় প্রধানত দু'রকম যুদ্ধে—সোশ্যালিস্ট যুদ্ধে ও অহিংস যুদ্ধে। কাজেই আমার যুক্তি সোশ্যালিস্ট ও অহিংসক উভয়েরই অনুকূল। কতক দূর পর্যন্ত জন ও আমি এক পথের পথিক। তফাৎ এইখানে যে আমি মারব না, মরব, উনি মারবেন ও মরবেন।"

অহিংসার সঙ্গে সোশ্যালিজমের প্রচ্ছন্ন সম্পর্ক অনাবৃত হবার পর শান্তিবাদী মহলে সুধীর পসার মাটি হল। যাঁরা এতদিন তাকে একজন

ছদ্মবেশী ক্রিশ্চান বলে সমাদর করছিলেন তাঁরাই এখন তাকে একজন ছদ্মবেশী সোশ্যালিস্ট বলে অনাদর করলেন। এর পরে তার অহিংসাকেও একটা ছদ্মবেশ বলে সন্দেহ করা হলো। হিংসার ছদ্মবেশ।

ফেয়ারফিল্ড্ কিন্তু খুশি হলেন। বললেন, "আমি যে অহিংসক নই তা তো তুমি জানো। আমি সোশ্যালিস্টও নই। তোমার সঙ্গে তবে কিসের মিল? অমলিন বিবেকের। আমি যদি যুদ্ধে নামি আমার বিবেক নির্মল হবে না, যদি না করি যেদিনকার রুটি সেই দিন রোজগার। একজন ক্রিশ্চান, একজন সোশ্যালিস্ট ও একজন অহিংসক, এরা অনেক দূর পর্যন্ত একই পথের পথিক।"

৭

কথা ছিল সুধী দু' হপ্তা ফেয়ারফিল্ড্দের সঙ্গে কাটিয়ে পরে অন্যত্র বাসা করবে ও বাদলকে ডাকবে। কিন্তু ঘটল তার বিপরীত। নীলমাধব লিখলেন, বাদলকে নদীর বাঁধ থেকে ধরে আনা গেছে। যথাসময়েই আনা গেছে বলতে হবে, কেননা ডাক্তারের মতে ওটা নিউরাস্থীনিয়া।

সুধী পত্রপাঠ বিদায় নিল। ফেয়ারফিল্ড্ এবার নিজেই স্টেশন অবধি এলেন, সুধীর আপত্তি কানে তুললেন না। সুধীর প্রতি তাঁর শেষ বাণী, "My son, you must be thoroughly equipped."

বাদলের জন্যে তার মন ভালো ছিল না। কিন্তু মন ভালো না থাকার আরো কারণ ছিল। পরকে সে যে উপদেশ দিয়ে এলো তা কি তার নিজের বেলায় প্রযোজ্য নয়?

ইংলণ্ড যেমন ভারতের মহাজন ও জমিদার সেও কি তেমনি তার গ্রামের নয়? খাজনা ও সুদের টাকা নিলে যদি কারো বিবেকে মরচে ধরে তবে কি তা কেবল ইংলণ্ডের বিবেকে, সুধীর বিবেকে—তার মতো

উপস্বত্বভোগীদের বিবেকে নয়? গ্রামের উপস্বত্ব গ্রামে ব্যয় করলেই কি বিবেকের গ্লানিমা মোছে? খরচা দিলেই যদি মরচে ঘুচত তবে ইংরেজকে বললেই তো হয়, "সাহেব, আমার দেশ থেকে যা নিচ্ছ তা আমার দেশেই খরচ কর।" তা হলে শোষণবিরতির প্রেস্ক্রিপ্শন না দিয়ে শোষণ অক্ষুণ্ণ রেখে তোষণের ব্যবস্থাপত্র দেওয়া উচিত।

না, তা হলে ভারতের আত্মসম্মানে ঘা লাগে। আত্মসম্মান কি তবে চাষী খাতকের নেই? তাদের যেদিন আত্মসম্মানবোধ প্রখর হবে তারাও কি সেদিন বলবে না, "দা'ঠাকুর! গোরু মেরে জুতো দান নাই করলেন। আমরা চাই জ্যান্ত গোরুটা।"

সুধী আপনাকে একাত্ম করতে চায় ছোট বড় সকলের সঙ্গে। কিন্তু ছোটতে বড়তে যে সম্পর্ক সেটা ইঙ্গ-ভারতীয় সম্পর্ক। গ্রামে ধনব্যয় করলেই কি উৎপাদক ও উপস্বত্বভোগীর সম্পর্ক বদলে যাবে? ইংলণ্ডকে যে পরিবর্তনের উপদেশ দেওয়া গেল তা কি কেবল ইংলণ্ডেই সীমাবদ্ধ থাকবে, দেশীয় ভূস্বামী গোস্বামী বণিক ধনিকদের জীবনে প্রসারিত হবে না? সম্পর্কের পরিবর্তনই যদি প্রকৃত পরিবর্তন হয় তবে সুধীকেও করতে হবে সম্পর্কেরই পরিবর্তন। গ্রামের লোকের সঙ্গে তার সম্পর্ক মহাজন ও খাতকের সম্পর্ক হবে না, তালুকদার ও রায়তের সম্পর্ক হবে না। এ যদি না হয় তবে যেদিন ইঙ্গ-ভারতীয় সম্পর্ক বদলাবে তার পরের দিন ছোট-বড়'র সম্পর্ক ছোট'র অসহ্য হবে। সুধীর মহাজনী ও তালুকদারী তখন সুধীকে করবে ওদের চোখের বালি। দা'ঠাকুরকে তখন ওরা দা নিয়ে কাটতে না আসে!

আমরা স্বাধীন হবই এ যেমন আমাদের ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা, আমরা স্বাধীনতা দেবই এও তেমনি আমাদের দধীচির সঙ্কল্প। গ্রামের লোককে

জানাতে হবে, বিশ্বাস করাতে হবে যে তারা যদি না স্বেচ্ছায় দেয় তবে আমরা সুদ ও খাজনা নেব না। যদি স্বেচ্ছায় দেয় তবে বেশির ভাগ তাদেরই জন্যে খরচ করব। সম্পর্কের পরিবর্তনের জন্যে আমরা সব সময় প্রস্তুত, তারা যদি মনে করে যে তারাও প্রস্তুত তবে দা'ঠাকুরকে দা নিয়ে কাটবার দরকার নেই, দা'ঠাকুর মহাজনী কারবার গুটিয়ে নেবেন ও তালুকদারীতে ইস্তফা দেবেন।

ভারাক্রান্ত মন নিয়ে সুধী প্যাডিংটনে পৌছলে। হ্যামারস্মিথে নীলমাধবের বাসা একটা দোকানের নিচের বেস্‌মেণ্টে। দোকানটা তার ও তার বান্ধবীর। স্বরলিপির দোকান। সেখানে বাদলকে এক কোণে বসিয়ে পাহারা দিচ্ছিল নীলমাধব। তার বান্ধবী কোথায় বেহালা বাজাতে গেছলেন।

সুধীকে দেখে বাদল যেন প্রাণ পেলো। সুধীও বাদলকে বুকে বেঁধে তার চুলে হাত বুলিয়ে দিল। ক'টাই বা চুল! টানতে টানতে বাদলই প্রায় নির্মূল করেছিল।

"তার পর, বাদলা।" সুধী বলে আবেগজড়িত কণ্ঠে। বাদল যে শয্যাশায়ী নয় এই আনন্দের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল বাদল যে সত্যিই অসুস্থ এই উদ্‌বেগ।

"সুধীদা," বাদল আর সবুর করতে পারছিল না, "নিচে চল, তোমার সঙ্গে কথা আছে।"

নীলমাধব তাদের নিচে বসিয়ে উপরে ফিরে গেল দোকান আগলাতে। যতরকম গাইয়ে বাজিয়ে তার খরিদ্দার, সেইসব গুণীজনদের গুনগুনানি শুনে তার দিবস কাটে। বাদল কিন্তু অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল এই ক'দিনে।

"এইখানে তোরা থাকিস্, তোর কষ্ট হয় না?" সুধী সুধায়।

"আর কষ্ট!" বাদল ফুৎকার করে। "কষ্ট দেখতে দেখতে আমার কষ্টবোধ অসাড়। নইলে বেস্‌মেণ্টে কি মানুষ থাকে!"

সুধীও কখনো বেস্‌মেণ্টে বাস করে নি। ভাবল বাদলকে সরাতেই হবে অন্য কোনোখানে। কিন্তু কোনখানে?

"শুনবে আমি কী উপলব্ধি করেছি?" বাদল কম্পিত স্বরে বলল। শুধু স্বর নয়, তার হাত পা'ও কাঁপছিল।

"শুনি?" সুধী আশ্চর্য হচ্ছিল, ওসব কি নিউরাস্‌থীনিয়ার লক্ষণ!

"সুধীদা," বাদল বলল ভাঙা গলায়, "এ যুগের মূল সুর মুক্তি নয়, সাম্য। লিবার্টি নয়, ইকুয়ালিটি। এ যুগের চাষী চায় জমিদারের সমান হতে, মজুর চায় মালিকের সমান হতে, শূদ্র চায় ব্রাহ্মণের সমান হতে, কৃষ্ণাঙ্গ চায় শ্বেতাঙ্গের সমান হতে। যে কোনো মানুষের মন বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে সে চায় তার উপরওয়ালার সঙ্গে সাম্য, এবং এই চাওয়াই তার পরম চাওয়া। আমার যুগের মানুষ আমার সঙ্গে পা ফেলে চলবে কী করে? আমার জীবনের মূল সুর যে লিবার্টি।"

সুধী সস্নেহে বাদলের মুখ নিরীক্ষণ করছিল। শুনছিল কি না সেই জানে, কিন্তু বহুদিন পরে বন্ধুকে দেখে সে পূর্ণ কলসের মতো নিঃশব্দ হয়েছিল।

"আমার কথা কেউ শুনবে না, সুধীদা, আমার কণ্ঠস্বর যতই জোরালো হোক। তোমার কথাও কি কেউ শুনবে! আমার যেমন লিবার্টি বা মুক্তি তোমার তেমনি Fraternity, মৈত্রী। এ যুগ তোমার কিংবা আমার নয়, মার্কসের ও লেনিনের। স্বীকার করতে কুণ্ঠা বোধ করি, কিন্তু স্বীকার না করলে সত্যের অপলাপ হবে যে তাঁরাই এ যুগের মূলসুরের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়েছেন, তাই তাঁদের কণ্ঠস্বর জোরালো। তাঁদের জোর আসছে অধিকাংশ মানুষের কাছ থেকে,

নতুবা তাঁরা নির্জোর। আমি যদি এক শতাব্দী পরে জন্মাতুম আমারও কণ্ঠস্বরে জোরের জোয়ার আসত, কিন্তু সে জোয়ার লিবার্টির।"

বাদল এলিয়ে পড়েছিল। সুধী তাকে শুইয়ে দিল, দিয়ে তার পাশে বসল। বলল, "অত কাঁপছিস্ কেন? তোর কি শীত করছে?"

"উঁহু। কী করে তোমাকে বোঝাব? আমার মগজে যেন এক দল ধুনুরী তূলো ধুনছে। ঠক্ ঠক্ ঠাঁই ঠাঁই। ঠক্ ঠক্ ঠাঁই ঠাঁই। ঠাঁই ঠাঁই ঠাঁই ঠাঁই।" বাদল চোখ বুজল।

"আজকাল ঘুম কেমন হয়?"

"হয় না। হলে টের পাইনে।"

"তা হলে তুই ঘুমিয়ে পড়, আমি তোকে মাসাজ করি।"

সুধীর মাসাজের হাত ভালো। বাদলের তন্দ্রা আসছিল, তা সত্ত্বেও সে বকবক করছিল।

"আমি তবে কেন থাকব? আমার দ্বারা তো এ যুগের মূল সমস্যার সমাধান হবে না। দুঃখমোচন? দুঃখমোচন বলতে আমি বুঝি মজুরি দাসত্বের উচ্ছেদ, মজুরদের লিবার্টি। কিন্তু তারা নিজেরা কি লিবার্টি চায়! তারা চায় যার চাকরি নেই তার চাকরি, যার চাকরি আছে তার আরো মজুরি। আরো মজুরির জন্যে তারা আরো খাটতেও রাজি, ছুটির দাবী তারা তখনি করে যখন মজুরি বাড়বে না বলে জানে। রাষ্ট্রের মালিকানা, কলকারখানার মালিকানা তারা অন্তরে অন্তরে চায় কি? চাইলে মালিকদের সঙ্গে দরাদরি করত না, আপোস্ করত না। মালিকের সমান হতে চাওয়াই ওদের চরম চাওয়া, সাম্যই ওদের মোক্ষ।"

নীলমাধব ঘরে ঢুকে সুধীকে কিছু ফলমূল দিয়ে গেল, কিছু দুধ ও রুটি। সুধী বলল, "বাদল, তুই খাবি?"

বাদল বলল, "আমার কিছু খেতে ইচ্ছা করে না। কোনোরকম কসরৎ নেই, দু'বেলা কড়া পাহারায় নজরবন্দী রয়েছি। তুমি আমাকে উদ্ধার কর, সুধীদা।"

"ভাবছি কোনখানে তোর সেবার সুবন্দোবস্ত হবে। কার্স্‌স্‌বার্ড গেলে কেমন হয়? সেখানে উজ্জয়িনী আছে।"

"তোমাকে বলিনি, আমার আজকাল জল দেখলেই ঝাঁপ দিতে রোখ চাপে। চ্যানেল পার হবার সময় যদি জাহাজ থেকে লাফ দিই তুমি কি আমাকে খুঁজে পাবে?"

এটা কিসের লক্ষণ! সুধী তটস্থ হল। বলল, "তা হলে কাজ নেই অত দূর গিয়ে। চল, আমরা হ্যাম্পস্টেড অঞ্চলে একটা ফ্ল্যাট নিই। তোকে সেরে উঠতে হবে, বাদল।"

"আমার অসুখটা যদি শরীরের হতো তা হলে কেন সারত না? কিন্তু সুধীদা, যারা তুলো ধুনছে তারা ধুনছে আমার মনকে। ঐ যে tension ওটা আমার মনের। শুধু আমার মনের নয়, ইউরোপের মনের। মনের relaxation না হলে শরীরেরও হবে না। আমাকে আলো দাও, আশা দাও, বোঝাও কী করে মানুষ মুক্ত হবে, শান্ত হবে। তবে তো অসুখ সারবে।"

৮

নীলমাধব বহুকাল বিলেতে আছে। প্রথমে এসেছিল নির্বাসিত হয়ে, পরে যদিও গভর্ণমেণ্টের নিষেধ নেই তবু বান্ধবীর আছে। অতএব তার নির্বাসনদণ্ডই বহাল আছে বলতে হবে।

সকলে একে একে দেশে ফিরবে, সে ফিরতে পাবে না, এই বেদনা

তার অন্তরের অন্তরালে। সেইজন্যে সে বাংলা বলে এতটা দরদ মাখিয়ে, তার বাংলা গানেও এতখানি বিষাদ। সুধী তাকে তার স্বদেশপ্রেমের জন্যে শ্রদ্ধা করে। মমতা বোধ করে তার নির্বাসনের দরুণ। পক্ষপাতের আর একটা কারণ লোকটি কারো সাতেও নেই, পাঁচেও নেই। সকলের সঙ্গে সমানভাবে মিশলেও কখনো নিজেকে খেলো করে না। কেউ বিপদে পড়লে অযাচিতভাবে সাহায্য করে, যাচিত হলে তো কথাই নেই।

"ফ্ল্যাট জোগাড় করে দিতে হবে? তাই তো!" নীলমাধব বাদলের দশা দেখে দুঃখিত হলো। "এখানে খুব কষ্ট হচ্ছে, বুঝতেই পারছি।"

"কষ্ট ওখানেও হবে।" বাদল বিকৃত মুখে বলল।

"না, সে জন্যে নয়।" সুধী ভেঙে বলল। "বাদলের স্ত্রীকে চিঠি লিখতে যাচ্ছি, বাদলের শাশুড়ীও হয়তো আসবেন। ফ্ল্যাট ছাড়া উপায় কী!"

বাদল প্রতিবাদ করল না। নীলমাধব জানত যে মিসেস গুপ্ত তার শাশুড়ী। তারাপদকেও সে চিনত।

"ওহ্! তাই নাকি! আরে আগেই ও কথা বলতে হয়।" নীলমাধবকে একটু ব্যস্ত বোধ হল। "তা হলে আমি চললুম ফ্ল্যাটের সন্ধানে। ভালো কথা, তারাপদ কুণ্ডুর খবর শুনেছ?"

"কই, না?"

"থাক, বলব না। বলা বোধ হয় অন্যায় হবে। সত্যি মিথ্যে জানিনে যখন।"

সুধী পীড়াপীড়ি করল না। কিন্তু বাদল চেপে ধরল। তারাপদ তার সর্বস্ব নিয়েছে। চেষ্টা করলে এখনো তার কাগজপত্র ফিরে পেতে পারে।

"আছে প্যারিসেই। কিন্তু ঠিকানাটা তেমন সুবিধের নয়। মানে, ভালো পাড়ার নয়। যাকে বলে লাল বাতির এলাকা।"

সুধী জানত না ওর অর্থ। বাদলও সুবোধ। নীলমাধব ওর চেয়ে বেশি খোলসা করল না। শুধু বলল, "ও নাকি এখন বামার দালাল বনেছে।"

খবরটা শুনে বাদল ভয়ানক উত্তেজিত হল। সুধী বলল, "চুপ। চুপ। তোর কিছু করবার নেই। যা গেছে তা গেছে।"

"না, তা নয়। লোকটা কত মেয়ের সর্বনাশ করবে তাই ভেবে শিউরে উঠছি। পুলিশ কি ওর ঠিকানা জানে না?" বলল বাদল।

"নিশ্চয়।" নীলমাধব তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে বলল, অন্তত প্যারিসের পুলিশ তো জানেই। কিন্তু পুলিশের যত দাপট রাজনৈতিক কর্মীদের বেলায়। তারাপদ এখন রাজনীতি থেকে অবসর নিয়েছে।"

বাদল ছটফট করতে থাকল। নীলমাধব ত্রস্ত হয়ে বলল, "ডাক্তারকে টেলিফোন করব?"

"করে কী হবে! ডাক্তার কি আমাকে বাঁচাতে পারবে?" বাদল বিহ্বল স্বরে বলল, "আমি চাইনে বাঁচতে এমন জগতে। পাপের প্রতিকার করতে না পারাও পাপ। সর্বনাশের প্রতিরোধ না করাও সর্বনাশ করা।"

সুধী নীলমাধবকে বলল, "তুমি তবে বেরিয়ে পড়, মাধবদা। আমিই আপাতত ওর ডাক্তার। নার্সও আমি, যতক্ষণ না উজ্জয়িনী এসে পৌঁছয়।"

বাদল চুপ করে পড়ে থাকল, কিন্তু তার মুখ ক্রোধে ক্ষোভে বিরক্তিতে বিকৃত। সুধী তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, "ভুলে যেতে চেষ্টা কর, বাদল। তোর আরোগ্যের প্রথম শর্ত বিস্মৃতি।"

"কী ভুলব, সুধীদা ?"

"জগতের যা কিছু অশোভন, যা কিছু গর্হিত।"

"অমন করে," বাদল বলল, "দু'ভাগ করা যায় না, সুধীদা। ওটা অশোভন, ওটা ভুলব। এটা সুশোভন, এটা ভুলব না। এমন ক্ষমতা আমার তো নেই। আমি সব কিছু মনে রাখি। অসাধারণ আমার স্মরণশক্তি। সেই জন্যে আমার ঘুম হয় না। যদি ভুলতে শিখি তো ভালোমন্দ দুই-ই ভুলব।"

সুধী বলল, "চেষ্টা করলে ইচ্ছামতো মনে রাখা ও ভোলা যায়।"

"বোধহয় সেই কারণে তোমার স্বাস্থ্য এত ভালো। কিন্তু তোমার জ্ঞানের পরিধি সীমাবদ্ধ। তুমি জগতের অর্ধেক বস্তু দেখতে চাও না। প্রকৃতির সৌন্দর্য তোমার নয়ন হরণ করে, কিন্তু প্রকৃতি যেখানে রক্তাক্ত, নিষ্ঠুর, শয়তান, অপচয়শীল সেখানে তুমি অন্ধ। প্রাণীমাত্রেই এক অপরকে ভক্ষণ করে, তবেই সম্ভব হয় প্রাণধারণ। তুমি কিন্তু চোখ বুজে ধ্যান করবে, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী শান্তি।"

বাদল দুই হাতে চুল ছেঁড়ে। সুধী বাধা দেয়।

"আমি ভুলব না, ভুলতে পারিনে। আমি চাই সব কিছু ভেঙে নতুন করে গড়তে। প্রকৃতির প্রকৃতি বদলে দিতে।" বাদল পাশ ফিরল।

"বাদল," সুধী তাকে স্মরণ করাল, "আগে স্বাস্থ্য, তার পরে আর সব। এই শরীর নিয়ে তুই যাই গড়তে যাবি তাই খাপছাড়া হবে। ভালো করে যদি কিছু গড়তে চাস্ তবে ভালো করে বাঁচতে হবে, এটা স্বতঃসিদ্ধ।"

"আমার এত ধৈর্য নেই।" বাদল মাথা নাড়ল। ছেলেমানুষের মতো বলল, "আমি কেবল ইচ্ছা করতে পারি, ইচ্ছাপুরণের ভার ইতিহাসের উপরে।"

সুধী হাসল। "ইতিহাস তো একটা অশ্ব? না?"

"হাঁ। অশ্বারোহণ পর্ব।" বাদলের মনে পড়ল আইল অফ ওয়াইট।

"ইতিহাস তো আলাদিনের প্রদীপ নয়। ইতিহাসের ভিতর দিয়ে যাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হয় তিনি আলাদিন নন, তিনি আল্লা।"

"ভগবান," বাদল কম্পিত কণ্ঠে বলল, "থাকলে আমার মাথাব্যথা কিসের, বল? নেই বলেই তো মানবকেই ইতিহাসের সারথি হতে হয়। যদি মানবও নির্বংশ হয় তবে থাকবে কেবল অন্ধ নিয়তি—অশাসিত প্রকৃতি। সেইজন্যে আমি যুদ্ধের সম্ভাবনায় উদ্‌বিগ্ন হই, সুধীদা।"

সুধী তাকে গরম দুধ খাইয়ে একটু চাঙ্গা করে তুলল।

"তুমি কি সত্যি বিশ্বাস কর যে ভগবান বলে কেউ বা কিছু আছেন বা আছে?" বাদল জিজ্ঞাসা করল। "না, ওটা তোমার স্বাস্থ্যরক্ষার সোপান?"

"ছি।" সুধী ক্ষুব্ধ হল। "যে কেউ আছে, যা কিছু আছে, সবই ভগবানের অস্তিত্বে অস্তিত্ববান। তাঁর অস্তিত্ব না থাকলে কারই বা থাকে? যে যুক্তিবলে তিনি অসিদ্ধ সেই যুক্তিবলে একে একে সকলেই অসিদ্ধ। ওটা আত্মঘাতী যুক্তি। ওতে আত্মবিশ্বাস নাশ করে। স্বাস্থ্য তো ছার।"

"তবে আমাকে সেই ধ্রুবনিশ্চিতি দাও।" বাদল অনুনয় করল। "আমি যদি নিশ্চিত হই তবে নিশ্চিন্ত হব, যদি নিশ্চিন্ত হই তবে দায়মুক্ত হব, যদি দায়মুক্ত হই তবে সুস্থকায় হব। মাথার উপর বোঝা থাকতে আমি বোধহয় বাঁচব না, সুধীদা।"

সুধী তার জন্যে প্রার্থনা করল।

পরের দিন ওরা দু' ভাই হ্যাম্পস্টেড গার্ডেন সাবার্বে উঠে গেল।

লণ্ডনের যাবতীয় শহরতলীর মধ্যে ওটিই সব চেয়ে নিভৃত ও নির্জন। শহরতলী শেষ হতে না হতে বনস্থলী আরম্ভ হয়েছে। অন্তত সে সময় এইরূপ ছিল। পরে নাকি প্রগতি হয়েছে।

সুধী নিজেই বাদলকে রেঁধে খাওয়ায়, মাসাজ করে, চব্বিশ ঘণ্টা চোখে চোখে রাখে। ফাঁক পেলেই বাদলের সঙ্গে বাগানে বসে, বাদল হয়তো গাছের ডাল থেকে ঝুলন্ত হ্যামকে শুয়ে দোল খায়, সুধী সাহায্য করে। মাঝে মাঝে তারা বনস্থলীতে গিয়ে বনভোজন করে, গাছের ছায়ায় চিৎ হয়ে শুয়ে পাখীদের ঘরকন্না দেখে, আকাশের দিকে চেয়ে তন্ময় হয়ে যায়। মরি মরি কী ঘননীল আকাশ! যেন বনস্থলীর সঙ্গে নভস্তলের রূপের প্রতিযোগিতা চলেছে।

কী জানি কী ভেবে বাদল বলে ওঠে, "Treacherous!"

সুধী তার দিকে প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে তাকায়।

"তোমাকে বলিনি, সুধীদা। বলেছি তোমার প্রকৃতি ঠাকুরাণীকে। চারিদিকে এত সৌন্দর্য, কিন্তু সেই সৌন্দর্যের আড়ালে রয়েছে মৃত্যুবাণ। পৃথিবী যদি বিধ্বস্ত হয়ে যায়, মানুষ যদি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, তা হলেও আকাশ এমনি গাঢ়নীল থাকবে, প্রকৃতি এমনি নীলকজ্জলা।" বাদল দম নিয়ে বলল, "এরা যে আমাদের প্রতি শুধু উদাসীন তাই নয়, এরা আমাদের শত্রু, এরা আমাদের মারে।"

সুধী ছিল সম্পূর্ণরূপে নিবিষ্ট। প্রজাপতি যেমন ফুলের মধুপানে নিবিষ্ট সুধী তেমনি প্রকৃতির মাধুরী পানে। বাদলের দিকে কান ছিল, কিন্তু মন ছিল না।

"বুঝলে, সুধীদা।" বাদল তার ধ্যান ভঙ্গ করল। আমি যখন চিত্রের কিম্বা সঙ্গীতের সৌন্দর্য উপভোগ করি তখন নিষ্কণ্টকভাবে

করি। কিন্তু প্রকৃতির সৌন্দর্য আমাকে উপভোগমুহূর্তেও সচেতন রাখে যে এর অন্তরালে বিষাক্ত কণ্টক।"

"বাদল," সুধী যেন নেশার ঘোরে বলল, "ভুলে যেতে চেষ্টা কর ও কথা। কত বড় রহস্যের সাক্ষী আজ আমরা। মেঘ নেই, কুয়াসা নেই, সুন্দরী তার অবগুণ্ঠন খুলেছে। প্রকৃতির চোখে চোখ রেখে আমরা যে আজ দেখতে পাচ্ছি তার অনন্ত অতৃপ্তি। সে মারে, কিন্তু বাঁচাবে বলেই মারে, নইলে খেলার সাথী পাবে কোথায়? দর্শক হবে কে? আমরাই তার চিরকালের রসিক সুজন!"

৯

সুধী বাদলের হিসাবনিকাশ বাকি ছিল। দিনের পর দিন চলল তাদের উপলব্ধি বিনিময়। কখনো খেতে খেতে, কখনো বেড়াতে বেড়াতে কখনো শুয়ে শুয়ে, কখনো বনস্থলীতে বসে।

পরিশেষে বাদল বলল, "আমার ভয় হয় আমিও একজন ডিক্‌টেটর হয়ে উঠছি। জগতের আদি ডিক্‌টেটর যেমন আদেশ করেছিলেন, 'Let there be light' আর অমনি 'there was light', তেমনি আমিও বোতাম টিপে ইশারা করব, 'বর্তমান ব্যবস্থা ধ্বংস হোক' আর অমনি ধ্বসে পড়বে তার কংক্রীটের দেয়াল, ইস্পাতের ছাদ। তার পরে আবার বোতাম টিপে ইঙ্গিত করব, 'নূতন ব্যবস্থার পত্তন হোক' আর অমনি গড়ে উঠবে—" বাদল কথা খুঁজে পেলো না, বলল, "কিসের দেয়াল, কিসের ছাদ?"

সুধী বলল, "বাক্যের দেয়াল, স্বপ্নের ছাদ।"

"না, ঠাট্টা নয়, সুধীদা। সত্যি আমি একজন ডিক্‌টেটর হয়ে

উঠছি। যাদের আমি উৎখাত করতে চাই, যাদের বাড়া শত্রু আমার নেই, শেষ কালে আমিই কিনা তাদেরই একজন হতে বসেছি। উঃ!"

"ও রকম হয়।" সুধী বলল গম্ভীরভাবে। "পশুর সঙ্গে লড়তে লড়তে মানুষ পশু হয়ে যায়। যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রধান যুক্তি হচ্ছে এক নেশনের চরিত্র অপর নেশনে অর্শায়। যুদ্ধ যদি করতেই হয় তবে নিজের মনোনীত অস্ত্রে। তা না হলে জয়ের সম্ভাবনা থাক বা না থাক, আত্মাকে হারানোর আশঙ্কা থাকে।"

"আমার ভয় হয়," বাদল কাঁপতে কাঁপতে বলল, "আমিও হারিয়ে ফেলছি আপনাকে। আমি আজকাল যুক্তি করিনে, তর্ক করিনে, বোতাম টিপি। কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে, কারণ কী? কেন তুমি পাকা ইমারৎ চুরমার করবে? আমি বলব, আমার ইচ্ছা। আমার ইচ্ছাই যেন একটা স্বতঃসিদ্ধ। একে একে আর সমস্ত স্বতঃসিদ্ধে আমি আস্থা হারিয়েছি। বাকি আছে আমার ইচ্ছা। আমার মনে হয় ইউরোপের মনীষাও ক্রমে ক্রমে যুক্তিমার্গ পরিত্যাগ করে ইচ্ছামার্গে পদক্ষেপ করছে। ডিক্‌টেটরশিপের বীজাণু এখন আকাশে বাতাসে। মনের সদর দরজায় পাহারা থাকলেও খিড়কি তো খোলা, সেই ছিদ্র দিয়ে শনি প্রবেশ করছে। আমার বা ইউরোপের উপায় নেই, সুধীদা। ডিক্‌টেটরকে উৎখাত করতে হলে ডিক্‌টেটরই হতে হবে।"

"যার বাইরে দ্বন্দ্ব ভিতরেও দ্বন্দ্ব সে কি কখনো জয়ী হতে পারে? জয়ের জন্যে তাকে তার ভিতরের দ্বন্দ্ব মিটিয়ে ফেলতে হবে। ইউরোপের মনীষীরা যদি জয়ের অন্য উপায় না দেখে ডিকটেটরদের সঙ্গে তাল রেখে ডিকটেটরবাদী হন তবে আমি আশ্চর্য হব না, বাদল। কিন্তু দুঃখিত হব, কেননা অন্য উপায় বাস্তবিকই আছে।"

"শুনি কী উপায়?"

"বাহুবলের একমাত্র প্রতিবেধ বাহুবল নয়, তা যদি হতো তবে প্রকৃতি মানুষকে নখী দন্তী বা শৃঙ্গী না করে জীবন সংগ্রামে কোন ভরসায় পাঠাত? নিরস্ত্র মানুষও সশস্ত্র মানুষকে পরাস্ত করতে পারে, যদি আত্মিক বলে বলীয়ান হতে শেখে ও অন্য কোনো বলের প্রয়োগ না করে।"

বাদল চিন্তা করল। বলল, "বিশ্বাস করতে পারিনে, সুধীদা। জোর করে বিশ্বাস করা যায় না। আত্মিক বলে আমার আস্থা নেই। অথচ বাহুবলেরও আমি মাত্রা মানি। আমার বাইরে দ্বন্দ্ব, ভিতরে দ্বন্দ্ব, আমি ভাসতে ভাসতে কোথায় গিয়ে পড়ছি, নিজেই জানিনে। আমার মনে হয় ইউরোপের মনীষাও আমারই মতো ভাসমান। মার্কসিস্টদের তবু একটা চার্ট আছে, আমাদের তাও নেই। আমরা drift করছি অচিহ্নিত সাগরে।"

"তোর মধ্যে এই প্রথম দ্বিধা দেখছি, বাদল।" সুধী মন্তব্য করল।

"আমার বিশ্বাসের মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে, সুধীদা। আমার ঈশ্বরে বিশ্বাস ছিল না, কিন্তু মানবে ছিল। মানবজাতি সহসা বিলুপ্ত হবে না, লক্ষ লক্ষ বছর বাঁচবে, ক্রমে ক্রমে প্রগতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করবে, সেই শিখরের নাম স্বর্গ—এই ছিল আমার নিশ্চিত প্রত্যয়, এই ছিল আমার একান্ত নির্ভর। 'ছিল' বললুম, 'আছে' বলতে পারলুম না, বললে মিথ্যা বলা হত। এখন অবশিষ্ট যা আছে তা আমার ইচ্ছা। ইচ্ছাও একটা প্রচণ্ড শক্তি। কিন্তু বিশ্বাসের জোর না থাকলে ইচ্ছার জোরও ড্রাইভার না থাকা ইঞ্জিনের মতো অকর্মণ্য।"

"তবে তোর প্রথম কর্তব্য হবে বিশ্বাসের অন্বেষণ।" সুধী পরামর্শ দিল। "যদি বিশ্বাস ফিরে পাস্ কিংবা নতুন বিশ্বাস খুঁজে পাস্ তা হলে তোর অসুখ আপনি সারবে।"

"আমিও সেই কথা বলি।"

"চেষ্টা করেছিস্ বিশ্বাস ফিরে পেতে ?"

"যথেষ্ট।" বাদল হতাশভাবে বলল, "ও বিশ্বাস ফিরবে না, সুধীদা।"

বাদল বলতে লাগল, "যদি স্বর্গ প্রতিষ্ঠা হয় তবে তা হবে আমাদের গায়ের জোরে—বিশ্বাসের জোরে নয়। হবে, এতটা বিশ্বাস নেই। হতেই হবে, এই অদম্য ইচ্ছায় যদি হয়। 'It will happen'—বলতে ভরসা পাইনে। 'It must happen'—বলতে বাধ্য হই।"

"হুঁ।" সুধী অন্যমনস্ক ছিল।

"পুরোনো বিশ্বাসের তো ফেরবার লক্ষণ নেই। নতুন বিশ্বাস যদি খুঁজে পাই!" বাদল বলল। "কিন্তু নতুন বিশ্বাসের সঙ্গে যদি ইচ্ছার সামঞ্জস্য না হয় তা হলে কি আমার অসুখ সারবে? কী জানি!"

"সে প্রশ্ন পরে। আপাতত তুই কোনো নতুন বিশ্বাসের অন্বেষণ কর।" সুধী বিধান দিল। "ঈশ্বরে বিশ্বাস নেই, মানবে বিশ্বাস গেছে। আত্মায় বিশ্বাস—কেমন, কখনো ভেবেছিস্ তার কথা ?"

"ভেবেছি। কিন্তু সেখানেও কয়েকটি জিজ্ঞাস্য আছে। আত্মা না হয় আছে, কিন্তু অমরত্ব ?" বাদল সংশয়ের স্বরে সুধাল।

"আত্মা থাকলে অমরত্বও থাকে। যেমন ফল থাকলে ফলের বীজ। অথবা বীজ থাকলে ফলের অবশ্যম্ভাবিতা।"

সব বীজ থেকেই কি ফল হয়?" বাদল জেরা করল। "বলতে পারো, সাধারণত হয়। কিন্তু হবেই হবে, বলতে পারো কি ?"

"অবস্থা অনুকূল হলে সব বীজ থেকেই ফল হয়। হতেই হবে।"

"তা হলে," বাদল তর্ক করল, "অবস্থার উপর নির্ভর করছে ফল হাওয়া না হওয়া। অমরত্ব তা হলে অবস্থাসাপেক্ষ। মরণের পরে আমি

থাকতেও পারি, নাও পারি। জন্মাতেও পারি, নাও পারি। একদম নিবে যেতে পারি, নাও পারি। এ সব কি আমি ভাবিনি, ভাই সুধীদা? কত ভেবেছি। ভেবে কোনো কূল কিনারা পাইনি। যে দিন ভালো খাই, ভালো ঘুম হয়, ভালো হজম হয়, শরীরটা ভালো লাগে সেদিন মনে হয় আমি বাঁচব, মরে গেলেও বাঁচব। যেদিন তার উল্টো সেদিন মনে হয় আমি বেশি দিন বাঁচব না, মরলে আমার চিতার আগুনের সঙ্গে সঙ্গে আত্মার আলোকেরও নির্বাণ।"

সুধী শুধু বলল, "কী করি? তুই তো ইনটেলেকটের জবানবন্দী ছাড়া আর কোনো প্রমাণ স্বীকার করিসনে। ইনটেলেকটের পাল্লার বাইরে যেসব সত্য রয়েছে তারা তোর বিচারে অসিদ্ধ। একটু আধটু ইনটুইশনের চর্চা কর, বাদল।"

"তাও কি করিনি?" বাদল স্মরণ করল ও করাল। "গোয়েনের ওখানে তবে কী করেছি? সেণ্ট ফ্রান্‌সিস্ হলের অনুভূতি কি ইনটুইশন লব্ধ ছিল না?"

সুধী নীরবে মানল।

"কিন্তু," বাদল জবাবদিহি করল, "ইনটুইশনের দ্বারা যা পেয়েছি তাকে ইনটেলেকটের কষ্টিপাথরে যাচাই করেছি, করে সন্তুষ্ট হইনি। সেইজন্যে চর্চা ছেড়ে দিয়েছি, সুধীদা।" জুড়ল, "নইলে ওর বিরুদ্ধে আমার কোনো প্রেজুডিস নেই।"

"ইনটেলেকট দিয়ে কি সব কিছু যাচাই করা যায়?" এই বলে সুধী আবৃত্তি করল—

"কমলবনে কে আসিল সোনার জহুরী
নিকষে পরখে কমল আ মরি আ মরি!"

বাদল মুগ্ধ হয়ে বলল, "চমৎকার। কিন্তু, ভাই, সোনার জহুরীর

যে ওই একটিমাত্র নিকষ। কমলের জন্যে সে আর একটা নিকষ পাবে কোথায়! আমার সবে ধন নীলমণি আমার ইনটেলেকটের কষ্টিপাথর।"

সুধী বলল, "তা হলে তুই কোনো দিন এই বিশ্বব্যাপারের মর্মভেদ করতে পারবিনে। রিয়ালিটি তোর জ্ঞানবুদ্ধির অতীত হয়ে রইবে। তোকে দিয়ে হবে বড় জোর সমাজের ও রাষ্ট্রের ওলটপালট—"

বাদল খপ করে কথা কেড়ে নিল। বলল, "তাই হোক, সুধীদা। তাই হোক। তা হলেই আমি কৃতার্থ হব, আমার তার বেশি কাম্য নেই। তবে, হাঁ—আমি যা চাই তা ঠিক ওলটপালট নয়, আমি চাই বিনা ওলটপালটে ওলটপালটের ফল।"

সুধী হাসল। "ইনটেলেকটকে তুই শানিয়ে তুলেছিস, দেখছি। যদি বিশুদ্ধ মননের কোনো পুরস্কার থাকে তবে সে পুরস্কার তুই পাবি। যদি শাণিত বুদ্ধির দ্বারা শোষণের জাল কাটে তবে তোর এই শান দেওয়া তরবারি ব্যর্থ হবে না ভাই।"

"ইনটেলেকটের অক্ষমতা কত তা কি আমি বুঝিনে, সুধীদা?" বাদল আর্দ্র স্বরে বলল। "কিন্তু আমার যে আর অন্য অস্ত্র নেই। প্রবল ইচ্ছাশক্তির দ্বারা শাণিত করছি ওকে, কিন্তু জ্বলন্ত বিশ্বাস ভিন্ন কে ওকে চালনা করবে?"

১০

সুধী চিন্তা করে বলল, "ঈশ্বরে কিংবা মানবে বিশ্বাস নেই, আত্মায় আছে কি না সন্দেহ। কিন্তু তোর সেই সোশ্যাল জাস্টিসের কী হলো? তাতে বিশ্বাস আছে নিশ্চয়?"

"সে পথে সংঘাত অপরিহার্য।"

"হলোই বা।"

"না, ভাই, আমি সংঘাতের মধ্যে নেই। সংঘাত এ ক্ষেত্রে শ্রেণীতে শ্রেণীতে। যদি শ্রমিক পক্ষে যোগ দিই তবে আমার আপনার লোকদের ঘরে আগুন দিতে হবে, কারখানা ছারখার করতে হবে, খুন জখম লুটতরাজ তাও করতে হবে। যদি ধনিক পক্ষে যুক্ত থাকি তবে যাদের প্রতি আমার এত দরদ তাদের উপর গুলি চালাতে হবে, তাদের পাড়ায় বোমা ফেলতে হবে, তাদের জোট ভেঙে কাঁদুনে গ্যাস থেকে শুরু করে বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার করতে হবে। রাশিয়ার বিপ্লবের পর থেকে সব দেশের ধনিকরা সতর্ক রয়েছে। এখন তাদেরই একারে সব চেয়ে মোক্ষম অস্ত্র, যার সঙ্গে তুলনায় শ্রমিকদের অস্ত্র অক্ষম।"

সুধী ধীরভাবে শুনছিল। বলল, "শ্রমিকরা যদি আত্মিক অস্ত্রের উপর আস্থা রেখে আর সব অস্ত্র বর্জন করে তবে তাদের সঙ্গে তুলনায় ধনিকদের অস্ত্র নিষ্প্রভ!"

"ওসব বুঝিনে।" বাদল বধির হলো। "বুঝি শুধু এই যে সংঘাত যেদিন বাধবে সেদিন দু'পক্ষেই আমাকে টানাহেঁচড়া করবে, না পেলে দু'খানা করবে। নিরপেক্ষতার অবকাশ দেবে না। মধ্য শ্রেণী যে মধ্যস্থতা করবে তেমন প্রতিপত্তিও তার নেই। মাঝখান থেকে তারই সব চেয়ে বিপদ, কারণ বাদুড়কে কোনো পক্ষই বিশ্বাস করে না। নাম ভাঁড়িয়ে, বুলি আউড়িয়ে, ভেক বদল করে বেশি দিন সে বাঁচবে না, বাঁচলেও পালিয়ে বাঁচবে। সুতরাং সংঘাত যাতে না বাধে সেই চেষ্টাই করতে হবে প্রাণপণে, যাতে এক পক্ষ আপোসে অপর পক্ষের দাবী মেনে নেয়, অর্ধেক ছেড়ে দেয়, তাই করতে হবে সময় থাকতে। অন্যথা সংঘাত অপরিহার্য। একবার আরম্ভ হলে আর রক্ষা নেই, সুধীদা। কোনো পক্ষই বাঁচবে না, যারা নিরপেক্ষ তারাও মরবে।"

বাদল এমন সবিস্তারে বলল যেন তৃতীয় নেত্রে দেখতে পাচ্ছিল। দেখছিল আর শিউরে উঠছিল।

"শ্রমিকেরা যেদিন প্রস্তুত হবে ধনীরা সেদিন অর্ধেক কেন, সমুদয় ছেড়ে দেবে, বাদল। কিন্তু প্রস্তুত হওয়া কেবল অহিংস অর্থেই সম্ভব, অন্য কোনো অর্থে তারা কোনো দিনই প্রস্তুত হবে না, কারণ প্রতিপক্ষ তাদের প্রস্তুত হতে দেবে না। তুই নিজেই তো বলছিস্ রাশিয়ার অভিজ্ঞতার পর থেকে ধনিকরা সতর্ক রয়েছে। আমিও তোর সে উক্তি সমর্থন করি।"

"তা হলেও," বাদল বলল, "শ্রমিকরা চিরকাল পড়ে পড়ে সইবে না। পায়ের তলার পোকাও পায়ে কামড় দেয়। শ্রমিকরা যেদিন মরীয়া হয়ে উঠবে সেদিন যা হাতে পাবে তাই দিয়ে মারবে—ও মরবে।"

সুধী স্বীকার করল না। "ধনিকেরা তাদের মরীয়া হয়ে উঠতে দেবে কেন? মজুরি বাড়িয়ে দেবে, ছেলেকে বিনা বেতনে পড়াবে, গুণের ছেলেকে জামাই করবে, যদি কিছুতেই তাদের মন না পায় তবে দেশে দেশে লড়াই বাধিয়ে দিয়ে তাদের বলবে, এবার সামলাও।"

বাদল রাগে ফোঁস ফোঁস করছিল। বলল, "অসম্ভব নয়। কিন্তু লড়াই একবার বাধলে যারা বাধাবে তারাও বাঁচবে না, দেখো। তাদের নিজেদের ফাঁদে তারাও পড়বে নির্ঘাত।"

সুধী হেসে বলল, "পড়া উচিত, পড়লে ন্যায়বিচার হয়। কিন্তু পড়বে কি? ওরা যে বড় সাবধানী পাখী।"

"পড়বেই, পড়বেই, পড়বেই।" বাদল যেন অভিসম্পাত দিল। "দেশে দেশে যদি যুদ্ধ বাধে তবে এক পক্ষের ধনীর অস্ত্রে অপর পক্ষের ধনীও মরবে। বিষবাষ্প তো ধনী দরিদ্র বিচার করে না। বোমাও সে বিষয়ে নির্বিচার।"

"কে জানে! আমার তো মনে হয় ওতে ওরা জব্দ হবে না। বরং ওতে ওদেরই সুবিধা হবে। দু'পক্ষেই মোড়লি করবে ওরা; মোড়লরা দরকারী লোক, দরকারী লোক পিছনেই থাকে, মরে কম।"

"মরবেই, মরবেই, মরবেই।" বাদল আবার অভিসম্পাত দিল। "তুমি লিখে রাখতে পারো আমার কথা। মিলিয়ে দেখো। ওরাও মরবে, গরিবরাও মরবে। যারা বাঁচবে তারা কিছুদিন বাদে ফের লড়বে ও মরবে। এ ব্যবস্থা বাঁচতে পারে না। এতে লিপ্ত রয়েছে যারা তাদেরও মরণ অনিবার্য। হয় শ্রেণী সংগ্রামে মরবে, নয় জাতি সংগ্রামে মরবে। হয় এক সংগ্রামে মরবে, নয় একাধিক সংগ্রামে। কিন্তু মরবেই, যদি না এ ব্যবস্থা বদলায়।"

বাদলকে চটানো তার স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর। সুধী শুধু বলল, "অন্যান্য দেশের ভার আমার উপরে নয়। আমি কেবল ভারতের জন্যেই দায়ী। আমি আমার দেশবাসীকে এমন ভাবে প্রস্তুত করব যে এক পক্ষ যখন নিতে প্রস্তুত হবে অপর পক্ষ তখন দিতে প্রস্তুত হবে। চাষীরা যখন জমির মালিক হতে চাইবে মালিকরা তখন জমি ছেড়ে দিতে চাইবে। জমি ছেড়ে দিয়ে কারুশিল্পে মন দেবে।"

"তাতেও শোষণ চলে।" বাদল সহজে ছাড়ল না। "সেটাও শোষণব্যবস্থার অঙ্গ। সুধীদা, তুমি বৈজ্ঞানিক ধারায় চিন্তা করতে শেখ।" পরামর্শ দিল বাদল।

"আমি হাতে কলমে কাজ করব, বাদল। বৈজ্ঞানিক ধারায় চিন্তা বৈজ্ঞানিকরাই করুন।"

"উহুঁ। হাতুড়ের কর্ম নয়।" বাদল ঘাড় নাড়ল। "খুব ভালো করে বুঝে দেখতে হবে ক্যাপিটালিজম বস্তুটা কী। জমি থেকে মূলধন উঠিয়ে নিয়ে তুমি চরকায় ঢালবে, কিন্তু তোমার মুনাফা তো তুমি মকুব

করবে না। মুনাফার জন্যে চাষীর রক্ত শুষছিলে, তাঁতীর রক্ত শুষবে। মশা এক জনের গা থেকে উড়ে গিয়ে আরেক জনের গায়ে বসে। তাতে রক্ত শোষণের পাত্র বদলায়, শোষণ যায় না। সমস্ত মূলধন ব্যক্তির তহবিল থেকে নিয়ে রাষ্ট্রের তহবিলে রাখতে হবে, এ হচ্ছে প্রথম কাজ। তার পরে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব জনকতক শাসকের মুঠোর ভিতর থেকে নিয়ে প্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণের আয়ত্তে আনতে হবে, এ হলো দ্বিতীয় কাজ। রাশিয়ায় এখনো দ্বিতীয়টা হয়নি, স্টালিনের দল জনসাধারণের বকলমে নিজেদের খেয়ালমতো অর্থব্যয় করছে। তবু সে দেশে প্রথমটা তো হয়েছে। বলপ্রয়োগ ও রক্তপাত বাদ দিয়ে তোমরা যদি ওদুটো কাজ করতে পারো তা হলেই জানব তোমরা চাষী ও তাঁতী উভয়েরই মিত্র। নতুবা তোমরা মিত্র কারো নও, শোষক একের পর অপরের। তুমি, সুধীদা, অবশ্য আদর্শবাদী। কিন্তু যাদের সঙ্গে তোমার কারবার তারা কেউ আদর্শবাদী নয়। চাষী ও তাঁতী তোমার আদর্শবাদ বুঝবে না। বুঝবে তুমি মুনাফা নিচ্ছ কি নিচ্ছ না, সেই অনুসারে তোমাকে বিচার করবে।"

সুধী মনঃস্থির করেছিল। স্থির কণ্ঠে বলল, "মুনাফা আমি চাষীর কাছ থেকে না নিলে তাঁতীর কাছ থেকে নেব। নিয়ে ওদের জন্যেই খরচ করব, অবশ্য নিজেকে একেবারে বঞ্চিত করব না। মশা তো রক্ত ফিরিয়ে দেয় না, কেন তবে মশার সঙ্গে তুলনা করছিস্ ?"

"তুলনাটা যদি তোমার মনে লেগে থাকে আমাকে মাফ কোরো, ভাই সুধীদা। কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত মীমাংসা যদি কাম্য হয় তবে মুনাফার জড় মারতে হবে। প্রাইভেট প্রফিট হচ্ছে এ ব্যাধির ব্যাসিলি। তবে, হাঁ, রোগের জড় মারতে গিয়ে রোগীর ধড় মারতে যাওয়া বেকুবি। কোনো কোনো ডাক্তার ঠিক হাতুড়ের মতোই বেকুব। সেইজন্যে

রাশিয়ার দৃষ্টান্ত থেকে ধরে নিতে নেই রক্তগঙ্গা বইয়ে না দিলে প্রাইভেট প্রফিট ভেসে যাবে না।"

"আমি কিন্তু প্রাইভেট প্রফিটকে রোগের জড় বলে ভুল করব না।" সুধী দৃঢ়তার সহিত বলল। "তোর বৈজ্ঞানিকরা রোগনির্ণয় না করেই রোগের জড় মারছেন। ওটা আন্দাজী চিকিৎসা। টাইফয়েডে যেমন কুইনিন।"

"তবে তোমার মতে রোগটা কী ?"

"আমিও মানছি যে শোষণ চলেছে, আমিও চাই যে শোষণের অবসান হোক, কিন্তু আমার মতে," সুধী সবিনয়ে বলল, "অন্তরের পরিবর্তন না হলে কিছুতেই কিছু হবে না। যদি অন্তরের পরিবর্তন হয় তবে প্রাইভেট প্রফিট থাকলে ক্ষতি কী ? রাষ্ট্র কি আমার চেয়ে বেশি বিজ্ঞ ? আমার চেয়ে বেশি দরদী ? ওটা তো একটা মেশিন। চাষীরা ও তাঁতীরা আমার কাছে যদি দু'চার পয়সা ঠকে তো সে পয়সা আমাকে ঠকিয়ে ফেরৎ নেবে। কিন্তু রাষ্ট্র যে নিজের খোশখেয়ালে চাষীকে মিলহাণ্ড তাঁতীকে মেকানিক বানিয়ে ভিটেমাটি ছাড়াবে। সংস্কার হারিয়ে, সংস্কৃতি হারিয়ে, নোঙর ছেঁড়া নৌকার মতো তারা কোথায় তলিয়ে যাবে ভাবতেও হৃৎকম্প হয় !"

"বুঝেছি।" বাদল একটু শ্লেষ মিশিয়ে বলল, "তোমার মনোগত অভিপ্রায় এই যে চাষীরা চাষীই থাকুক, তাঁতীরা তাঁতী। প্রগতি হবে না, মানব সভ্যতা চিরকাল পায়চারি করতে থাকবে ফিউডাল যুগে। ধিক্ !"

"না, প্রগতি হবে না, প্রগতি বলতে যদি বোঝায় দিশেহারা দরিয়ায় গা ভাসানো। পশ্চিমের লোক যে drift করছে তা তুই নিজেই বলেছিস্। ভারতের লোক দিশেহারা হবে না, দৃষ্টিমান হবে। অন্তরের পরিবর্তনই মুখ্য, আর সব গৌণ।"

বাদল কানে হাত দিয়ে বলল, "থাক, প্রগতিনিন্দা শুনব না।"

১১

সুধী কিন্তু আনন্দ বোধ করল। বলল, "ওরে, তোর অসুখ সারবে।"

বাদল আশ্চর্য হলো। "সারবে? কী করে বুঝলে?"

"এখনো যে তোর একটা বিশ্বাস রয়েছে। প্রগতিতে বিশ্বাস।"

"ওহ্!" বাদল সংশোধন করল। "প্রগতি যে হবেই, এ বিশ্বাস আর নেই। কিন্তু প্রগতি যে হওয়া উচিত, এ বিশ্বাস এখনো আছে। বোধ হয় এই নিঃশ্বাস আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে।"

"তা হলে তোর বিশ্বাসে আঘাত লাগে এমন কিছু বলা অন্যায় হবে। যদি তেমন কিছু বলে থাকি তবে ক্ষমা চাইছি, বাদল।"

"না, না। ক্ষমা চাইতে হবে কেন?" বাদল ব্যস্ত হয়ে বলল। "আমি কি জানিনে যে তুমি প্রগতিবাদী নও। তুমি তো নতুন কিছু বলনি।"

দু'জনে অনেকক্ষণ নির্বাক থাকল। মনে হলো সব কথা ফুরিয়েছে।

তার পরে বাদল প্রশ্ন করল, "তুমি আজকাল কী ভাবো, সুধীদা? তোমার বিশ্বাসের কি তিলমাত্র পরিবর্তন হয়েছে?"

"আমার?" সুধীর ধ্যান ভাঙল। "হাঁ। আমিও মানুষ। আমারও একটা-আধটা ইস্ক্রুপ আলগা হয়েছে।" এই বলে হাসল।

"যে শক্ত মানুষ তুমি!" বাদলও হাসল। "একটা ইস্ক্রুপ আলগা হওয়াও অলৌকিক ঘটনা।"

"একদিক থেকে আমি তোর খুব কাছাকাছি এসে পড়েছি।" সুধী বাদলকে খুশি করে তুলল। "আগে আমার ধারণা ছিল সমাজের সঙ্গে

ব্যক্তির ঠোকাঠুকি বাধলে সমাজ সব সময় অভ্রান্ত, ব্যক্তি সব সময় ভ্রান্ত। এখন সে ধারণা শিথিল হয়েছে।"

"তাই নাকি?" বাদল উচ্ছ্বসিত স্বরে অভিনন্দন জানাল।

"হাঁ। আমাদের দেশে আমরা বহু শতাব্দী ধরে রাষ্ট্রের মালিক নই। আমাদের যা কিছু কর্তৃত্ব সমাজকে ঘিরে। সমাজের উপর আমরা সেই সব গুণ আরোপ করেছি যে সব গুণ রাষ্ট্রের উপর আরোপ করা হয় ইউরোপের কোনো কোনো দেশে। কোনো কোনো দার্শনিকের রচনাতেও।"

"আমার নাচতে ইচ্ছা করছে, সুধীদা।" বাদল করুণ স্বরে বলল। "কিন্তু নাচব কী করে! কোমরে ব্যথা।"

সুধী তাকে শুইয়ে দিয়ে বলল, "তুই নাচতে চাস্ কোন সুখে? তুই না বলছিলি ব্যক্তির ধন সমাজের তহবিলে দিতে?"

"কিন্তু এই শর্তে যে ব্যক্তি তার উপর খবরদারী করবে।" বাদল উত্তর করল সপ্রতিভ ভাবে।

সুধী চিন্তান্বিত হলো। বলল, "থিওরীহিসাবে মন্দ নয়। কার্যত অচল। কিন্তু আমার কথা চলছিল, আমার কথাই চলুক।"

"বেশ, আমি কান পেতেছি।"

"বলছিলুম, রাষ্ট্র বা সমাজ সব সময় অভ্রান্ত এ ধারণার ইস্ক্রুপ ঢিলে হয়েছে। রাষ্ট্র আমাদের দেশে পরহস্তগত, সুতরাং রাষ্ট্র সম্বন্ধে এমন ধারণা সহজেই শিথিল। সমাজ আমাদের স্বহস্তে, সেইজন্যে সমাজ সম্বন্ধে আমার ধারণার শৈথিল্য আমার নিজের কাছেই অপ্রীতিকর। কিন্তু কী করব, সত্য কি সকলের ঊর্ধ্বে নয়!"

বাদল মাথা নেড়ে তারিফ করল। সুধী বলতে লাগল।

"বস্তুত সমাজ ও রাষ্ট্র একই মুদ্রার এ পিঠ ও পিঠ। আমরা যে

ওদের বিচ্ছেদ কল্পনা করেছি তা কেবল বিদেশীর দ্বারা স্বতরাষ্ট্র হয়ে। ভুল রাষ্ট্রেরও হয়, সমাজেরও হয়। অন্যায় রাষ্ট্রও করে, সমাজও করে। রাষ্ট্রের বিধান অমান্য করা বিধেয় হলে সমাজের বিধি অমান্য করাও বৈধ। তা হলে আমি কোন স্পর্ধায় বিচার করতে যাব উজ্জয়িনীকে ?"

ওর জন্যে বাদল প্রস্তুত ছিল না। কেন ও কথা অসময়ে উঠল ? বাদলের জিজ্ঞাসু ভাব লক্ষ্য করে সুধী বলল, "শোন, সেদিন উজ্জয়িনীকে চিঠি লিখেছিলুম আসতে। লিখেছিলুম, স্বামীর অসুখ, স্ত্রীর কর্তব্য সেবা। তার জবাব পেয়েছি। সে বলে, বাদলের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। সেবা করতে পেলে ধন্য হব। কিন্তু স্ত্রী হিসাবে নয়। আমি স্বকীয়া।"

"ঠিকই বলেছেন।" বাদল উজ্জয়িনীর পক্ষ নিল। "কিন্তু চির-কৃতজ্ঞ কেন ? আমি তো তাঁর উপকার করিনি, বরং অজ্ঞাতসারে ও অনিচ্ছাসত্ত্বে অপকার করেছি।"

"যাক, সে তো আসছে। তখন বোঝাপড়া হবে। কিন্তু সধবা মেয়ের মুখে স্বকীয়া শুনলে আমার সংস্কারে আঘাত লাগে। শুধু সধবার মুখে কেন, কুমারীর মুখে, বিধবার মুখেও। ও কথা মুখে আনতে পারে তারাই যারা সমাজের বাইরে চলে গেছে। যারা পতিতা।"

"অত্যন্ত বর্বর সংস্কার।" বাদল উত্তেজিত হলো। "পুরুষ যদি বলে, আমি স্বকীয়, সকলে সাধুবাদ দেয়। নারী বললেই সংস্কারে বাধে।"

"আমি তোকে সেই জন্যেই বলেছিলুম যে নারীকে বিচার করবার অধিকার আমার নেই, যদিও সে নারী আমার সহোদরার অধিক।"

"তোমার অন্তরের পরিবর্তন হয়েছে। এইটেই মুখ্য, আর সব

গৌণ।” বাদল সুধীর উক্তি সুধীকে ফিরিয়ে দিল, দিয়ে কৌতুক অনুভব করল।

সুধী কিন্তু হাসল না। তলিয়ে গেল চিত্তের অতলে।

“তুমি যে আমার খুব কাছাকাছি এসে পড়েছ,” বাদল বলল, “আমি এতে খুশি। তুমি বোধ হয় খুশি নও।”

“না, আমিও। তোর কাছে আসতে কি আমি কম উৎসুক, বাদল? তুই আর আমি কি ভিন্ন? কিন্তু কোনো কোনো বিষয়ে আমাদের দু'জনের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। ইনটেলেকট ছাড়া তুই অন্য কোনো ভাষা বুঝিস্‌নে, ইনটুইশনকেও ইনটেলেকটের দ্বারা তর্জমা করে নিস্‌। তোর প্রাণ যদি বলে, এটা সত্য, তোর মন বলে, প্রমাণ কী? আমি কিন্তু মনের প্রাধান্য স্বীকার করিনে। আমার ধ্যান যদি বলে, এটা সত্য, আমার মন সেটা মেনে নেয়। নিতে বাধ্য। মনকে আমি সেই ভাবে তালিম করেছি। তুই যদি তোর মনটাকে ডিসিপ্লিন করতে পারতিস্‌ তবে কি তোর সঙ্গে আমার লেশমাত্র ব্যবধান থাকত রে!” সুধী সস্নেহে তাকাল।

বাদল ভাবল। ভেবে বলল, “সত্যি আমার মনটা উচ্ছৃঙ্খল। কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল বলেই সে নিত্য নতুন আইডিয়া আবিষ্কার করে। তোমাদের কাছে আমি ক'টাই বা প্রকাশ করতে পারি। দিন রাত কত অজস্র আইডিয়া আসে কী জানি কোনখান থেকে—ভিতর থেকে কি বাইরে থেকে! সেই সব রঙিন প্রজাপতি কি আসত আমার কাছে, বসত আমার হাতে, যদি না আমি শিশুর মতো কৌতূহলী হতুম? শিশুর মতো উচ্ছৃঙ্খল?”

“আছে তোর মধ্যে একটি চির শিশু।” সুধী তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল। “আর আমার মধ্যে একজন চির স্থবির।

আমি যে অতি প্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধিকারী। আর তুই কোনো রকম উত্তরাধিকার মানিস্‌নে। না, পিতৃধনের, না পৈত্রিক বিত্তের, না পৈত্রিক সত্যের।"

"অনেক সময় শিশুর মতো অসহায় বোধ করি, সুধীদা।" বাদল কবুল করল। "উত্তরাধিকারের নিরাপদ আশ্রয় একটা মস্তবড় জিনিস।"

সুধী তাকে বোঝাতে চেষ্টা করল, "পাখীরা আকাশে ওড়ে। কিন্তু উড়তে পারত কি, যদি না তাদের নীড় থাকত মাটিতে? তেমনি মানুষেরও একটা দেশ থাকা দরকার। তুই যদি ইংলণ্ডের উত্তরাধিকারী হতে পারতিস তবে কথা ছিল না, কিন্তু তুই দুই দেশের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত। ভারতের ধন থেকে স্বেচ্ছায়, ইংলণ্ডের ধন থেকে অনিচ্ছায়।"

বাদল একটু উষ্ণ হয়ে বলল, "ইংলণ্ডের ধন থেকে বঞ্চিত, কী করে জানলে?"

"কারণ, না কন্‌সারভেটিভ, না লিবারল, না লেবার, কারো সঙ্গেই তোর খাপ খায় না। তোর নিজের অলক্ষ্যে তোর মনের ধাঁচ কন্টিনেণ্টাল হয়েছে। কতকটা কমিউনিস্ট, কতকটা য়্যানার্কিস্ট। তুই যখন লিবার্টির কথা বলিস তখন সেটা ক্রোচে কথিত লিবার্টি। বাদল, তোর ইংলণ্ডে থাকা না থাকা সমান।"

বাদল বিষম শক্ পেল। সামলে নিতে তার সময় লাগল।

"সুধীদা," সে অতি কষ্টে উচ্চারণ করল, "সত্য সকলের উর্ধ্বে। ইংলণ্ড একদা আমার দেশ ছিল। এখন নয়।"

"তা হলে," সুধী আবেগভরে বলল, "তুই আমার সঙ্গে ভারতে ফিরে চল।"

"ভারত," বাদল প্রতীতির সহিত বলল, "কোনো দিন আমার দেশ হবে না।"

"তবে তুই যাবি কোথায়? কন্টিনেন্টে?"

"না, সেখানেও আমার খাপ খাবে না। আমি সব জায়গায় বেখাপ। কাজেই কোনো জায়গায় যাব না। যেখানে আছি সেখানেও থাকব না।"

সুধী বিহ্বল স্বরে সুধাল, "তার মানে কী, পাগল?"

"জানিনে।" বাদল তার চুল টানতে টানতে বলল, "আমার দেশ নেই, এ যুগ আমার কাল নয়। আমার কেউ নেই, আমি একক। কেন তবে আমি থাকব? কে আমাকে চায়?"

"ও কী বকছিস, বাদল!" সুধী তাকে শাসন করল। "তোর কেউ নেই কী রকম! আমি রয়েছি, তোর অভিন্নহৃদয় বন্ধু। তোর কত কাছাকাছি এসে পড়েছি, আরো কাছে আসব, তুই সঙ্গে চল।"

"বৃথা সান্ত্বনা দিচ্ছ, সুধীদা। তোমাদের এই শৃঙ্খলাবদ্ধ determined জগতে আমার ঠাঁই নেই। আমি উচ্ছৃঙ্খল free will."

আমার কথাটি ফুরাল

১

চার সপ্তাহ পূর্বে সে যখন যায় তখন বালিকা। চার সপ্তাহ পূর্বে সে যখন ফেরে তখন পূর্ণবয়স্কা নারী। কার্ল্স্বাডের জলে কি যাদু আছে? বিস্মিত হয়ে ভাবছিল সুধী।

স্তম্ভিত হলো যখন উজ্জয়িনী তাকে টিপ করে একটা প্রণাম করল। ট্যাক্সি তখনো দাঁড়িয়ে, যদিও পথে তেমন লোক চলাচল ছিল না। সুধীদের পাড়াটি নিস্তব্ধ, শনিবারের বন্ধে প্রতিবেশীরা শহরের বাইরে। তা হলেও গেটে ঢুকতে না ঢুকতে আচমকা একটা প্রণাম—নেহাৎ গাছপালার আড়াল ছিল বলেই রক্ষা—একেবারে অভূতপূর্ব ব্যাপার।

স্তম্ভিত হয়েও তার সেদিন নিষ্কৃতি নেই। উজ্জয়িনী একান্ত শান্ত ভাবে নিতান্ত লক্ষ্মীটির মতো সুধাল, "দাদা, ভালো আছো তো?"

সুধী বলল, "হ্যাঁ। তুই?"

"যেমন দেখছ।" এই বলে একটু মিষ্টি হেসে উজ্জয়িনী প্রশ্ন করল, "বাদলদা কেমন আছেন?"

হতভম্ব সুধী নিজের কানকে বিশ্বাস করবে কি না বুঝতে পারছিল না। জিজ্ঞাসা করল, "কী বললি?"

"বলছিলুম," উজ্জয়িনী স্নিগ্ধস্বরে পুনরুক্তি করল, "বাদলদা কেমন বোধ করছেন?"

বাদল কবে থেকে এর দাদা হলো! সুধীর রক্তে সনাতন চণ্ডীমণ্ডপের সংস্কার টগবগিয়ে উঠছিল। সে একটা গর্জন ছাড়বে কি না চিন্তা

করছে এমন সময় যা শুনল তাতে তার মাথা ঘুরে গেল, ব্রহ্মতালুতে তাল পড়ল।

"মহিম খুড়োকে খবর দেওয়া হয়েছে?" উজ্জয়িনী নিরীহভাবে বলল।

মহিম খুড়ো! শ্বশুরকে খুড়ো বলা কবে থেকে ফ্যাশন হল! সাম্প্রতিক মেয়েরা কি ভাশুরকে দাদা বলেই ক্ষান্ত নয়, শ্বশুরকে খুড়ো বলে? ওঃ! একেই কি বলে প্রগতি!

বাদল তখন বাগানে শুয়ে মনে মনে বোতাম টিপছিল। উজ্জয়িনী তার পায়ের কাছে মাথা ঠেকিয়ে বলল, "বাদলদা, প্রণাম।"

বাদল ভ্যাবাচাকা খেয়ে উঠে বসল। বলল, "প্রণাম? নমস্কার। হাউ ডু ইউ ডু?"

ওদিকে সুধী দে সরকারের কাছে কৈফিয়ৎ তলব করছিল। এসব কী! ও মেয়ে তো এমন ছিল না।

ভিজে বেড়ালটি সেজে দে সরকার বলছিল, "কী জানি! আমিও তো তাজ্জব বনেছি। দেখছ না, আমার গা দিয়ে কেমন ঘাম যাচ্ছে।"

"সেদিন ওকে দিয়ে এলুম লিভারপুল স্ট্রীট স্টেশনে।" সুধী গজগজ করছিল। "এখনো একটা মাস পূরো হয় নি। এর মধ্যে কী এমন ঘটল! ওর দুষ্টুমি আমার বেশ ভালো লাগত, কিন্তু এই শিষ্টামি—ওঃ!

দে সরকার সহানুভূতির স্বরে বলছিল, "ওঃ! মহিম খুড়ো!"

"সত্যি অসহ্য।"

"আমিও তাই বলতে যাচ্ছিলুম। রীতিমতো অসহ্য।"

"আমার মাথা ঘুরছে হে।"

"তোমার তো শুধু মাথা, আমার সর্ব শরীর। ওঃ! মহিম খুড়ো!"

মাথায় জল ছিটিয়ে সুধী যখন বাদল উজ্জয়িনীর কাছে এলো তখন ওরা দিব্যি জমিয়ে বসেছে।

উজ্জয়িনী বলছে বাদলকে, "আপনার ও চিঠি আমি পাইনি। পেলেও বিয়েতে মত দিতুম। বিয়ে না করলে মা বাপের অধীনতা থেকে মুক্ত হতুম কী উপায়ে!"

"কিন্তু বিয়ে করেও যে পরাধীন হলেন।" বাদল মন্তব্য করছে।

"আপনি যে তার থেকেও আমাকে মুক্তি দিয়েছেন। আমার মতো সুখী কে?"

"আমার কিন্তু ধারণা ছিল আপনি সুখী হননি।"

"আমারও সে ধারণা ছিল। এখন বুঝেছি স্বাধীনতাই সংসারের সেরা সুখ। একবার যে এ সুখের আস্বাদন পেয়েছে সে অন্য কোনো সুখ চায় না, বাদলদা।"

"তা হলে আমাকে মার্জনা করেছেন?"

"আমি আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ। আপনি আমাকে বার বার আঘাত করে আমার অধীনতার মোহ ভাঙিয়েছেন, আমাকে স্বাধীনতার দীক্ষা দিয়েছেন।"

"আঘাতের জন্যে আমি লজ্জিত।"

"সে আপনার মহত্ব। তা ছাড়া নারীহিসাবেও আমি আপনার কাছে ঋণী। আমাকে আপনার দখলে পেয়েও আপনি কোনোরূপ সুযোগ নেন নি। এর দরুণ একদা আমার অভিমান ছিল। এখন দেখছি খুব বেঁচে গেছি। নইলে নিজেকে মনে হত ভ্রষ্টা।"

সুধী যেমন এসেছিল তেমনি চলে গেল। বসল না। সে কি শুনতে প্রস্তুত ছিল এ ধরণের কথা! ছি ছি! কত আশা করে সে উজ্জয়িনীকে চিঠি লিখেছিল। ভেবেছিল এক বাড়িতে থেকে হামেশা

মেলামেশা করে পরস্পরের সুখদুঃখের ভাগী হয়ে তারা অবশেষে একটা বোঝাপড়ায় পৌঁছবে। হা হতোঽস্মি।

দে সরকার ইতিমধ্যে রন্ধনশালায় অনধিকারপ্রবেশ করে চায়ের আয়োজন করছিল। সুধীকে দেখে বলল, "তুমি তো নিমন্ত্রণ করবে না। অগত্যা নিজেই নিজেকে নিমন্ত্রণ করেছি।"

সুধী জানতে চাইল, "কই, বাদলের শাশুড়ী এলেন না যে?"

"বাদলের শাশুড়ী!" দে সরকার যেন আকাশ থেকে পড়ল। তার ইচ্ছা করছিল বলতে, আমার শাশুড়ী। কিন্তু সাহস ছিল না। বলল, "মিসেস গুপ্ত কী করে আসবেন? তাঁর যে হপ্তায় হপ্তায় বাথ নিতে হয়। তিনি তোমাকে চিঠি লিখেছেন। দেব"

"কিন্তু বাড়িতে অন্য কোনো স্ত্রীলোক নেই যে। উজ্জয়িনীর অসুবিধা হবে।" সুধী উদ্বেগ প্রকাশ করল।

"ওঃ! এই কথা!" দে সরকার বলল, "কী চাও? ঝি, না রাঁধুনি, না শাপেরোন? কবে চাও? আজ, না কাল, না দু'দিন পরে?"

সুধী এ বিষয়ে চিন্তা করেনি। বিবেচনার জন্যে সময় নিল।

"বেশ, দরকার হলেই সরকারকে বোলো। কিন্তু আমি কী অভদ্র। পেটের সেবায় লেগে গেছি, ওদিকে বাদলের সেবা দূরে থাক, সে কেমন আছে খবরটাও নিইনি। চল হে, চায়ের ভেট নিয়ে তাকে সন্দর্শন করি।"

বাদলের সম্মুখীন হতে তার যেমন সঙ্কোচ তেমনি কুণ্ঠা। গিয়ে হাজির হলো বটে, কিন্তু শরমে নীরব রইল। উজ্জয়িনীর কিন্তু কণামাত্র গ্লানি ছিল না সে পরম অকপটে আলাপ করছিল, যেন লুকোচুরির কিছু নেই, সবই খোলাখুলি।

"কুমার, এস, বাদলদাকে প্রণাম কর।" উজ্জয়িনী হাটে হাঁড়ি ভাঙল।

বাদল তো মহাদেব। বুঝল না কী ব্যাপার। শশব্যস্তে বলল, "না, না, প্রণাম কেন? আমি যে বয়সে ছোট।"

দে সরকায় প্রমাদ গণল। সুধীর দিকে আড় চোখে চেয়ে দেখল মুখখানা কালো হয়ে গেছে, যেন অপমানে বিবর্ণ।

উজ্জয়িনী তেমনি অথলভাবে বলল, "শুনবে সুধীদা? আমাদের আশ্রমে বাগান তো থাকবে। মালী হবে কে জানো? এই লোকটি।"

সুধী উচ্চবাচ্য করল না। বাদল বলল কুমারকে, "তুমি বুঝি মালীর কাজে ওস্তাদ?"

"কোন কাজে নয়?" উজ্জয়িনী প্রশংসার ভঙ্গীতে তাকাল।

বেচারা বাদল। সরল মানুষ, কিছুই ঠাহর করতে পারছে না। তার জন্যে সুধীর মায়া হয়। অথচ উজ্জয়িনীও তেমনি সরলা। সুধীর রাগ পড়ল গিয়ে দে সরকারের উপর।

দে সরকার থাকতে সুধীর তিষ্ঠানো দায় হল। সে এক সময় সরে পড়ল। কেবল বাগান থেকে নয়, বাড়ী থেকে। বলতে ভুলে গেছি যে ওটা একটা ফ্ল্যাট নয়, একটা semi-detached বাড়ি। যাঁদের বাড়ি তাঁরা গরম কালটা বাইরে কাটাচ্ছেন, ততদিন সুধী-বাদলের ভাড়ার মেয়াদ। ততদিনে, সুধীর বিশ্বাস, বাদল সেরে উঠবে।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে সুধী যে দিকে দু'চোখ যায় সেদিকে চলল। কল্পনা করতে বিশ্রী লাগছিল সেই দৃশ্যটা—একটা মেয়ে তার পতি ও প্রণয়ী উভয়ের মাঝখানে বসে দু'জনকেই চা পরিবেষণ করছে।

কিন্তু সুধীর শিক্ষানবীশী কিসের জন্যে যদি একদিনের ঝড়ে এত দিনের সংযম ভেঙে পড়ে! রাগ করা অশোভন, তা ছাড়া রাগ করে

লাভ কী! জীবনের অন্যান্য সমস্যার মতো এটাও একটা সমস্যা। শীতল মস্তিষ্কে এটারও একটা সমাধান করতে হবে। রাগের মাথায় চণ্ডী-মণ্ডপবিহারীরা ভাবতেন বহিষ্কারের বিধানটাই সমাধান। আসলে ওটা প্রতিবেশী সমাজের পুষ্টিবিধান। অমনি করে চণ্ডীমণ্ডপ নিজেই নিজেকে দুর্বল করেছে, ক্ষয় রোগে ভুগছে হিন্দু সমাজ।

তা হলে এই ঘোর অসামাজিক প্রণয়ের প্রশ্রয় দিতে হবে? কিছুতেই না। সুধীর মধ্যে এতদিন অন্তর্দ্বন্দ্ব ছিল না, এই বুঝি আরম্ভ হলো। তার খেয়াল যাচ্ছিল ছুটে কোথাও পালাতে। অথচ শুভবুদ্ধি বলছিল, না, বাসায় ফিরে যেতেই হবে। সব সমস্যারই সমাধান আছে। সব তালা এক চাবীতে খোলে না, প্রত্যেকের চাবী আলাদা। এই তালাটার চাবী খুঁজে বের করতে হবে। চাই ধৈর্য। বহিষ্কার নয়, পলায়ন নয়, সধৈর্য সন্ধান।

২

সুধী যখন ফিরল তখন বাদলের ঘরে ঢুকে দেখল সেখানে উজ্জয়িনীর বিছানা পাতা হয়েছে, সুধীর বিছানা সেখান থেকে তার নিজের ঘরে সরানো হয়েছে। ভালো। তার মনটা একটু নরম হলো। মেয়েটি মুখে যাই বলুক কাজে এখনো ঠিক আছে।

তার পরে সুধীর মনে পড়ল রান্নার ব্যবস্থা হয়নি। তারই তো কর্তব্য। তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে গিয়ে দেখল দে সরকার কোমরে এপ্রন জড়িয়ে রাঁধুনি সেজেছে। গনগনে আগুনের আভায় তার মুখচোখ রাঙা। সুধী তার মনোযোগ ভঙ্গ করল না। নিজের ঘরে গিয়ে বই খুলে বসল। উজ্জয়িনী তখন বাদলের সঙ্গে পায়চারি করছিল বাগানে।

আইন অমান্য সম্বন্ধে গবেষণা করতে করতে সুধী Thoreau লিখিত "Civil Disobedience" আবিষ্কার করেছিল। সেই অপূর্ব প্রবন্ধ পড়তে পড়তে সে দেশকাল ভুলে আর এক দেশে ও আর এক যুগে উপনীত হলো।

এই ভাবে কতক্ষণ কাটল সময়ের হিসাব ছিল না। সুধীকে সচকিত করল উজ্জয়িনীর আহ্বান। "দাদা, এস। খাবার দেওয়া হয়েছে।"

"আমি খাব না।" সুধীর ক্ষুধা ছিল না।

"খাবে না? রাগ করেছ?"

"না, রাগ করিনি।" সুধী আনমনে বলল।

"আমি জানতুম তুমি ভুলেও মিথ্যা কথা বল না।"

"বেশ." সুধী চোখ তুলে বলল, "রাগ করেছি তো করেছি।"

"কী করি, বল। একটু দেরি হয়ে গেছে। আমারই উচিত ছিল রান্নাঘরে যাওয়া। কিন্তু বাদলদা—"

সুধী বাধা দিয়ে বলে উঠল, "ফের যদি বাদলদা শুনি তো পাগল হয়ে যাব। বাদল কবে থেকে তোর দাদা হলো? স্বামীকে কোন দেশে দাদা বলে ডাকে?"

উজ্জয়িনী তার হাত ধরে বলল, "চল, খাবে চল। খেলে আপনি রাগ পড়ে যাবে। তার পরে বলব তোমাকে আমার যা বলবার আছে। লক্ষীটি, চল। আর বাদলদা বলে ডাকব না।"

উজ্জয়িনী কথা রাখল। খাবার টেবলে বাদলকে ডাকল খালি বাদল বলে। 'আপনি' থেকে এক সময় 'তুমি'তে নামল। বাদলেরও তাতে সহযোগিতা দেখা গেল। সেও শুরু করল 'উজ্জয়িনী', 'তুমি'।

আহারাদির পরে উজ্জয়িনী বলল সুধীকে নিভৃতে, "তুমি আসতে লিখেছিলে, তাই এসেছি। আমি তোমার ও তোমার বন্ধুর অতিথি। অতিথির উপর রাগ করা কি সুনীতি, না সুরুচি?"

"সে কী রে!" সুধী অপ্রস্তুত হয়ে বলল, "অতিথি কেন হবি? তোরই তো স্বামী, তোরই তো সংসার।"

"তোমার মতে হয়তো তাই। বাদলের মতে?"

"বাদলের মতামতে কিছু আসে যায় না। বিবাহ একটা সামাজিক ক্রিয়া, ওতে কেবল বরের একার নয় সমগ্র সমাজের যোগাযোগ। সমাজের মতে সে তোর স্বামী, তুই তার স্ত্রী। তোর যদি কোনো নালিশ থাকে তবে তা সমাজের বিরুদ্ধে।"

"নালিশ আমার নেই কারো বিরুদ্ধে।"

"তবে?"

"তবে কী?"

"তবে তুই তার স্ত্রী, সে তোর স্বামী।"

উজ্জয়িনী চুপ করে থাকল। তার পরে বলল, "বিয়ের সময় আমি বালিকা ছিলুম। শুধু বিয়ের সময় কেন, এই সেদিন পর্যন্ত। আমার অঙ্গীকার কি নীতির আমলে আসবে?"

সুধী চট করে জবাব দিতে পারল না। ভেবে বলল, "কেন, তুই তো মেনে নিয়েছিলি তোর বিয়ে।"

"মেনে নিয়েছিলুম। কিন্তু তত দিন মেনে নিয়েছিলুম যত দিন আমার মনের বয়স হয়নি। স্বপ্ন মানুষ ততক্ষণই দেখে যতক্ষণ না তার জাগরণ হয়।"

"আচ্ছা, কাল ওকথা হবে। এখন যা, ঘুমিয়ে পড়। ট্রেনে ভালো ঘুম হয়নি নিশ্চয়। তোকে আর জাগিয়ে রাখব না। যা, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে

স্বপ্ন দেখ, যতক্ষণ না জাগরণ হয়।" এই বলে সুধী চিন্তা করবার সময় নিল।

কত কাল পরে বাদল আর উজ্জয়িনী এক কক্ষে শুচ্ছে, পাশাপাশি শয্যায়। অথচ কেউ কাউকে কামনা করছে না। অদৃষ্টের পরিহাস।

তাদের দাম্পত্য আলাপের নমুনা শুনুন। উজ্জয়িনী বলছে, "রাত্রে যদি দরকার হয় আমাকে নাড়া দিলেই সাড়া দেব। নাড়া দিতে ইতস্তত কোরো না, বাদল।"

"দরকার হলেও আমি তোমার ঘুমের ব্যাঘাত করব না, উজ্জয়িনী। নিদ্রার যে কী দুর্লভ সুখ তা কি আমি জানিনে! তোমার সুনিদ্রা হোক।" বলছে বাদল।

"তোমারও।"

"আমার!" বাদল উপহাস করছে। "এ জন্মে নয়!"

"তোমার জন্যে," উজ্জয়িনী বলছে, "আমার বড় দুঃখ হয়।"

"আমার জন্যে," বাদল বক্তৃতা আরম্ভ করছে, "দুঃখ করা বৃথা। বরং দুঃখ কোরো তাদের জন্যে যাদের জন্যে আমি দুঃখিত।" এর পরে বাদল শোষিতদের পক্ষে ও শোষকদের বিপক্ষে কী যেন বলছে, কিন্তু উজ্জয়িনী অসাড়।

"ঘুমিয়ে পড়লে?" বাদল সুধায়।

উজ্জয়িনী ততক্ষণে অর্ধেক পারাবার পার হয়েছে। বাদলের বক্তৃতার অর্ধেকও শোনেনি। বাদল মর্মাহত হয়। এর চেয়ে সুধীদা ছিল সমঝদার শ্রোতা। কাল থেকে আবার সুধীদাকেই তার কাছে শুতে বলবে।

অথচ বাদল নারী সম্বন্ধে নির্বিকার নয়। নারীর আকর্ষণ অনুভব করেছে, দিনের পর দিন দর্শনপ্রার্থী হয়েছে, স্পর্শের জন্যে উন্মুখ রয়েছে।

কিন্তু যাকে তাকে কামনা করেনি, যার তার কামনা পূরণ করেনি। তার অনুরাগের পাত্রী অল্‌গা। অল্‌গা যদি ডাকেন তো সে ভল্‌গা যেতে রাজি আছে। ভল্‌গা বোটম্যান হতে রাজি। দাঁড় টানবে আর গান গাইবে—বিপ্লবের গান। সুধী যে সেদিন বলছিল বাদলের মনের ধাঁচটা কণ্টিনেণ্টাল হয়েছে সে-কথা মিথ্যা নয়। অল্‌গার আঁচ লেগেছে। তার আগে মারিয়ানার। সেই যে ভিয়েনার মেয়ে মারিয়ানা ভাইস্‌মান। যার নৃত্যের উল্লাস তার শোণিতে মিশে তার শিরায় শিরায় নৃত্য বাধিয়েছিল।

কিন্তু উজ্জয়িনী সম্বন্ধে সে একেবারেই উদাসীন। যেমন পীচ সম্বন্ধে। এরা তার ছোট বোনের মতো। এদের প্রতি স্নেহ জন্মায়। এদের সেবা নিতে স্বতই সাধ যায়। কিন্তু এদের সঙ্গে এক কক্ষে রাত্রি যাপন করলেও সঙ্গকামনা জাগে না। অথচ এরা দেখতে সুশ্রী, বোধহয় অল্‌গার চেয়েও, মারিয়ানার চেয়ে তো নিশ্চয়।

পরের দিন উজ্জয়িনী বলল সুধীকে, "বাদল কাল সারা রাত ঘুমায়নি। যত বার আমার ঘুম ভেঙেছে ততবার দেখি ও জেগে আছে।"

"তোর ঘুম," সুধী জানতে চাইল, "এত বার ভাঙল কেন?"

"সে যদি ডেকে আমার সাড়া না পায় এইজন্যে আমি ঘুমের মধ্যেও হুঁশিয়ার ছিলুম।"

"হুঁ।" সুধী দরদের সুরে বলল, "ওর এ দশা অনেক দিন থেকে চলছে। এইটেই ওর রোগ, অন্য যা কিছু সব এর উপসর্গ অথবা আনুষঙ্গিক। ওর ইনসমনিয়া সারলে নিউরাসথীনিয়াও সারবে।"

উজ্জয়িনী বাদলের জন্যে উদ্বিগ্ন হলো। শুনেছিল সমুদ্রের হাওয়ায় অনিদ্রা সারে। সমুদ্রতীরে যাওয়া যায় কি না জিজ্ঞাসা করল। সুধী

বলল, "না। সেখানে কোন দিন কী ভেবে ঝাঁপ দেবে শ্রীচৈতন্যের মতো।"

"বলতে চাও, অচৈতন্যের মতো।"

"একই কথা।" সুধী করুণ হাসি হাসল।

বাদলকে নিয়ে তারা দু'জনে এমন ব্যাপৃত থাকল যে উজ্জয়িনী কিংবা সুধী কেউ তুলল না পূর্ব্ব রাত্রের সেই অসমাপ্ত প্রসঙ্গ। বালিকার বিয়ে কি তার জাগরণের পরেও নীতির দৃষ্টিতে বলবৎ? নীতি অবশ্য দেশকালনিরপেক্ষ বিশুদ্ধ নীতি। দেশাচারমিশ্রিত ব্যাবহারিক নীতি নয়।

উজ্জয়িনীর সন্দেহ ছিল না যে বিশ্বমানবের মহত্তম নীতি তার সহায়। সেইজন্যে তার মনে কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল না। সে প্রকাশ্যে কুমারকে প্রসাদ বিতরণ করে, কে কী ভাবছে ভ্রূক্ষেপ করে না। সখার কণ্ঠলগ্ন হয়ে পায়চারি করে, খেয়াল চাপলে পায়ে পা মিলিয়ে নাচের ভঙ্গী করে। খাবার টেবলে এমন ভাব দেখায় যেন ওদের দু'জনের একজনের খাওয়া হলে আর একজনের খাওয়া হয়ে যায়।

"আমার জন্যে তুমি খাও, কুমার।"

"না, না। ও কী করছ, বেবী?"

"বেশ করছি, তোমাকে পাস করে দিচ্ছি। সকালে আমার ক্ষিদে পায় না।" এই বলে নিজের গ্রেপ ফ্রুট, ফোর্স, বেকন ও ডিম চালান করে দেয় টেবলের ওপারে। নিজের জন্যে রাখে স্রেফ এক পেয়ালা চা।

"তোমারও কি মনে হয় না, সুধীদা, কুমার দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে যথেষ্ট না খেয়ে? আর আমি দিন দিন মোটা হচ্ছি?"

সুধী অন্যমনস্ক থাকে। জবাব দেয় না।

৪

সুধী দেখেশুনে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। অথচ কিছু করতেও পারছিল না। উজ্জয়িনী আসায় বাদলের অনেক বেশি হেপাজৎ হচ্ছিল। আর দে সরকার আসায় বাদলের পাতে আমিষ পড়ছিল। বাদলের সেবার দিক থেকে বিবেচনা করলে ওরা দু'জনে সুধীর চেয়েও দরকারী। সুধীর পড়াশুনার দিক থেকে বিবেচনা করলেও ওদের প্রয়োজনীয়তা ছিল।

যেতে হলে সুধীরই যাওয়া উচিত, ওদের নয়। কিন্তু সুধী কেমন করে যাবে? সুধীর কাছ থেকে বাদলের দায়িত্ব কে নেবে? সে বাদলের বাবাকে জরুরি তার করেছিল। তিনিও সংবাদ দিয়েছিলেন যে রওনা হচ্ছেন। তাঁর পৌছতে প্রায় তিন সপ্তাহ লাগবে। ততদিন এই অনাচার সইতে হবে তো!

ওটা যে অনাচার সে বিষয়ে সুধীর সন্দেহ ছিল না। অথচ উজ্জয়িনী যে নীতির প্রশ্ন তুলেছে সুধী তার যুক্তিসঙ্গত উত্তর খুঁজে পায়নি। বিয়েতে উজ্জয়িনীর মত ছিল, মত না থাকলে যে সে বিয়ে অসিদ্ধ হতো তা নয়, তবু মত ছিল বলে তা আরো অনিন্দ্য। এত বড় একটা ঘটনাকে ও মেয়ে উড়িয়ে দিতে চায়, যেহেতু বিয়ের সময় ওর মনের বয়স ছিল অপরিণত।

কিন্তু সত্যই তাই। চার পাঁচ সপ্তাহ আগেও তাকে দেখলে মনে হতো বালিকা। এখন মনে হয় যুবতী। এই কয় সপ্তাহে যে সে কয়েক বছর বেড়েছে তা সত্যের খাতিরে মানতেই হবে। এখন সে ধীর স্থির শান্ত সমাহিত সহিষ্ণু। বাদলের জন্যে কি সে কম চিন্তিত! মায়া মমতা দরদ বিনয় সবই তার স্বভাবে বিকশিত হয়েছে। অথচ যে গুণ

না থাকলে বাকি সমস্ত গুণ থেকেও না থাকার সমান সেই গুণটি নেই। নেই সতীত্ব। সুধী তার জন্যে প্রার্থনা করে।

এখনো খুব বেশি বিলম্ব হয়নি। এখনো শোধরানো সম্ভব। এখনো সে কায়িক অর্থে সতীই রয়েছে। বাচনিক ও মানসিক অর্থে নয়। সুধী তার জন্যে প্রার্থনা করে। বলে, প্রভু, তুমি আমার বোনটিকে রক্ষা কর। বাঁচাও। সে বোঝে না সে কী করছে। যখন বুঝবে তখন হয়তো বড় বেশি বিলম্ব হয়ে গেছে। আমাকে যুক্তি দাও, যে যুক্তি দিয়ে আমি খণ্ডন করব তার উক্তি। এমন যুক্তি দাও যা সে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করবে, যা সে অস্বীকার করতে পারবে না। আমি তাকে সাংসারিক দুর্গতির ভয় দেখাতে চাইনে, ভয় পাবার মেয়ে সে নয়। তাকে লজ্জা দিতে গেলে সে গর্বিত হয়। কলঙ্ক তার কাছে চন্দন। কী করে জাগাব তার কল্যাণবোধ, তার সামাজিক বিবেক!

সুধীর যে ইস্ক্রুপটা আলগা হয়েছিল সেটা কখন এক সময় আপনা থেকেই আঁট হয়েছিল। উজ্জয়িনীর দাবী যদি হতো বাদলের সঙ্গে অসামঞ্জস্যের দরুণ স্বতন্ত্রবাস তা হলে সুধী সে দাবী সমর্থন করত। ততদূর উদার হতে সে নিজেকে প্রস্তুত করেছিল। কিন্তু উজ্জয়িনীর দাবী বাদলের সঙ্গে সামঞ্জস্যের সম্ভাবনাসত্ত্বেও অপরের সহবাস! এ দাবী এমন চরম দাবী যে সুধী এর জন্যে কোনোকালেই প্রস্তুত হবে না। এ বিষয়ে তার সংস্কার এমন বদ্ধমূল যে মহত্তর নীতিও তাকে উন্মূল করতে পারবে না। এ ক্ষেত্রে আপোসের আশা নেই।

সুধী অবশেষে দে সরকারকে পাকড়াল। বেড়াতে নিয়ে গিয়ে বলল, "ভায়া, তোমার তো দয়ামায়া আছে, কেন তবে ওর সর্বনাশ করছ?"

দে সরকার গান্টা গাইল, "সুধীদা, তোমারও তো দয়ামায়া আছে, তুমি কেন ভাবছ না যে আমারও সর্বনাশ হচ্ছে।"

"তোমার সর্বনাশ!" সুধী আশ্চর্য হলো।

"নিশ্চয়! আমি তো তোমার মতো মহাপুরুষ নই, আমি সামান্য পুরুষ। পুরুষমাত্রেরই শখ জাগে ঘরসংসার করতে, ঘরণী পেতে। এটা তো মানো?"

"মানি বৈকি।"

"কিন্তু উজ্জয়িনী আমাকে সাফ বলে দিয়েছে কোনো দিন আমার ঘর করবে না। দেশের কাজের ফাঁকে মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে দেখা করবে, আমিও মাঝে মাঝে দেখা করতে যাব তার ও তোমার আশ্রমে না আস্থানায়। তুমি যদি আমাদের মিলতে না দাও তবে সে বৈষ্ণবী হয়ে তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াবে, আর আমি যদি পারি তো তার সহচর হব।"

"তাই নাকি?"

"শোন। এটা তো মানো যে পুরুষমাত্রেরই সন্তানকামনা আছে?"

"মানি।"

"কিন্তু উজ্জয়িনী আমাকে স্পষ্ট বলে দিয়েছে ইহজন্মে মা হবে না। যদি আইন অনুসারে আমার স্ত্রী হয় তা হলেও না। তা হলে বুঝে দেখ আমার কত সুখ!"

সুধী শুধু শুনল। দে সরকার বলে চলল, "তার পরে এটা অবশ্য মানবে যে আমারও আত্মীয়স্বজন আছেন। আমার মা বাবা দু'জনেই বেঁচে। কুলাঙ্গার বলে তাঁরা কি আমার মুখ দর্শন করবেন, না কুলটা বলে আমার বধূর?"

সুধী আকুল স্বরে বলল, "থাক।"

"না, শোন। মান কি না বল, মানুষমাত্রেরই আছে লোকনিন্দার ভয়? সমাজের দশজন আমাকে চরিত্রহীন বলে অপাংক্তেয় করবে, যদি চাকরি পাই সহকর্মীরা আমার সঙ্গে মিশবে না, যদি বই লিখি সমালোচকরা এক হাত নেবে। অপমান হবে আমার দৈনিক বরাদ্দ, খাদ্য জুটবে কি না জানিনে।"

সুধী বলল, "থাক, হয়েছে।"

"না, হয়নি।" দে সরকার ভাবপ্রবণ মানুষ। বলে চলল, "তার পরে যার জন্যে চুরি করছি সেই যদি বলে চোর তবে আমার সর্বনাশের ষোলো কলা পূর্ণ হবে। সেই যদি অবিশ্বাস করে তবে আমার জীবন ব্যর্থ।"

সুধী মৌন থাকল। দে সরকার থামল না। বলল, "অথচ আমি এমন কিছু কুপাত্র নই যে আমাকে আর কেউ বিয়ে করত না, আমি আর কোনো সুন্দরী মেয়ের স্বামী হতুম না। বাংলাদেশে কুমারীর অভাব?"

"তোমরা," সুধী ব্যথিত স্বরে বলল, "দু'জনেই দু'জনের সর্বনাশ করছ। ইচ্ছা করলেই এড়াতে পারতে।" আরো বলল, "এখনো পারো।"

"আমরা," দে সরকার গদ্গদ স্বরে বলল, "জানি আমাদের নিস্তার নেই। সাধু পুরুষ ও সাধ্বী রমণীরা সকলেই আমাদের ঢিল ছুঁড়ে মারবেন। একটু মমতা, একটু বুঝে দেখা—এটুকুও ক'জনের কাছে পাব? তথাপি উজ্জয়িনীর জেদ দেশে ফিরতে হবে। ওর সাহস দেখে আমারও ভয় ভেঙে যায়। এখন আমার যা কিছু ভয় ওর জন্যেই। কেমন করে ওকে অপমানের হাত থেকে বাঁচাব তাই ভেবে আমি দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছি, সুধীদা।"

সুধী কোমল স্বরে বলল, "বাঁচাবার পথ একটিমাত্র। সে পথ নিবৃত্তির।"

"তুমি কি মনে করেছ," দে সরকার ফণা তুলল, "প্রবৃত্তির স্রোতে আমরা তৃণের মতো ভাসছি? আমাদের বিয়ের উপায় থাকলে তুমিই স্বীকার করতে আমরা নর্মাল নরনারী। সমাজের চোখে আমরা দোষী, তাই নীতির চোখেও দোষী। কিন্তু আমরা তো জানি আমরা আমাদের বয়সের অন্যান্য তরুণ তরুণীর চেয়ে অধিক আসক্ত নই।"

"আমি সে অর্থে বলিনি।" সুধী সংশোধন করল। "আমি ইঙ্গিত করেছিলুম আত্ম বিসর্জনের। যারা ভালোবাসে তারা কি সব ক্ষেত্রে মিলিত হতে পারে? যেখানে অলঙ্ঘ্য ব্যবধান সেখানে আত্মবিসর্জনই শ্রেয়। করে দেখ, তাতে অপার্থিব আনন্দ।"

"আত্মবিসর্জনের কথা যদি উঠল," দে সরকার গলা পরিষ্কার করল, "তবে বলি, কার আত্মবিসর্জন বেশি? আমাদের না তোমার? তোমাকে তোমার পৈত্রিক ঘরবাড়ি ধনদৌলৎ ত্যাগ করতে হবে না। আমরা গৃহহীন সম্পত্তিহীন। তোমাকে তোমার আত্মীয়স্বজনরা ত্যাগ করবেন না। আমরা সর্ববিবর্জিত। তোমার সুনাম রটবে, তুমি হবে দেশমান্য সুধীন্দ্রনাথ। আমাদের কলঙ্কের দাগ মুছবে না, লোকের মঙ্গল করলেও তারা ভুলবে না যে আমরা দাগী আসামী। তা হলে আত্মবির্জনের কথা ওঠে কেন? আমাদের সম্বল তো আমাদের পারস্পরিক সঙ্গসুখ। তাও বিসর্জন দিতে হবে?"

সুধীও বিচলিত হল। সহসা উত্তর খুঁজে পেল না। দু'জনে স্তব্ধ হয়ে দু'জনের দিকে তাকাল।

"কিন্তু কেন?" সুধী বলল, "কেন এসবের মধ্যে যাওয়া? কেন প্রেমে পড়লে?"

"তুমি কি কখনো পড়নি যে প্রাকৃত জনের মতো প্রশ্ন করছ? তুমি যে অপার্থিব আনন্দ পাচ্ছ তারই বা প্রয়োজন কী, বল?" সে সুধীকে জেরা করতে লাগল। "তফাৎ কোথায়, সুধীদা? দৈবক্রমে উজ্জয়িনী বিবাহিতা, অশোকা অবিবাহিতা। তুমি কি হলফ করে বলতে পারো যে তোমার আগে স্নেহময়ের সঙ্গে ওর বিয়ের কথাবার্তা চলছিল জেনেও তুমি প্রেমে পড়নি? মাফ কোরো যদি রূঢ় শোনায়, এখন তো সে পরের বাগ্‌দত্তা, বলতে গেলে পরস্ত্রী। এখনো কি তুমি তাকে কম ভালোবাস, কোনো দিন কি কম ভালোবাসবে? তফাৎটা তবে কোনখানে?"

সুধীর মুখে উত্তর জোগাল না। কিন্তু ছিল উত্তর। সে অত্যন্ত ব্যাকুলতা বোধ করল প্রকাশের উপযুক্ত ভাষা না পেয়ে।

সুধী কোনো দিন এ দিক থেকে ভাবেনি। ভেবে দেখল, তাই তো। স্নেহময়ের চোখে সুধী একজন বোচোর। আর একটু হলেই তার বহুদিনের মনোনীতাকে বাগ্‌দানের পূর্বেই অপহরণ করত। এখনো তাকে বিশ্বাস করে বাড়িতে ডাকা চলে না। তাকে বিশ্বাস করলেও অশোকাকে বিশ্বাস কী! এই তো সেদিনও সে সুধীকে চিঠি লিখেছে টরকী থেকে। তাতেও কি তার হৃদয়ভাব অব্যক্ত রয়েছে?

যীশু বলেছেন, "Judge not, that ye be not judged." সুধী ভেবে দেখল, পরকে বিচার করতে যাওয়া ধৃষ্টতা।

৬

বাদল জানত না যে তার বাবা তার অসুখের খবর পেয়ে রওনা হয়েছেন। যেদিন শুনল তিনি এডেন থেকে তার করেছেন সেদিন কেমন যেন ভয় পেয়ে গেল। সুধীকে ধরে বসল, "এর মানে কী, সুধীদা?"

"মানে আবার কী ! তোকে দেখতে আসছেন।"

"দেখতে, না নিতে ?"

"সে কথা পরে।"

"আমার কিন্তু আশঙ্কা হয়, তিনি আমাকে ধরে নিয়ে যাবেন।"

"না রে। ধরে নিয়ে যাবেন কেন ? ডাক্তারের পরামর্শ শুনে যা হয় করবেন।"

বাদল সেদিন সমস্তক্ষণ উন্মনা হয়ে রইল। পরের দিন তার প্রথম কথা, "বাবা কত দূরে ?"

"বোধ হয় লোহিত সাগরে।"

"এর মানে কী, বলতে পারো, সুধীদা ? বল, বল, লুকিয়ে রেখো না।" বাদল আব্দার ধরল।

"মানে কী ! বাপ কি ছেলেকে দেখতে আসেন না ? আমি কেন জেরার্ডস্ ক্রস্ থেকে ছুটে এসেছি ?"

"আমার কিন্তু আশঙ্কা হয়, তিনি আমাকে না নিয়ে ফিরবেন না।"

বাদল তার বাবাকে জুজুর মতো ডরাত। তিনিই তার ডিকটেটর কম্প্লেক্সের মূলে। ছোটবেলা থেকেই তিনি তাকে এমন ভাবে শাসন করেছেন যে শাসনের আড়ালে তাঁর আন্তরিক স্নেহপ্রবণতা ঢাকা পড়ে গেছে। তিনি যে ছেলেকে মারধর করতেন তা নয়। বকতেন বললেও বেশি বলা হয়। ছেলের পিছনে খরচ করতেন দেদার, তার কোনো সাধ অপূর্ণ রাখতেন না। অমন লাইব্রেরী ক'জনের আছে ? কিন্তু সব সময় তাঁর মনে এই এক চিন্তা—আমার ছেলে আমার মতো হবে, আমার মতে চলবে। ছেলে যে তার নিজের মতো হবে বা নিজের পথে চলবে এটা তিনি বরদাস্ত করা দূরে থাক, কল্পনাই করতেন না। অথচ বাদল ঠিক ওই অধিকারটি দাবী করে। নিজের মতো হওয়াই

তার আদিম দাবী, মধ্যম দাবী, অন্তিম দাবী। বাদল চায় বাদল হবার লিবার্টি। রায়বাহাদুর স্বরাজ মঞ্জুর করবার পাত্র নন, প্রাদেশিক অটোনমি দিয়ে মনে করেন খুব দিয়েছেন। বাদলও নাছোড়বান্দা। বিলেতে পালিয়ে এসেছে তাঁকে ফাঁকি দিয়ে। আই সি এস'এর আশা দেখিয়ে।

যেদিন পোর্ট সৈয়দ্ থেকে তার এলো সেদিন বাদল সন্ত্রস্ত হয়ে সুধীকে বলল, "যদি ধরে নিয়ে যান?"

"অত ভাবছিস্ কেন, বাদল? যদি ধরে নিয়ে যানই তবে কিছু দিন দেশে থেকে সুস্থ হয়ে ফিরে আসতে বাধা কিসের?"

"না, সুধীদা। তুমি বুঝবে না। গেলে ফিরে আসা দুর্ঘট। বাবা আমার জোর করে বিয়ে দিয়েছিলেন, জোর করে—ঐ যে বাঙালীদের কাগজে বিয়ের বিজ্ঞাপনে থাকে, settled in life—তাই করাবেন। তার মানে ডেপুটি কি সাব ডেপুটি।"

"বেশ তো! ডেপুটি সাবডেপুটিরা কি মানুষ নন? তোর যদি মন না লাগে ইস্তফা দিতে কতক্ষণ! তিনি কি তোকে জোর করে চিরকাল চাকরি করাতে পারেন?"

"অসম্ভব।" বাদল ক্রোধে ক্ষোভে নিরাশায় কাঁপতে কাঁপতে বলল, "বিংশ শতাব্দীর বাদল আমি, আমার পক্ষে আই সি এস'এর চাকরিই যথেষ্ট অধঃপতন। তাও নয়, ডেপুটিগিরি! আমায় রক্ষা কর, সুধীদা।"

সুধী তাকে শান্ত হতে বলল। তার যদি রুচি না থাকে তবে তার বাবা কি তাকে জোর করে চাকরিতে বহাল করতে পারবেন, তিনি কি চাকরির মালিক?

"তুমি কি জানো না, সুধীদা, বাবার কী রকম প্রভাব! তিনি চেষ্টা

করলেই আমার বহালের হুকুম আসবে, কিন্তু তার চেয়ে ফাঁসির হুকুম ভালো। বিংশ শতাব্দীর—"

"ছি বাদল, অতটা অহঙ্কার শোভা পায় না। তোর অহমিকাই তোর বৈরী। এই যে তুই অসুখে ভুগছিস্ এর গোড়ায় রয়েছে বিশ্বের বোঝা নিজের ঘাড়ে নেওয়া। আমি তো মনে করি ইংলণ্ডেই হোক আর ভারতবর্ষেই হোক ছোট্ট একটি স্কুলের মাস্টারি করাই তোর প্রকৃষ্ট জীবিকা। ওর সংকীর্ণ সীমাই তোর যথার্থ বিশ্ব।"

বাদল বিমূঢ় হয়ে সুধীর দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকাল। তার মতো উচ্চাভিলাষী কিনা ছোট্ট একটি স্কুলের মাস্টার হয়ে জীবন কাটাবে! তবু যদি কোনো দিন পার্লামেন্টের মেম্বর ও গবর্ণমেণ্টের শিক্ষাসচিব হবার ভরসা থাকত!

"সত্যি, বাদল, সীমা অতিক্রম করে কেউ সার্থক হয় না। ব্যর্থই হয়। ছোট্ট একটি পত্রিকার সম্পাদক হতে পারিস্, যদি লিখে তৃপ্তি পাস্।"

"তুমি বোধহয় ভুলে যাচ্ছ যে আমি একজন ব্যারিস্টার," বাদল যোগ করল, "হতে পারি।"

"ব্যারিস্টারিও কিছু মন্দ নয়, যদি মফঃস্বলে প্র্যাকটিস করে সন্তুষ্ট থাকিস্। চল, ভাগলপুরে বসবি।"

বাদলের মুখভাব দেখে সুধী নিরস্ত হলো।

বাস্তবিক জীবিকার মানদণ্ডে মাপলে বাদলের ভবিষ্যৎ কী! শরীর সারলেও দেশলাই বেচা চলবে না, তেমন কিছু করা তার পক্ষে প্রাণদণ্ড। বিলিতী ডিগ্রী নেই, প্রোফেসারি জুটবে না। তা হলে বাকি থাকে সম্পাদক, মাস্টারি ও ডেপুটিগিরি, যদি না আসছে বছর পাস করে ব্যারিস্টারি। আই সি এস'এর বয়স নেই, বোধহয়

ডেপুটিগিরির বয়সও উত্তীর্ণপ্রায়। বাদলের জন্যে সুধী উদ্বিগ্ন হয়। High thinking বেশ ভালো কথা, কিন্তু plain livingএরও একটা ব্যবস্থা চাই।

মহিমচন্দ্র ওরফে মহিম খুড়ো আসছেন শুনে উজ্জয়িনী একটুও বিচলিত হলো না। বরং একটু উৎসুকভাবে প্রতীক্ষা করতে থাকল। এই মানুষটিকে একদা সে শ্বশুর না বলে অসুর বলত, ভয় করত অসুরেরই মতো। কিন্তু এখন আর সে ভীত নয়, তার মনে হয় সে তাঁর সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে, দাঁড়িয়ে বলতে পারবে, "এই যে খুড়ো, কেমন, ভালো আছেন তো?"

"বাদল," সে বলল বাদলকে বিমর্ষ দেখে, "তুমি অমন মুষড়ে পড়ছ কেন? নিয়ে যাবেন তো কী হয়েছে?"

"উজ্জয়িনী," বাদল জানাল, "নিয়ে যদি যান তো সব মাটি হবে।"

"বুঝিয়ে বল, যদি আপত্তি না থাকে।"

"আপত্তি কিছুমাত্র নেই।" বাদল তো বলতেই ব্যগ্র। "তুমি তো জানো, বিলেত আসবার জন্যে আমি কী পরিমাণ উৎকণ্ঠিত ছিলুম। বিয়ে করতে যে রাজি হয়ে গেলুম সেও এই কারণে। তোমার প্রতি যে অসহনীয় অন্যায় করলুম তার অন্য কোনো অজুহাত ছিল না। বলতে গেলে তোমার জীবনটাকে ব্যর্থ করলুম আমার জীবনটাকে সার্থক করতে।"

"আমার জীবন," হাসল উজ্জয়িনী, "অত সহজে ব্যর্থ হবার নয়। তবে তোমার জীবনটা যে সার্থক হয়েছে এটা একটা মস্ত লাভ।"

"এখনো হয়নি। কিন্তু তখন মনে হয়েছিল হবে।"

"এখনো হয়নি?" উজ্জয়িনী পরিহাস করল। "সত্যি?"

"কোন অর্থে জিজ্ঞাসা করছ?"

"যে অর্থে মেয়েরা করে।" সে হঠাৎ বাদলের মুখে হাত চাপা দিয়ে বলল, "থাক, বলতে হবে না। আমি শুনতে চাইনে।"

"অর্থাৎ ?" বাদল ভাবতে লাগল।

"অর্থাৎ ?" উজ্জয়িনী হাসতে থাকল।

"কোন অর্থে মেয়েরা জিজ্ঞাসা করে ?" বাদল জল্পনা করল।

"থাক, কী বলছিলে বল।"

"না, আমি এ রহস্য ভেদ করতে চাই।"

কথাবার্তা এগোয় না দেখে উজ্জয়িনী বলল, "কমরেড জেসী কেমন আছেন ? কই, দেখতে এলেন না যে ?"

এতক্ষণে বাদলের ঠাহর হলো। সে একটু রেগে উঠল। বলল, "কে তোমাকে কী বলেছে, জানিনে। কিন্তু জেসী বড় মিষ্টি মেয়ে। ও যে এখনো আসেনি এর একমাত্র কারণ ও ঠিকানা পায়নি।"

"কাজ নেই ঠিকানা পেয়ে।" উজ্জয়িনী ত্রস্ত স্বরে বলল। "তুমি কি তোমার হারেমশুদ্ধ সবাইকে হাজির করবে নাকি ?"

বাদল অত্যন্ত অপ্রতিভ হল। যে অর্থটা সে এতক্ষণ ধরে অন্বেষণ করছিল সেটাও সঙ্গে সঙ্গে ধরা দিল। "তোমাকে কে কী বলেছে জানিনে। কিন্তু সত্যি আমি কারো সঙ্গে তেমন সম্পর্ক পাতাইনি।" বাদল আন্তরিকতার সহিত জ্ঞাপন করল।

"একদিনের জন্যেও না ?" উজ্জয়িনী কৌতূহলী হলো।

"এক মুহূর্তের জন্যেও না। তা বলে মনে কোরো না আমি সাধু পুরুষ। আশা করেছি কারো কারো কাছে। পাইনি। পেলে অনুতাপ করতুম না। কাজেই তোমরা আমাকে পাপীর পর্যায়ে ফেলতে পারো।"

"পাপ না করেও পাপী ?" উজ্জয়িনী বিস্মিত হলো।

"পাপ করবার ইচ্ছা সত্ত্বেও করতে পাইনি বলে পাপী।" বাদল ব্যাখ্যা করল।

"তা হলে জেসী তোমার Sweetheart নয়?"

"না, জেসী আমার Sweetheart নয়, যদিও ওর মতো sweet আমি দেখিনি। ওকে দেবে একটা খবর?"

উজ্জয়িনী বলল, "আচ্ছা।"

৬

উজ্জয়িনী বাদলকে সন্দেহ করত। ঐ সন্দেহ যে ভিত্তিহীন তা জেনে লজ্জিত হলো। বাদলের কাছে তার মার্জনা ভিক্ষা করা উচিত। এই মনে করে সে বাদলের দুটি হাত নিজের দুটি হাতে ভরে আধো আধো স্বরে বলল, "ক্ষমা কোরো।"

বাদল অবাক হলো। বুঝতে না পেরে সুধাল, "কেন?"

"আমি তোমাকে সন্দেহ করেছি। সন্দেহ করে হারেমশুদ্ধ বলেছি। তুমি তো তেমন নও।"

"কিন্তু তুমি যা ভেবেছ তাও তো ঠিক নয়। আমি আমার স্বাধীনতা এখনো প্রয়োগ করিনি বটে, কিন্তু কোনটা সন্দেহজনক? স্বাধীনতা, না তার প্রয়োগ?"

"আমি মাফ চাইছি আমার পাপ মনের জন্যে।" উজ্জয়িনী ঘুরিয়ে বলল। "তোমাকে দোষ দিচ্ছিনে, বাদল। দোষ দিচ্ছি নিজেকে।"

"কেউ সন্দেহ করলে অন্যায় করত না, কেননা আমি যা আশা করেছি তা কপালে না জুটলেও তা ঘটনারই শামিল। সন্দেহ করবার অধিকার কারো নেই। তুমি যদি অনধিকারচর্চা করে থাক তবে ক্ষমা চাইতে পার। ক্ষমা করলুম।"

"ধন্যবাদ। এখন আমার বিবেক পরিষ্কার।" এই বলে উজ্জয়িনী আরো কী চিন্তা করল।

"কী বলছিলুম ? বলা বন্ধ হলো যে। শুনবে না ?" বাদল বলতে ব্যগ্র হয়েছিল তার বিলেত আসার কথা।

"আমারও কিছু বলবার আছে, সেটা আগে বলি। কেমন ?"

"উত্তম।" বাদল একটু বিরক্ত হয়ে অনুমতি দিল।

"দেখ," উজ্জয়িনী ধীরে ধীরে অবতারণা করল, "তোমার আজকের উক্তি যদি মাসকয়েক আগে শুনতুম তা হলে হয়তো এত দূর যেতুম না। কিন্তু আমি যে অনেক দূর এগিয়েছি। বলব ?"

"বলে যাও।"

"আমি আর তোমার স্ত্রী নই।"

"এই কথা ? কেন, এ কি খুব নতুন কথা! আমি স্বাধীন হলে কি তুমিও অগত্যা স্বাধীন হও না ? বিয়ের বাকি থাকে কী আর ?"

"শুধু তাই নয়, আমি—"

"বলে যাও।"

"আমি আরেকজনকে ভালোবাসি।"

"এই কথা!" বাদল ফুৎকার করল। "তুমি যদি বুর্জোয়াদের মতো প্রেম বলে একটা আকাশকুসুমের আবাদ করতে চাও তাতে আমার কী! বুর্জোয়াদের বিশ্বাস ওরি নাম নাকি অনেক দূর এগিয়ে যাওয়া।"

"আর তুমি ? তুমি কি বুর্জোয়া নও ?"

"না, উজ্জয়িনী।" বাদল দীপ্তকণ্ঠে বলল, "যে প্রচণ্ড প্রেরণা, যে élan vital, জীবসৃষ্টির মূলে তাকে আমি ক্ষীয়মাণ বুর্জোয়াদের মতো ক্ষীণ করতে চাইনে। সে তো খেলা নয়।"

"কী জানি!" উজ্জয়িনী রহস্যমগ্ন চিত্তে মৌন রইল। অস্ফুট স্বরে বলল, "খেলা নয় তো কী?"

"যদি খেলা হয় তো তার জন্যে আমার সময় নেই। কঠোর মননেই আমার জীবনের রোদটুকু ফুরাল। যদি বাঁচি তো কারো সঙ্গে মিলিত হয়ে প্রেরণার দুর্জয় বেগে ভবিষ্যতের গর্ভে প্রবেশ করব! তারই নাম অনেক দূর এগিয়ে যাওয়া, সে যাওয়া কালের বর্ত্মে।"

উজ্জয়িনী বিশেষ কিছু বুঝল না। যেটুকু বুঝল সেটুকু এই যে বাদল বাঁচবে বলে আশা করে না।

"যদি বাঁচি বলছ কেন?" সে অনুযোগ করল।

"কারণ, বোধ হয় বেশি দিন বাঁচব না। কেন বাঁচব, যদি বাঁচাতে না পারি?"

"কাকে বাঁচাতে চাও তুমি? কোনো বন্ধুর অসুখ করেছে?" সে স্নিগ্ধ স্বরে সুধাল। "আমি সাহায্য করতে পারি?"

"না, উজ্জয়িনী। কোনো বন্ধুর নয়, সারা দুনিয়ার অসুখ। সে রোগের নাম ক্যাপিটালিজম, তার ব্যাসিলির নাম প্রাইভেট প্রফিট। তারই দাওয়াই খুঁজতে গিয়ে আমার অসুখ বাধল। সেও মরবে, আমিও বাঁচব না।"

উজ্জয়িনী তাকে কথা বলতে বারণ করল। বাদলের মুখে ঐ অলক্ষুণে বাক্যটা শুনে তার মনটা খারাপ হয়ে গেল। বেচারা বাদল! সবাই নিজের নিজের সুখ নিয়ে ব্যাপৃত, সে কিনা দুনিয়ার অসুখ নিয়ে। এখন তার এই অসুখের কী প্রতিকার? যে মানুষ দুনিয়াকে বাঁচাত দুনিয়া কেন তাকে বাঁচাবে না? উজ্জয়িনী পণ করল সে একা যত দূর পারে বাঁচাবে।

সে জেনীর সন্ধানে কুমারকে পাঠাল, যদি জেনীকে দেখলে বাঁচতে সাধ যায়।

কুমার ফিরে এসে যে সংবাদ দিল তা শুনে উজ্জয়িনীর চক্ষুস্থির।

"য়্যাঁ! মারা গেছে!" তার মুখ ফুটে বেরোল।

"কে মারা গেছে, উজ্জয়িনী? কে মারা গেছে?" বাদল বায়না ধরল। নাছোড়বান্দা।

উজ্জয়িনী বলল, "পরের কথায় তোমার কাজ কী, বাদল? তুমি যা ভাবছিলে ভাবতে থাক। হাঁ, মানবের একমাত্র ভরসা রাশিয়া, যদি মাত্রা মানে ও ডিকটেটরশিপ ছাড়ে। তারপর?"

"না, বল না আমাকে—কে মারা গেছে?"

"কেউ না, বাদল। একটা পোষা বেড়াল ছিল, সেটা মারা যায়নি, তবে মারা যাবার দাখিল।"

"থাক, বানিয়ে বলতে হবে না। আমি কচি খোকা নই যে রূপকথায় ভুলব। বল আমাকে কে মারা গেছে।" বাদল রাগ করল।

কুমার বলল, "শুনলে তুমি উত্তেজিত হতে, তাই তোমাকে শোনাইনি। মারা গেছে মুসোলিনি।"

বাদল আহ্লাদে উঠে বসল। কিন্তু কুমারের দিকে চেয়ে তার কী জানি কেন বিশ্বাস হলো না। সে আবার শুয়ে পড়ল বিষণ্ণ হয়ে। হাজার সাধলেও সেদিন সে ওষুধ পথ্য খেল না, কথা কওয়া বন্ধ করল, সমস্তক্ষণ আপন মনে গুজ গুজ করতে থাকল, কে? কে? কে?

উজ্জয়িনী সুধীর সঙ্গে পরামর্শ করল। সুধীও অনেক চিন্তা করল। শেষে সুধী নিজেই বাদলের কাছে গিয়ে তার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে তার কানে কানে বলল, "বাদল, জেনী চলে গেছে।"

"কে ? কে ?" সুধীর হাত সবলে সরিয়ে উঠে বসল বাদল। চেঁচিয়ে বলল, "মিথ্যে কথা।"

উজ্জয়িনী তার বিছানায় বসে তাকে ধরে থাকল। সে পাগলের মতো বকতে লাগল, "মিথ্যে কথা। জেনী কখনো চলে যেতে পারে না। সে যে এখনো ছেলেমানুষ, দীর্ঘ জীবন পড়ে রয়েছে তার সমুখে। তার তো যাবার কথা নয়। না, না, তোমরা ভুল শুনেছ। মিথ্যে নয়, ভুল।" তারপরে বলল, "সুধীদা, তোমাকে মিথ্যুক বলেছি বলে মাফ চাইছি। তুমি মিথ্যুক নও, ভ্রান্ত।"

কুমার মানল, "হ্যাঁ, সুধীদা ভুল শুনেছে। জেনী নয়, তার পিসী।"

উজ্জয়িনী চোখ টিপে বলল, "তুমিও ভুল শুনেছ। পিসী নয়, পুষি।"

বাদল মিনতি করল, "তোমরা আমাকে একা থাকতে দাও। তোমরা দয়া করে যাও।"

তখন অন্য দুজনে গেল, রইল কেবল সুধী আর বাদল। সুধী গেল না, পাছে বাদল একটা কিছু অনর্থ বাধায়।

বাদল মেজের উপর গা মেলে দিল, হাত পা ছড়িয়ে উপুড় হয়ে পড়ে থাকল। এই ভাবে কতকাল কাটল। সুধী তার পাশে বসে মনে মনে প্রার্থনা করল তার জন্যে, জেনীর জন্যে। বায়ু যেমন করে অন্তরীক্ষে চলে, শব্দ যেমন করে ঈথরে চলে, আলো যেমন করে শূন্যে চলে, প্রাণও তেমনি করে আরো এক বৃহত্তর অয়নে চলে। এরা কেউ কোনোখানে এক মুহূর্ত থামে না। যেখান থেকে চলে যায় সেখানকার সাথীরা ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুসরণ করতে পারে না বলেই কাঁদে। কল্পনা করে সে বুঝি কোথাও থেমেছে। না, সে প্রাণের রথে চড়ে চলেছে এক ভুবন হতে আর এক ভুবনে। জয় হোক।

বাদল বলল কাতর কণ্ঠে, "সুধীদা, সমাজে অবিচার আছে,

তাই নিয়ে ভেবে মরছি। কিন্তু এই যে অবিচার—কার অবিচার জানিনে, বিধাতার কি প্রকৃতির কি নিয়তির কি নিখিলব্যাপী অরাজকতার—এই অবিচার চোখে পড়লে কি আর কোনো অবিচার চোখে লাগে!”

সুধী বলল, “কার বিচারে অবিচার? আমাদের বিচারশক্তি কতটুকু? আমরা বিচার করবার কে? আয়, বিচার না করে প্রার্থনা করি।”

বাদল সাড়া দিল না। তেমনি পড়ে থাকল।

উজ্জয়িনী পা টিপে টিপে এলো। জিজ্ঞাসা করল, “ও কিছু খাবে না?”

সুধী বলল, “থাক, ওকে আজ উপোস করতে দে। আমিও কিছু খাব না।” জুড়ল, “তবে ওষুধের কথা আলাদা। আমার হাতে দিস্‌, আমিই খাওয়াব। আর শোন, আজ রাত্রে আমি এ ঘরে শোব।”

উজ্জয়িনী তেমনি সন্তর্পণে বেরিয়ে গেল।

বাদল বলল আর্ত স্বরে, “সুধীদা, আমাকে certitude দাও। বল, জেনী আছে, চিরকাল থাকবে, এই আলো এই আকাশ এই ফুল এই পাখী এই সবই তার। বল, এই অধিকার থেকে কেউ তাকে বঞ্চিত করেনি, করবে না।”

সুধী বলল, “সে আছে, থাকবে, ভোগ করবে আবহমানকাল।”

৭

সে রাত্রে বাদল বা সুধী দু'জনের কারো ঘুম এল না। সুধী জেগে থাকল বাদলকে পাহারা দিতে।

বাদল যখন উঠে জানালার কাছে গেল সুধীও উঠল। বাদল বলল, “সুধীদা, তোমারও কি ইন্‌সমনিয়া হলো?”

"না রে। আমি ইচ্ছা করেই জেগে আছি তোকে চোখে চোখে রাখতে।"

"তোমার ভয় নেই, আমি জানালা দিয়ে ঝাঁপ দেব না।" বাদল বলল ভিজে গলায়। "আমার কী মনে হচ্ছে বলব?"

"বল।" সুধী তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে তারাদের দিকে চেয়ে মুগ্ধ হলো।

"মনে হচ্ছে," বাদল থেমে থেমে বলল, "সমাজের চেয়ে বড় জীবন। জীবনের চেয়ে বড় মরণের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দিগন্তবিসারী নিঃসঙ্গতা। 'সমাজ সংসার মিছে সব, মিছে এ জীবনের কলরব।' সত্য শুধু আমি নিজে, আর আমাকে ঘিরে এক পরম রহস্য।"

সুধী তার কাঁধে হাত রাখল। বলল, "কিছুই মিছে নয়। সমাজ সংসার জীবন আত্মা পরলোক সবই সত্য, সমান সত্য। কোথায় যাবি রে তুই? যেখানেই যাস্ দেখবি এমনি শাদায় কালোয় আঁকা পূর্ণতার ছবি। রূপগুলি নতুন, কিন্তু রূপকার তো সেই একই, সুতরাং নতুনের তলে তলে চিরন্তন।"

"বলছিলুম," বাদল নির্লিপ্তভাবে বলল, "আমি শেষ পর্যন্ত একা। সেইজন্যে সামাজিক চেতনার দ্বারা আবিষ্ট থাকতে মন যায় না। ওর মধ্যে একটা মাদকতা আছে, ওতে ভুলিয়ে রাখে যে অন্তিম মুহূর্তে আমি একা, আমি নিবলে কেউ আমার সঙ্গে নিববে না।"

সুধী বলল, "কিন্তু সম্পর্ক তা সত্ত্বেও থাকে। এই যে তুই জেসীর কথা ভাবছিস এই ভাবনার ঢেউ জেসীর গায়ে লাগছে, যদিও সে অশরীরী। ভাবনার চেয়ে আরো সূক্ষ্ম প্রেম। প্রেমের অনুরণন প্রিয়জনের অন্তরে পৌঁছয়।"

"না, এসব বিশ্বাস করিনে। এসব রূপকথা।" বাদল জানালার ওপারে একটুখানি ঝুঁকে দেখল। সুধী তাকে জড়িয়ে ধরল।

"আচ্ছা, এখন বিছানায় ফিরে যাওয়া যাক। তুমি যখন কিছুতেই ঘুমাবে না তখন তোমাকে আর একটা কথা বলি।"

তারা যে যার বিছানায় ফিরল।

বাদল বলল, "তুমি তো জানো আমার একে একে সব বিশ্বাস লোপ পেয়েছে, লোপ পায়নি কেবল এই বিশ্বাস যে প্রগতি জিনিসটা কাম্য। কিন্তু সেটা সামাজিক চেতনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। যার সামাজিক চেতনা গেছে—অন্তত সামাজিক চেতনার আবেশ কেটেছে—তার কাছে সে বিশ্বাস মূল্যহীন।"

সুধী শঙ্কিত হলো। কিছু বলল না।

"তা হলে আমি শেষপর্যন্ত কিছুই বিশ্বাস করিনে।" বাদল কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তার পরে বলল, "এক যদি বল যে আমি আছি এও তো একটা বিশ্বাস। কিন্তু বাস্তবিক এটা একটা বিশ্বাস নয়! এটা একটা অনুভূতি।"

"বাদল," সুধী তাকে প্রগাঢ় প্রত্যয়ভরে বলল, "বিশ্বাস কর যে এই অনুভূতি মরণের পরেও থাকে, কাল স্পর্শ করে না এর কেশ, space এর কাছে অবান্তর। এই একটিমাত্র বিশ্বাস যদি থাকে তবে সব থাকল। জেসী, ন্যায়বিচার, সার্থকতা, সামঞ্জস্য—সব।"

"কী জানি!" বাদল কায়ক্লেশে বলল, "আর ভাবতে, হিসাব মিলাতে, ভালো লাগে না, ভাই। আমার শরীরে আর দম নেই, ঘড়ির টিক টিক মৃদু হয়ে আসছে। আমাকে এক গ্লাস জল খাওয়াতে পারো?"

সুধী তাড়াতাড়ি উঠল, উঠে বাদলের হাতে জল দিল। তার জল খাওয়া শেষ হলে বলল, "তুই এখন চুপ কর দেখি। ঘুম না আসে না আসুক, ক্ষতি নেই, তুই চুপ করে জেসীর ধ্যান কর।"

বাদল জল খেয়ে একটু শান্ত হলো। তখন সুধী কুমারকে জাগিয়ে ডাক্তার ডাকতে পাঠাল। তার পরে নিজে বাদলকে মাসাজ করতে বসল। তাতে বোধহয় কিছু ফল হলো। বাদলের তন্দ্রার ভাব এলো।

কিন্তু সে আর কতক্ষণ! বাদল আবার উঠে জানালার দিকে চাইল। সুধী তাকে খাট থেকে নামতে দিল না, একটু জোর খাটিয়ে শুইয়ে রাখল।

সে বলল, "জল।"

সুধী জল খাওয়াল।

জল খেয়ে সে বলল, "সুধীদা, আমি সরে দাঁড়ালুম। বিবর্তনের মিছিল চলছে, চলতে থাক, আমি তাতে নেই।"

সুধী তাকে কথা বলতে বারণ করল। সে শুনল না। ক্লান্ত করুণ স্বরে বলল, "আমার বিশ্বাস গেছে, বাকী আছে ইচ্ছা। বিশ্বাসহীন ইচ্ছা তো মিছিলের উপর খাটে না। তাই নিজের উপর খাটালুম। সরে দাঁড়ালুম।"

সুধী ডাক্তারের জন্যে উৎকণ্ঠিত হয়ে প্রতীক্ষা করছিল। উজ্জয়িনীকে জাগিয়ে বলল হট ওয়াটার বটল আনতে, কোকো তৈরি করতে।

বাদল জোরে জোরে নিঃশ্বাস টানছিল আর বলছিল, "সরিয়ে নিলুম আপনাকে এই পদার্থ জগৎ হতে, ঘটনাশৃঙ্খল হতে, ভালোমন্দের দ্বৈত হতে। অপসরণ করলুম দায়িত্ব ও অধিকার হতে, ব্যর্থতা ও সিদ্ধি হতে, সর্ব ফলাকাঙ্ক্ষা হতে। চলতে থাক এই মিছিল, এই স্বপ্ন। আমি সরলুম।"

ডাক্তার এসে তাকে মর্ফিয়া দিয়ে ঘুম পাড়ালেন। সে একটি শান্ত শিশুর মতো ঘুমিয়ে পড়ল। তখন ভোর হয়ে আসছে।

দুপুরের দিকে যখন তার ঘুম ভাঙল তখন সে জানতে চাইল, "বাবা কত দূরে ?"

খবরটা কাল থেকে চাপা দেওয়া হয়েছিল। রায়বাহাদুর কাল মার্সেল্‌স্ থেকে তার করেছিলেন যে তিনি প্যারিসের পথে আসছেন। আজকেই তাঁর পৌছানার কথা। তাঁকে স্টেশনে অভ্যর্থনা করবার জন্যে সুধী যাবে।

"ওহ্!" বাদল পরম নির্ভয়ে বলল, "আচ্ছা, দেখতে চান, দেখবেন। কিন্তু ধরতে পারবেন না।"

এর পরে উজ্জয়িনীর হাতে খেতে খেতে বাদল হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ল। উজ্জয়িনী সুধীকে ডাকল, "দাদা, একবার এস তো।"

সুধী কুমারকে ডাক্তারের কাছে পাঠিয়ে বাদলের ভার নিল। আধ ঘণ্টা পরে বাদল চোখ মেলল। ক্ষীণ স্বরে বলল, "আহা! এতকাল পরে…একটু…ঘুমিয়ে বাঁচি।" তারপরে আবার অজ্ঞান হয়ে গেল।

একটু পরেই ডাক্তার এসে পড়লেন। কিন্তু ততক্ষণে বাদল বেঁচে গেছে। হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া রহিত।

উজ্জয়িনী ডাক্তারের সামনেই বাদলের পায়ে মাথা রেখে দুই বাহু দিয়ে তাকে বেষ্টন করল। ডাক্তার তা দেখে চোখে রুমাল চেপে কুমারের সঙ্গে বাইরে গেলেন। সুধী নিশ্চল ভাবে দাঁড়িয়ে রইল বাষ্পান্ধ নয়নে।

সে কী কান্না উজ্জয়িনীর! ফুলে ফুলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সে এমন বিকল হয়ে কাঁদছিল যে কুমার পর্যন্ত অবাক হয়ে ভাবছিল, ও কি কোনো দিন বাদল ব্যতীত অন্য কোনো পুরুষকে সত্যি ভালো-বেসেছে! বাদলই ওর সত্যিকার স্বামী, কুমার শুধু ওর সখা। কুমারের মনে শোচনা, বন্ধুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে হয়তো সেই

এই ঘাতকতা করেছে। সেও বাদলের পায়ের কাছে বসে চোখের জলে ভাসতে থাকল।

কিন্তু সকলের চেয়ে মর্মন্তুদ হলো পুত্রহারা বৃদ্ধ পিতার বুকফাটা বিলাপ। "বাবুয়া? বাদল বাবুয়া? নেই? চলে গেছে? হায় হায় হায়?"

সেই হৃদয়বিদারক দৃশ্যের উপর ধীরে ধীরে যবনিকা পড়লে কেমন হয়?

সমাপ্ত

(৭ই এপ্রিল ১৯৪২)

অন্নদাশঙ্কর রায় অতঃপর আর একটি বৃহৎ উপন্যাস আরম্ভ করবেন। সেখানিও ছয় সাত খণ্ডে সম্পূর্ণ হবে। প্রথম তিন খণ্ডের নাম "রত্ন ও শ্রীমতী।"